হৃদয় নাড়া দেওয়া গল্প, সত্যি ঘটনা

বিশ্বের ২৫টি ভাষায় অনূদিত

ইবুকে রুপান্তরঃ স্নেহাশীষ প্রিয় বড়ুয়া

হৃদয়ের দরজা খুলে দিন

আজান ব্রহ্মবংশ মহাথেরো

অনুবাদ : জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু

হৃদয়ের দরজা খুলে দিন

হৃদয় নাড়া দেওয়া গল্প, সত্যি ঘটনা।

লেখক: আজান ব্রহ্মবংশ মহাথেরো
অনুবাদক: জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
অডিওবুক এডিটর: স্নেহাশীষ প্রিয় বড়ুয়া
সম্পাদনায়: শ্রীমৎ করুনাবংশ ভিক্ষু
প্রকাশক: কল্পতরু, রাঙামাটি

উৎসর্গ

আমার গুরু আজান চাহকে, যিনি শান্তিতে বেঁচেছিলেন,
আমার সতীর্থ ভিক্ষুদেরকে, যারা আমাকে নিরবতার সৌন্দর্য মনে করিয়ে দেয়, আর আমার বাবাকে, যিনি আমাকে দয়া শিখিয়েছিলেন।

নিজেকে এক মুহূর্তের শান্তি দিন,
আর তখন আপনি বুঝবেন
কেমন বোকার মতো আপনি ছুটোছুটি করেছেন।

নিরব হতে শিখুন,
আর তখন আপনি খেয়াল করবেন
আপনি খুব বেশি বকবক করেছেন।

দয়ালু হোন,
আর আপনি তখন উপলব্ধি করবেন
অন্যদের প্রতি আপনার ধারণাটা খুব কঠোর ছিল।
প্রাচীন চীনা প্রবাদ

লেখক পরিচিতি

আজান ব্রহ্মবংশ এর জন্ম লন্ডনে, ১৯৫১ সালে। তিনি স্কুলে থাকতেই বৌদ্ধ বইপত্র পড়ে. পড়ে. নিজেকে একজন বৌদ্ধ বলে মনে করতেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা পড়ার সময়ে বুদ্ধধর্ম ও ধ্যানের প্রতি তাঁর আগ্রহ আরও বাড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পরে এক বছর শিক্ষকতা করে তিনি এরপর থাইল্যান্ডে পাড়ি. জমান ভিক্ষু হওয়ার জন্য।

তিনি তেইশ বছর বয়সে ব্যাংককে ওয়াট সাকেট বা সাকেট বিহারের অধ্যক্ষ কর্তৃক উপসম্পদাপ্রাপ্ত হন। পরবর্তী নয় বছর ধরে তিনি আজান চাহ্ এর অধীনে বন-ভাবনা ধারায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৮৩ সালে তাকে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় পার্থের কাছে একটি বনবিহার প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করতে বলা হয়। আজান ব্রহ্ম্ বর্তমানে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বোধিঞাণ বিহারের অধ্যক্ষ এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বুড্ডিস্ট সোসাইটির আধ্যাত্মিক পরিচালক।

ভূমিকা

জীবন মানে কোনো একগুচ্ছ ধারণা নয়, বরং এটি হচ্ছে একটার পর একটা বুনে যাওয়া গল্পের মালা। ধারণাগুলো হচ্ছে সাধারণভাবে গৃহীত কিছু মনোভাব মাত্র, সেগুলো সব সময়ই সত্য থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান করে। কিন্তু একটি গল্প, তার বহুমুখী অর্থ ও বর্ণনার ছটা নিয়ে বাস্তব জীবনের অনেক কাছাকাছি থাকে। এ কারণেই আমরা বিমূর্ত তত্ত্বের চেয়ে একটা গল্পকে খুব সহজে বুঝতে পারি। আমরা ভালো গল্প পছন্দ করি।

এই বইয়ের গল্পগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে আমার গত ত্রিশ বছর ধরে থেরবাদী বুদ্ধধর্মের বন ধারার ভিক্ষু হিসেবে জীবন কাটানোর সময়ে। বহু শতাব্দী ধরে এই থেরবাদ ছিল থাইল্যান্ড, বার্মা, শ্রীলংকা, কম্বোডিয়া ও লাওসের মানুষদের আধ্যাত্মিকতার প্রধান বাহন। এখন এই ধারার বুদ্ধধর্ম পশ্চিমে বেড়ে উঠছে, আর আমি যেহেতু অস্ট্রেলিয়ায় থাকি, তাই সেখানেও বেড়ে উঠছে!

আমাকে প্রায়ই বুদ্ধধর্মের প্রধান শাখাগুলো, যেমন: থেরবাদ, মহাযান, বজ্রযান ও জেন, এসবের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। এর উত্তর হচ্ছে, এগুলো সবই একই ধরনের কেক, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের আছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের বহিরাবরণ। বাইরে থেকে সেগুলোকে দেখতে ভিন্ন মনে হতে পারে, তাদের স্বাদও ভিন্ন মনে হতে পারে, কিন্তু আপনি যখন সেই ধারার গভীরে যাবেন, তখন আপনি সেই একটা স্বাদই পাবেন - মুক্তির স্বাদ। শুরুতে সেই একটা বুদ্ধধর্মই ছিল।

বুদ্ধ তাঁর শিক্ষা দিয়েছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতে, সেটা প্রায় ২৬০০ বছর আগে - সক্রেটিসের একশ বছর আগে। তিনি কেবল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদেরকেই শিক্ষা দেন নি, হাজার হাজার সাধারণ জনগণকেও শিক্ষা দিয়েছিলেন – কৃষক থেকে শুরু করে ঝাড়ুদার এমনকি বেশ্যাদেরকেও। বুদ্ধের যে প্রজ্ঞা, তা কোনো অতিমানবীয় সত্ত্ব থেকে অবতীর্ণ হয় নি। এটি জেগে উঠেছিল জীবনের সত্যিকারের স্বভাবের মধ্যেকার গভীরতম অন্তর্দৃষ্টি থেকে। বুদ্ধের শিক্ষাগুলো এসেছিল তার হৃদয় থেকে, গভীর ধ্যান সেই হৃদয়কে খুলে দিয়েছিল। বুদ্ধ তাঁর বিখ্যাত উক্তিতে বলেছিলেন, 'মন-সম্বলিত এই ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ, এর মাঝেই এই জগতের সূচনা ও পরিসমাপ্তি প্রকাশিত হয়ে থাকে।'

বুদ্ধের মূল শিক্ষা ছিল চারটি মহান সত্য। এগুলোকে নতুনভাবে সাজালে আমরা পাই :
সুখ
সুখের কারণ
সুখের অনুপস্থিতি
সুখের অনুপস্থিতির কারণ।
এই বইয়ের গল্পগুলো এই দ্বিতীয় মহান সত্য, সুখের কারণকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে।

বুদ্ধ প্রায়ই গল্পে গল্পে শিক্ষা দিতেন। আমার প্রয়াত গুরু, উত্তর-পূর্ব থাইল্যান্ডের আজান চাহ্, তিনিও গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। আজান চাহ্-র ধর্মদেশনাগুলোর পরে আমার সবচেয়ে বেশি মনে থাকত তার গল্পগুলো, বিশেষ করে যে গল্পগুলো মজার হতো, সেগুলো। আর এই গল্পগুলোতেই থাকত অন্তরের সুখের পথের জন্য সবচেয়ে গভীর নির্দেশনাগুলো। গল্পগুলো ছিল তাঁর শিক্ষাগুলো বহনকারী বার্তাবাহক।

এ ছাড়াও বিশ বছরেরও অধিক সময় ধরে আমার অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় বুদ্ধধর্ম ও ধ্যান শিক্ষা দেয়ার গল্পগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি সবচেয়ে ভালো গল্প এই বইয়ে দিয়েছি। এই গল্পগুলো নিজেরাই নিজেদের কথা বলবে, তাই আমি আর অত ব্যাখ্যার ঝামেলায় যাই নি। প্রত্যেকটি গল্পই অনেক প্রকার অর্থ বহন করে, তাই আপনি সেগুলো যত বেশি পড়বেন, তত বেশি সত্য উন্মোচিত হবে।

যাঁরা এসব সত্যিকারের সুখের গল্পগুলো বলতে শুনেছেন, তাঁদের মতোই আপনিও এগুলো উপভোগ করবেন এই আশা করি। আরও আশা করি, এগুলো আপনার জীবনকে ভালোর পথে পরিবর্তনে সহায়তা করবে, যেমনটা অন্য অনেক অনেককে করেছে।
আজান ব্রাহ্ম্
পার্থ, অস্ট্রেলিয়া
মে ২০০৪

প্রথম অধ্যায়

পরিপূর্ণতা ও অপরাধবোধ

দুটি খারাপ ইট

১৯৮৩ সালে আমাদের বিহারের জায়গা ক্রয় করার পরে নিঃস্ব হয়ে গেলাম আমরা। আমাদের প্রচুর দেনা হয়ে গেল। বিহারের জায়গাটিতে কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। এমনকি কোনো ছাউনিও নয়। প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমাদের পুরনো দরজাগুলোর উপরে ঘুমাতে হয়েছিল, যে দরজাগুলো আমরা সস্তায় পুরনো মালপত্রের দোকান থেকে কিনেছিলাম। দু-পাশে ইটের স্তুপ তুলে তার উপরে দরজাগুলো বিছিয়ে চৌকির মতো বানিয়েছিলাম। (সেখানে অবশ্য কোনো তোশক ছিল না, কেননা আমরা ছিলাম বনভিক্ষু।)

সবচেয়ে ভালো দরজাটা ছিল বিহারাধ্যক্ষের। সেটা ছিল সমান। আমার দরজাটার মাঝখানে বেশ বড়সড় একটা গর্ত যেখানে আগে দরজার নব লাগানো ছিল। দরজার নবটা তুলে ফেলার কারণে আমি বেশ খুশি, কিন্তু সমস্যা হলো আমার দরজা-বিছানাটায় ঠিক মাঝখানে একটা গর্ত রেখে গেল। আমি ঠাট্টা করে বলতাম, এখন আমার টয়লেটে যেতে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে না। হিম শীতল সত্য হলো যে, ছিদ্রটার মধ্য দিয়ে বাতাস আসত। সেই রাতগুলোতে আমি খুব বেশি ঘুমাতাম না।

আমরা ছিলাম গরিব ভিক্ষু যাদের ঘরবাড়ির দরকার ছিল। কিন্তু ঘরবাড়ি তোলার জন্য লোক নিয়োগ করার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। জিনিসপত্রও ছিল অনেক ব্যয়বহুল। তাই আমাকে শিখতে হয়েছিল কী করে নির্মাণ করতে হয়, কীভাবে ফাউন্ডেশন দিতে হয়, কংক্রিট ও ইট কীভাবে বিছাতে হয়, কীভাবে ছাদ দিতে হয়, কীভাবে পাইপ লাইন বসাতে হয় - সবকিছু। গৃহীজীবনে আমি ছিলাম তাত্ত্বিক পদার্থবিদ এবং এক হাইস্কুলের শিক্ষক। হাতের কাজ করার অভ্যাস আমার ছিল না। কিন্তু কয়েক বছর পরে আমি মিস্ত্রির কাজে বেশ দক্ষ হয়ে উঠলাম। আমার লোকজনকে তখন আমি বলতাম বিবিসি (বুড্ডিস্ট বিল্ডিং কোম্পানি)। শুরুর দিকে আমার সময়টা এমনই কঠিন ছিল।

ইট বিছানোটা সহজ মনে হতে পারে, এক দলা মশলা নিচে দিয়ে, ইটের এক কোণায় একটা বাড়ি, আরেক কোণায় এক বাড়ি, ব্যস। যখন আমি ইট বিছানো শুরু করলাম, এক কোণায় বাড়ি দিয়ে সমান করার চেষ্টা করলাম, আরেক কোণা উঁচু হয়ে উঠে গেল। তাই আমি সেই কোণাটায় বাড়ি দিলাম। এতে করে পুরো ইটটাই বেলাইনে চলে গেল। ঠেলেঠুলে এটাকে লাইনে আনলে প্রথম কোণাটি আবার উঁচু হয়ে রইল। আপনি নিজেই করে দেখুন না!
ভিক্ষু হওয়াতে আমার ধৈর্য ও সময় যথেষ্ট ছিল। আমি নিশ্চিত করলাম যেন প্রত্যেকটি ইট সুন্দরভাবে বসানো হয়, যত সময় লাগুক না কেন। অবশেষে

আমার প্রথম ইটের দেয়াল বানানো শেষ করে একটু পেছনে গিয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখলাম নিজের সৃষ্টিকে। কেবল তখনই আমার চোখে পড়ল, হায়! হায়! আমি দুটো ইটকে নষ্ট করেছি! সবগুলো ইটই সারিবদ্ধভাবে সাজানো, কেবল এই দুটো ইট বাঁকা হয়ে গেছে। সেগুলোকে দেখতে খুব বিশ্রী দেখাচ্ছিল। তারা পুরো দেয়ালটাকেই নষ্ট করেছে। তারা এর সৌন্দর্যটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

বিহারের অতিথিদের আমাদের নতুন বিহার দেখাতে গিয়ে সব সময় আমি তাদের আমার ইটের দেয়ালের ওদিকে নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে চাইতাম। আমার ভুলটা অন্য কেউ দেখুক এটা আমার সহ্য হতো না। এরপর তিন চার মাস পরে বিহারের কাজ শেষ হলে একদিন এক অতিথিকে নিয়ে বেড়ানোর সময় দেয়ালটা দেখল সে।
'এটা তো সুন্দর একটা দেয়াল!' সে মন্তব্য করল।
আমি অবাক হয়ে বললাম, 'স্যার, আপনি কি আপনার চশমা গাড়িতে ফেলে এসেছেন? আপনার কি চোখের সমস্যা আছে? আপনি কি ওই দুটো খারাপ ইটকে দেখেন নি, যেগুলো পুরো দেয়ালটাকে নষ্ট করেছে?'

সে এর উত্তরে যা বলল তা দেয়ালটা সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি পাল্টে দিল, নিজের সম্পর্কে ধারণা তো পাল্টালই। জীবনের অন্যান্য দিকগুলোও পাল্টে গেল। সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি ওই খারাপ ইট দুটো দেখেছি, কিন্তু আমি সেই সাথে ৯৯৮টা ভালো ইটও দেখেছি।'

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে এই প্রথমবার আমি দুটো ভুলের পাশাপাশি অন্যান্য ভালো ইটগুলোকেও দেখলাম। সেই খারাপ ইটগুলোর উপরে, নিচে, বামে, ডানে ছিল ভালো ইট, সুন্দরভাবে সাজানো ইট। তা ছাড়া সুন্দরভাবে সাজানো ইটগুলো ছিল দুটো খারাপ ইটের তুলনায় বহু বহুগুণ বেশি। আগে আমার দৃষ্টি পড়ে থাকত কেবল আমার দুটো ভুলের উপরে, বাকি সব বিষয়ে আমি ছিলাম অন্ধ। অবশ্যই আমি দেয়ালের দিকে তাকাতে পারতাম না, অন্য কাউকেও তা দেখাতে কুণ্ঠিত ছিলাম। এজন্যই আমি দেয়ালটাকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলাম। এখন আমি ভালো ইটগুলো দেখতে পেয়েছি, দেয়ালটা এখন আর অত খারাপ দেখাচ্ছে না। এটা ছিল সেই অতিথির কথায় 'একটা সুন্দর ইটের দেয়াল'। দেয়ালটা এখনো সেখানে আছে, কিন্তু বিশ বছর পরে আমি এখন ভুলে গেছি, সেই দুটো খারাপ ইট দেয়ালটার ঠিক কোন জায়গায় আছে। আক্ষরিক অর্থেই এখন আর আমি সেই ভুলগুলোকে দেখি না।
কত লোক তাদের সম্পর্ককে শেষ করে দেয় অথবা বিবাহবিচ্ছেদ করে, কারণ তারা শুধুমাত্র তাদের সঙ্গীর 'দুটো খারাপ ইট'কেই দেখে? আমাদের মধ্যে কতজন হতাশ হয়ে পড়ি, এমনকি আত্মহত্যা করার কথাও ভাবি, কারণ আমরা আমাদের মাঝে কেবল 'দুটো খারাপ ইট'কেই দেখি? সত্যি কথা হচ্ছে, দোষগুলোর উপরে, নিচে, বামে, ডানে অনেক অনেক ভালো ইট, সাজানো ইট আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা সেগুলোকে দেখি না। তার বদলে প্রতিবার আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ভুলগুলোর উপরে। আমরা দেখি কেবল ভুলগুলো, ভাবি কেবল সেগুলোরই কথা, তাই আমরা সেগুলোকে ধ্বংস করতে চাই। আর দুঃখের কথা যে, মাঝে মাঝে আমরা সত্যিই এভাবে 'খুব সুন্দর দেয়াল'কে ধ্বংস করে দিই।

আমাদের সবারই দুয়েকটা খারাপ ইট আছে, কিন্তু সুন্দর, সাজানো ইট আছে খারাপগুলোর চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। যখন আমরা এভাবে দেখি, তখন

কোনো কিছু আর অতটা খারাপ বলে মনে হয় না। এতে করে আমরা আমাদের ত্রুটি দেখেও নিজেদের মেনে নিয়ে শান্তিতে থাকি। শুধু নিজেদের নিয়েই নয়, সঙ্গীদের সাথে থাকাটাও তখন আমরা উপভোগ করি। এটা বিবাহবিচ্ছেদের উকিলদের জন্য খারাপ খবর হতে পারে, কিন্তু আপনার জন্য ভালো খবর।

আমি এই গল্পটা অনেকবার বলেছি। একবার এক মিস্ত্রি আমার কাছে তাদের একটা পেশাগত গোপনীয় তথ্য জানাল। সে বলল, 'আমরা মিস্ত্রিরা সব সময় ভুল করি, কিন্তু আমরা কাস্টমারদের বলি যে এটা একটা নতুন ডিজাইন, যা আশেপাশের কোনো বাড়িতে নেই। আর এর জন্য আমরা তাদের কাছ থেকে আরও অতিরিক্ত কয়েক হাজার ডলার আদায় করি।'

কাজেই আপনার বাড়িটার অনন্য ডিজাইনটাই হয়তো একটা ভুল থেকে শুরু হয়েছে। একইভাবে যেটাকে আপনি আপনার ভুল, আপনার সঙ্গীর ভুল বা সাধারণভাবে জীবনের ভুল হিসেবে ভাবছেন, সেটাই হয়তো অনন্য বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠতে পারে, আপনার সময়কে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারে, যখন আপনি 'শুধুমাত্র তাদের' দেখা বন্ধ করবেন।

বিহারের বাগান

জাপানের বৌদ্ধ বিহারগুলো তাদের বাগানের জন্য বিখ্যাত। অনেক বছর আগে সেখানে এক বিহার ছিল যা তার অসাধারণ সুন্দর বাগানের জন্য গর্ব করত। সারা দেশ থেকে লোকজন আসত শুধুমাত্র এর মনকাড়া সাজসজ্জা ও সুন্দর নান্দনিকতা উপভোগের জন্য।

একবার এক বৃদ্ধ ভিক্ষু সেখানে বেড়াতে এলো। সে খুব সকালে এসে পৌঁছল, ভোর হওয়ার পরপরই। সে আবিষ্কার করতে চাইল, কেন এই বাগানটা সবচেয়ে প্রেরণাদায়ী বলে খ্যাত? তাই সে একটা বড় ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল, যেখান থেকে পুরো বাগানটা দেখা যায়।

সে দেখল এক তরুণ ভিক্ষু বিহার থেকে হাতে দুটো বড় ঝুড়ি নিয়ে বের হলো। পরের তিন ঘণ্টা ধরে বুড়ো ভিক্ষুটি দেখল যে, তরুণ ভিক্ষুটি সাবধানে প্রত্যেকটি পাতা ও ডালপালা কুড়িয়ে নিল যেগুলো বাগানের মাঝে থাকা গাছটি হতে ঝরে পড়েছিল। প্রত্যেকটি পাতা ও ডাল তুলে নিয়ে সে তার কোমল হাতে এটিকে উল্টে পাল্টে দেখল, পরীক্ষা করল, গভীরভাবে এটি নিয়ে ভাবল। পছন্দ হলে সে এটিকে একটি ঝুড়িতে রাখল। পছন্দ না হলে সে সেটি দ্বিতীয় ঝুড়িতে রাখল, যেটি হচ্ছে আবর্জনার ঝুড়ি। প্রত্যেকটি পাতা ও ডাল কুড়িয়ে নিয়ে
সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এরপর সে আবর্জনার ঝুড়িটি বিহারের পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে খালি করল, আর একটু থেমে চা পান করল। এরপর সে তার মনকে প্রস্তুত করল পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপের জন্য।

তরুণ ভিক্ষুটি আরও তিন ঘণ্টা ব্যয় করে গভীর মনোযোগ দিয়ে, যত্ন ও দক্ষতার সাথে প্রত্যেকটি পাতা ও ডালকে বাগানের একেবারে সঠিক জায়গায় বসাল। যদি কোনো ডালের অবস্থান তার মনের মতো না হতো, সে এটাকে সামান্য ঘোরাত, অথবা সামান্য সামনের দিকে সরিয়ে দিত, যতক্ষণ না তার মুখে সন্তুষ্টির স্মিত হাসি ফুটে উঠত। এরপর সে পরবর্তী পাতাটার আকার ও রং থেকে বাগানে এর সঠিক জায়গাটা বেছে নিত। খুঁটিনাটি সবকিছুর প্রতিও তার মনোযোগ

ছিল অতুলনীয়। রং ও আকারের সাজসজ্জায় তার দক্ষতা ছিল অপুর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তার ছিল গভীর জ্ঞান। তার কাজ শেষ হলে বাগানটাকে অনিন্দ্য সুন্দর দেখাল।

এরপর বুড়ো ভিক্ষুটা বাগানে বেরিয়ে এলো। ভাঙা দাঁতের পিছন থেকে একটা হাসি দিয়ে সে তরুণ ভিক্ষুটিকে অভিনন্দন জানাল, 'চমৎকার! চমৎকার হয়েছে ভন্তে আমি তোমাকে সারাটা সকাল ধরে লক্ষ করেছি। তোমার অধ্যবসায় সর্বোচ্চ প্রশংসার যোগ্য। আর তোমার বাগান ... হুম! তোমার বাগানটা প্রায় নিখুঁত হয়েছে।'

তরুণ ভিক্ষুটির মুখ সাদা হয়ে গেল। তার শরীর শক্ত হয়ে গেল যেন কাঁকড়াবিছে কামড়েছে। তার মুখ থেকে আত্মসন্তুষ্টির হাসি খসে পড়ল, আর সে যেন শূন্যতার এক গভীর খাদে পড়ে গেল। জাপানে, বুড়ো হাসিখুশি ভিক্ষুদের বিষয়ে আপনি কখনোই নিশ্চিত থাকতে পারবেন না।

সে ভয়ে ভয়ে তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'আপনি কী - কী বলতে চান? প্রায় নিখুঁত বলতে আপনি কী - কী বুঝাতে চান?' আর সে বুড়ো ভিক্ষুটির পায়ে পড়ে গেল। 'ও প্রভু, ও আমার গুরু, প্লিজ, আপনার দয়া আর মৈত্রী বষর্ণ করুন আমার উপরে। নিশ্চয়ই বুদ্ধ আপনাকে পাঠিয়েছেন আমার বাগানকে কীভাবে আরও নিখুঁত করা যায় তা দেখাতে। আমাকে শিখিয়ে দিন, ও মহাজ্ঞানী, আমাকে পথ দেখান!'

'তুমি কি সত্যিই চাও আমি তোমাকে দেখিয়ে দিই?' বুড়ো ভিক্ষুটি জিজ্ঞেস করল। তার বয়স্ক চেহারায় সামান্য দুষ্টুমির ছাপ!

'জ্বি হ্যাঁ, দয়া করে দেখান, প্লিজ, মাস্টার!'

অতএব বুড়ো ভিক্ষুটি বাগানের মাঝে হেঁটে গেল। সে তার জীর্ণ কিন্তু এখনো সবল দুটো হাত সেই পাতাবহুল গাছটার উপর রাখল। এরপর বিরাট একটা সাধুমার্কা হাসি দিয়ে সে বেচারা গাছটাকে বিশাল একটা ঝাঁকুনি দিল! পাতা, ডালপালা আর বাকল ছড়িয়ে পড়ল সবখানে, কিন্তু সে ঝাঁকাতেই থাকল গাছটাকে। যখন আর ঝরার মতো কোনো পাতা রইল না, তখন সে থামল।

তরুণ ভিক্ষুটি স্তব্দ হয়ে গেল। তার বাগান ধ্বংস হয়ে গেল। সারা সকালের কাজ পুরো বরবাদ। বুড়ো ভিক্ষুটিকে মেরে ফেলার ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু বুড়োটি চারপাশে তাকিয়ে নিজের কীর্তি দেখতে ব্যস্ত তারপরে একটা হাসি - যে হাসিতে রাগ গলে যায় - এমন হাসি দিয়ে সে ভদ্রভাবে তরুণ ভিক্ষুটিকে বলল, 'এখন তোমার বাগানটি সত্যিই নিখুঁত।'

যা করা হয়েছে তা-ই সমাপ্ত

থাইল্যান্ডে বর্ষাকাল হচ্ছে জুলাই থেকে অক্টোবর। এ সময় ভিক্ষুরা বেড়ানো বন্ধ করে, তাদের সব কাজ তুলে রাখে আর পড়াশোনা এবং ধ্যানে নিজেকে

ডুবিয়ে রাখে। এই সময়টাকে বলা হয় বর্ষাবাস।

থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে কয়েক বছর আগে একজন বিখ্যাত ভিক্ষু তার বনবিহারের জন্য একটা নতুন হল বানাচ্ছিল। যখন বর্ষা এলো, সে সব কাজ বন্ধ করল, আর নির্মাণকারীদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। তার বিহারে এই সময়টা ছিল নিরবতার সময়।

কয়েক দিন পরে এক দর্শনার্থী আসল, অর্ধনির্মিত বিল্ডিংটা দেখল, আর অধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করল, কখন তার বিল্ডিংটা সম্পূর্ণ হবে। ইতস্তত না করেই বুড়ো ভিক্ষুটি বলল, 'হলটি সমাপ্ত।'

'হলটি সমাপ্ত' মানে কী বলতে চাচ্ছেন?' অবাক হয়ে দর্শনার্থী জানতে চাইল। 'এর ছাদটাও এখনো দেয়া হয় নি। দরজা নেই, জানালা নেই, সারা ফ্লোর জুড়ে কাঠের টুকরো আর সিমেন্টের বস্তা ছড়িয়ে আছে। আপনি কি এটাকে এভাবেই রেখে দেবেন? আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? হলটি সমাপ্ত - কথার মানে কী?'
বুড়ো অধ্যক্ষ হেসে ভদ্রভাবে উত্তর দিল, 'যা করা হয়েছে, তা-ই সমাপ্ত।' এই বলে সে ধ্যান করতে চলে গেল। এভাবেই কাজের মাঝে একটা ব্রেক নিতে হয়। তা না-হলে আমাদের কাজ কখনোই শেষ হবার নয়।

মনের শান্তির জন্য বোকাদের গাইড

আমি এক শুক্রবার পার্থে বহুসংখ্যক শ্রোতার সামনে আগের গল্পটা বলেছিলাম। পরের দিন রোববার এক ক্রুদ্ধ পিতা এসে আমাকে বকা দিল। সে তার কিশোর ছেলেকে নিয়ে শুক্রবারের ওই দেশনাটা শুনেছিল। শনিবার সন্ধ্যায় ছেলেটি বন্ধুদের নিয়ে বাইরে যেতে চাইল। তার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, তুমি কি তোমার বাড়িকাজগুলো করেছ?' তার ছেলে জবাব দিল, 'বাবা, আজান ব্রহ্ম গত রাতে আমাদের যেভাবে শিখিয়েছেন, যা করা হয়েছে, তা-ই সমাপ্ত। পরে দেখা হবে।'

পরের সপ্তাহে আমি আরেকটা গল্প বললাম।

অস্ট্রেলিয়ার বেশির ভাগ লোকেরই তাদের বাড়িতে একটা করে বাগান আছে। কিন্তু কেবল গুটি কয়েকজন জানে, কী করে তাদের বাগানে শান্তি খুঁজে নিতে হয়। অন্যদের জন্য বাগান হলো কাজ করার জায়গা। তাই আমি সেই বাগানওয়ালাদের কিছুক্ষণ বাগানে কাজ করে এটিকে আরও সুন্দর করে তুলতে উৎসাহিত করি, আর তাদের মনের সৌন্দর্যের জন্য শান্ত হয়ে বাগানে বসে থাকতে বলি, প্রকৃতির উপহারকে উপভোগ করার জন্য বলি।

প্রথমবোকা ভাবে, এটা তো খুব ভালো কথা। তাই তারা প্রথমে ছোটখাট কাজগুলো করে ফেলতে মনস্থির করে। এর পরে তারা তাদের বাগানে কয়েক মুহূর্ত শান্তি উপভোগ করতে পারবে। যেহেতু বাগানের ঘাসগুলো ছাঁটা দরকার, ফুলগাছে একটু পানি দিলে ভালো হয়, পাতাগুলো কুড়ালে ভালো হয়,

ঝোপগুলো ছোট করা দরকার, পথটা ঝাড়ু দেওয়া দরকার... এই 'ছোটখাট কাজ' সমাধা করতেই তাদের পুরো অবসর সময় চলে যায়। তাদের কাজ কখনোই শেষ হয় না। আর তাই তারাও কয়েক মিনিটের জন্য মনে শান্তি পায় না। আপনি কি খেয়াল করেছেন, আমাদের সমাজে কেবল কবরে থাকা লোকেরাই শান্তিতে বিশ্রাম নেয়?

দ্বিতীয় বোকারা ভাবে যে তারা প্রথমবোকা থেকে চালাক। তারা ঝাড়ু, পানি দেওয়ার বালতি, সবকিছু দূরে সরিয়ে রেখে বাগানে বসে বসে কোনো একটা ম্যাগাজিন পড়তে থাকে, সম্ভবত বড় বড় ঝকঝকে প্রকৃতির ছবিওয়ালা ম্যাগাজিন। কিন্তু সেটা তো ম্যাগাজিনকে উপভোগ করা, বাগানে শান্তি খুঁজে পাওয়া নয়।

তৃতীয় বোকা বাগানের সব যন্ত্রপাতি দূরে ফেলে দেয়, সব ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র, রেডিও সবকিছু সরিয়ে রাখে আর বাগানে শুধু শান্তিতে বসে থাকে... মাত্র দু সেকেন্ডের জন্য! এরপর তারা ভাবতে শুরু করে : 'বাগানের ঘাসগুলো আসলেই ছাঁটা দরকার। আর ওই ঝোপগুলো শীঘ্রই ছাঁটা উচিত। যদি আমি ওই ফুলগুলোতে পানি না দিই, কয়েক দিনের মধ্যেই সেগুলো মারা যেতে পারে। ওই কোণায় একটা সুন্দর গার্ডেনিয়ার ঝোপ লাগালে ভালো হবে। ইয়েস! সামনে ওই পাতাবাহারগুলো হলে দারুণ দেখাবে। আমি নার্সারি থেকে একটা আনতে পারি...' অর্থাৎ সে উপভোগ করছে চিন্তা ও পরিকল্পনাকে। সেখানে কোনো মনের শান্তি নেই।

চালাক বাগানকারী ভাবে, 'আমি অনেকক্ষণ কাজ করেছি। এখন আমার কাজের ফল উপভোগের সময়। শান্তির পদধ্বনি শোনার সময়। তাই বাগানের ঘাসগুলো হয়তো ছাঁটার দরকার, ঝরা পাতাগুলো কুড়ানো দরকার... ইত্যাদি ইত্যাদি! কিন্তু সেগুলো এখন নয়।' এভাবে আমরা বাগানকে উপভোগ করার জ্ঞান অর্জন করতে পারি, যদিও বাগানটা নিখুঁত নয়।

সম্ভবত ঝোপের আড়ালেই কোথাও লুকিয়ে আছে সেই বুড়ো জাপানী ভিক্ষুটি, যে ঝাঁপ দিয়ে বাগানে বেরিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত এবং সে এটাই বলতে চায় যে আমাদের হযবরল পুরনো বাগানটি সত্যিই নিখুঁত। প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি যা কাজ করেছি তার হিসাব করি, যা করা বাকি তাতে মন দেওয়ার বদলে, তখন হয়তো বুঝব যে, যা করা হয়েছে তা সমাপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু যদি আমরা কেবল আমাদের দোষ দেখে থাকি, সেই জিনিসগুলো দেখি যেগুলো ঠিক করা দরকার, যেমনটা আমার বিহারের সেই ইটের দেয়ালের মতো, আমরা কখনোই শান্তি খুঁজে পাব না।

বুদ্ধিমান বাগানকারী তাদের পনের মিনিটের শান্তিকে প্রকৃতির নিখুঁত অসম্পূর্ণতার মাঝে উপভোগ করে থাকে। কোনো চিন্তা নেই, কোনো পরিকল্পনা নেই, নিজেকে দোষী ভাবার নেই। আমরা সবাই ন্যায্যত কিছু শান্তি উপভোগ করার যোগ্য। আর অন্যরা ন্যায্যত আমাদের শান্তিকে তাদের পথের বাইরে রাখতে পারে। অতঃপর আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ জীবন বাঁচানো পনের মিনিটের শান্তিকে বের করে নিয়ে আমরা আমাদের বাগানের কাজে আবার হাত দিই।

যখন আমরা আমাদের বাগানে কীভাবে শান্তি খোঁজা যায়, তা বুঝতে পারি, তখন যেকোনো সময়ে যেকোনো জায়গায় কী করে শান্তি খুঁজে পেতে হয় তাও

জেনে যাব। বিশেষভাবে আমরা জানব কী করে আমাদের হৃদয়ের বাগানে শান্তি খুঁজে পেতে হয়, যদিও মাঝে মাঝে আমাদের মনে হতে পারে, সবকিছু এত অগোছালো আর কত কী যে করার বাকি রয়ে গেছে এখনো!

অপরাধবোধ ও তা থেকে মুক্তি

কয়েক বছর আগে এক অস্ট্রেলিয়ান তরুণী পার্থে আমাদের বিহারে আসল আমার সাথে দেখা করতে। ভিক্ষুদের প্রায়ই খোঁজা হয় লোকজনের সমস্যাগুলো সম্পর্কে পরামর্শ চাওয়ার জন্য, এর কারণ সম্ভবত আমরা খুব সস্তা। আমরা পরামর্শ দিই, কিন্তু বিনিময়ে কোনো ফি দাবি করি না। তো, অপরাধবোধে সেই তরুণীর হৃদয় ভারাক্রান্ত ছিল। ছয় কি সাত মাস আগে, সে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উত্তর প্রান্তে একটি প্রত্যন্ত খনি অঞ্চলে কাজ করত। কাজটি পরিশ্রমের হলেও টাকা ভালোই দিত। তবে কাজের সময়ের পরে করার মতো তেমন কিছু থাকত না। তাই সে এক রবিবার বিকেলে তার সেরা বান্ধবী এবং তার বান্ধবীর বয়ফ্রেন্ডকে বলল, গাড়িতে করে একটু বের হলে কেমন হয়। তার বান্ধবী যেতে চাচ্ছিল না, ছেলেটাও নয়, কিন্তু একা গিয়ে তো আর মজা নেই। যতক্ষণ না তারা রাজি হলো, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মিষ্টি কথায় তাদের ভোলানোর চেষ্টা করল, তর্ক করল, আর প্যানপ্যানানি চালিয়ে গেল।

কিন্তু যাওয়ার পথে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ঝুরঝুরে নুঁড়ি পাথরে গাড়িটি সিল্প করে গড়িয়ে গেল। তার বান্ধবী মারা গেল, আর বান্ধবীর বয়ফ্রেন্ডটি পঙ্গু হয়ে গেল। বেড়াতে যাওয়ার বুদ্ধিটা ছিল তরুণীটির, কিন্তু তার কিছু হয় নি। সে আমাকে বেদনাভরা চোখে বলল, 'আমি যদি তাদের যাওয়ার জন্য জোর না করতাম, তাহলে সে এখনো এখানে বেঁচে থাকত। তার বয়ফ্রেন্ডের এখনো পা থাকত। আমার তাদের জোর করা উচিত হয় নি। আমার খুব খারাপ লাগে। আমি নিজেকে এমন অপরাধী বলে বোধ করি।'

আমার মনে যে প্রথমচিন্তাটা আসল তা ছিল তাকে আশ্বস্ত করা যে এটা তার দোষ নয়। সে তো আর দুর্ঘটনার পরিকল্পনা করে নি। তার বন্ধুদের আহত করারও কোনো ইচ্ছে তার ছিল না। এমন ঘটনা ঘটে। এটাকে যেতে দাও। নিজেকে অপরাধী ভেবো না। কিন্তু আরেকটা চিন্তা মাথায় আসল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে এই কথাটা সে এর আগে শতবার শুনেছে, আর দেখে বোঝা যাচ্ছে এতে কাজ হয় নি।' তাই আমি একটু সময় নিলাম, তার অবস্থাকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলাম, এরপর আমি তাকে বললাম, ভালো যে তুমি নিজেকে অপরাধী মনে করছ।
তার মুখের চেহারায় বেদনা থেকে বিস্ময় দেখা দিল, আর বিস্ময়ের পরে এলো স্বস্তি। নিজেকে অপরাধী ভাবা উচিত - এমন কথা সে এর আগে শোনেনি। আমার অনুমান ঠিক ছিল। তার অপরাধবোধের জন্য সে নিজেকে অপরাধী ভাবত। অথচ অন্যরা তাকে বলত, নিজেকে অপরাধী ভেবো না। এতে সে দ্বিগুণ 'অপরাধী' মনে করত নিজেকে - যার একটা হচ্ছে দুর্ঘটনার জন্য, আরেকটা হচ্ছে নিজেকে অপরাধী ভাবার জন্য। আমাদের জটিল মন এভাবেই কাজ করে।

আমরা যখন প্রথম স্তরের অপরাধবোধ নিয়ে কাজ করলাম, আর নিজেকে অপরাধী ভাবাটাই সঠিক বলে মেনে নিলাম, কেবল তখনই সমাধানের দ্বিতীয় ধাপে এগোন গেল। এবার এটা নিয়ে কী করা যায়?

একটা বৌদ্ধ প্রবাদ আছে, ‘অন্ধকার নিয়ে অভিযোগ না করে বরং একট মোমবাতি জ্বালাও।’

মন খারাপ করার বদলে সব সময়ই আমরা একটা কিছু করতে পারি, সেই একটা কিছু যদি হয় অভিযোগ না করে শুধু শান্তভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকা, সেটাও সঠিক একটা কাজ।

অনুশোচনা থেকে অপরাধবোধ যথেষ্ট ভিন্ন আমাদের সংস্কৃতিতে ‘অপরাধী’ হচ্ছে আদালতের বিচারকের দ্বারা শক্ত কাঠের উপরে হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে বের করা রায়। আর যদি কেউ আমাদের শাস্তি না দেয়, আমরা নিজেদের শাস্তি দেওয়ার পথ খুঁজি, এক পথে না হয় অন্য পথে। অপরাধবোধ হচ্ছে আমাদের মনের গভীরের শাস্তি।

তাই তরুণীটির অপরাধবোধ থেকে মুক্তির জন্য দরকার ছিল প্রায়শ্চিত্ত। ভুলে যেতে বলা আর জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বলাতে কাজ হতো না। আমি পরামর্শ দিলাম যে সে স্থানীয় হাসপাতালগুলোর পুনর্বাসন শাখায় স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে পারে, গাড়ি দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা করতে পারে। আমি চিন্তা করেছিলাম, সেখানে কঠোর শ্রম দিয়ে সে তার অপরাধবোধকে ক্ষয় করতে পারবে। আর সেই সাথে স্বেচ্ছাশ্রমে সাধারণত যেমন হয়, সে যাদের সাহায্য করতে সেখানে কাজ করবে, তারাই উল্টো তাকে নিজেকে ফিরে পেতে বেশি করে সাহায্য করবে।

অপরাধীদের অপরাধবোধ

বিহারাধ্যক্ষ হওয়াটা সম্মানের, কিন্তু কাজের চাপ প্রচুর। এই পদটা চাপিয়ে দেওয়ার আগে আমি প্রায়ই পার্থের জেলখানাগুলোতে যেতাম। আমি খুব নিখুঁতভাবে জেলখানায় কত ঘণ্টা সার্ভিস দিয়েছি তার একটা হিসেব রেখেছি। বলা তো যায় না, যদি কখনো জেলখানায় যেতে হয়, তখন তা উপকারে আসতে পারে।
পার্থের বড় জেলখানাটায় প্রথমবার গিয়েছিলাম ধ্যানের উপরে দেশনাত দেওয়ার জন্য। দেশনা শুনতে এত কয়েদি হাজির হয়েছিল যে আমি রীতিমতো অবাক ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। রুমটা একেবারে ভরে গিয়েছিল। কয়েদিদের মধ্যে ৯৫% উপস্থিত হয়েছিল ধ্যান শেখার জন্য। আমি যতই কথা বলতে লাগলাম, ততই তাদের উসখুস বাড়তে লাগল। দশ মিনিট যেতে না যেতেই কয়েদিদের একজন, যে ছিল দাগী আসামীদের অন্যতম, সে তার হাত তুলল প্রশ্ন করার জন্য। আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে দিলাম। সে বলল, ‘এটা কি সত্যি যে ধ্যানের মাধ্যমে শূন্যে ভাসাটা শেখা যায়?’

তখনই আমি জানলাম, কেন এতজন কয়েদি ধ্যান শিখতে চায়। তারা সবাই ধ্যান শেখার প্ল্যান করছে শূন্যে ভেসে ভেসে জেলখানার দেয়াল টপকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি বললাম যে এটা সম্ভব, কিন্তু শুধু অসাধারণ ধ্যানীদের জন্য, আর তাও বহু বছরের ট্রেনিংয়ের পরে। এর পরের বার যখন গেলাম, মাত্র চারজন কয়েদি দেশনা শুনতে হাজির হয়েছিল।

এত বছর জেলখানায় শিক্ষা দেওয়ার সময়ে কয়েকজন কয়েদির সাথে আমার খুব ভালো পরিচয় হয়ে গেছে। একটা বিষয় আমি দেখেছি যে প্রত্যেক

অপরাধীই তাদের কৃতকর্মের জন্য মনে মনে অপরাধবোধে ভুগে থাকে। তারা এটা দিনে রাতে অনুভব করে, তাদের মনের গভীরে। তারা এটা প্রকাশ করে শুধু তাদের কাছের বন্ধুদের কাছে। প্রকাশ্যে কিন্তু তারা এটা অস্বীকার করে। কিন্তু যখন আপনি তাদের বিশ্বাসভাজন হবেন, যখন আপনি তাদের আধ্যাত্মিক গুরু হয়ে উঠবেন কিছু সময়ের জন্য, তখন তারা সবকিছু খুলে বলে এবং তাদের করুণ ও বেদনাদায়ক অপরাধকে প্রকাশ করে। আমি প্রায়ই তাদের নিচের গল্পটি শুনিয়ে একটু সাহায্য করি। গল্পটা হচ্ছে বি ক্লাসের বাচ্চাদের গল্প।

বি ক্লাসের শিশুরা

অনেক বছর আগে ইংল্যান্ডের কোনো এক স্কুলে গোপনে একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল শিক্ষার উপরে। সেখানে একই বয়সের বাচ্চাদের জন্য দুটো ক্লাস ছিল। বছর শেষে একটা পরীক্ষা নেওয়া হলো, যেখান থেকে ছেলেমেয়েদের পরবর্তী ক্লাসে ওঠার জন্য বাছাই করা হলো। কিন্তু সেই পরীক্ষার ফলাফল কখনোই প্রকাশ করা হয়নি। খুব গোপনে, যা শুধু অধ্যক্ষ এবং মনস্তত্ত্ববিদরা জানতেন, যে শিশুটি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল, তাকে ফেলে দেওয়া হলো চতুর্থ ও পঞ্চম, অষ্টম ও নবম, বারতম ও তেরতম ইত্যাদি স্থান পাওয়া শিশুদের সাথে।

দ্বিতীয়, তৃতীয় হওয়া শিশুদের অন্য ক্লাসে নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে আরও ছিল ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম ও একাদশ ইত্যাদি স্থানপ্রাপ্ত শিশুরা। অর্থাৎ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছেলেমেয়েদের দুটো ক্লাসে সমান করে ভাগ করে দেওয়া হলো। পরের বছরের জন্য সমান দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকও নির্বাচন করা হলো খুব সতর্কতার সাথে। দুটো ক্লাসের জন্য শেণ্রী কক্ষগুলোও নির্বাচন করা হলো সমান সুযোগ-সুবিধাসহ। সবকিছুতেই যথাসাধ্য সমতা আনার চেষ্টা করা হলো, শুধু একটা জিনিস বাদে। আর তা হলো, একটা ক্লাসের নাম দেওয়া হলো ‘ক্লাস এ’; অন্যটা ‘ক্লাস বি’।

প্রকৃতপক্ষে দুটো ক্লাসেরই শিশুরা ছিল সমান দক্ষতাসম্পন্ন কিন্তু প্রত্যেকের মনে এই ধারণা হলো যে এ ক্লাসের শিশুরা অনেক চালাক। আর বি ক্লাসের শিশুরা অতটা চালাক নয়। এ ক্লাসের শিশুদের মধ্যে কয়েকজনের বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েদের এমন সাফল্যের কথা শুনে রোমাঞ্চিত হলেন এবং তাদের আদর ও প্রশংসা দিয়ে পুরস্কৃত করলেন, যেখানে বি ক্লাসের শিশুদের কয়েকজনের বাবা মা তাদের বাচ্চাদের ভালোমতো পড়াশোনা না করার জন্য বকা দিলেন, আর কিছু সুবিধা তুলে নিলেন। এমনকি শিক্ষকেরাও বি ক্লাসের শিশুদের অন্যভাবে পড়াত। তাদের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু আশা করত না। এক বছর ধরে এমনটা চলল। অবশেষে বার্ষিক পরীক্ষা এলো।

ফলাফলটা ছিল ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার মতো, যদিও এমনটাই আশা করা হয়েছিল। এ ক্লাসের শিশুরা বি ক্লাসের শিশুদের চেয়ে অনেক ভালো করেছে। এ ক্লাসের বাচ্চারা যেন গত বছরের বার্ষিক পরীক্ষার মেধাতালিকার প্রথম অর্ধেক দল! তারা এখন এ ক্লাসের ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। অন্য ক্লাসের বাচ্চারা, যদিও গত বছর সমানে সমান ছিল, তারা এখন বি ক্লাসের ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। সমান মেধা ও যোগ্যতা থাকা সত্তে ও সারা বছর ধরে তাদের বি ক্লাসের ছাত্রছাত্রী বলা হয়েছে। বি ক্লাসের ছেলেমেয়ে হিসেবেই আচরণ করা হয়েছে তাদের সাথে। আর সেটাই তারা বিশ্বাস করেছে, তারা সেটাই হয়ে গেছে।

সুপার মার্কেটের সেই ছেলেটি

আমি আমার ‘কয়েদি বন্ধু’দের বলি তারা যেন নিজেদের অপরাধী না ভাবে। বরং তারা যেন ভাবে তারা সে-ই ব্যক্তি, যে কোনো অপরাধমূলক কাজ করেছে। কারণ, যদি তাদের বলা হয় যে তারা অপরাধী, যদি তাদের সাথে অপরাধীসুলভ আচরণ করা হয়, যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা অপরাধী, তখন তারা অপরাধী হয়ে ওঠে। এভাবেই ব্যাপারটা ঘটে।

এক সুপার মার্কেটে জিনিসপত্র কিনতে এসে এক বালকের হাত থেকে দুধের প্যাকেট পড়ে গেল। প্যাকেটটি ফেটে গিয়ে দুধ ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। ‘বোকা ছেলে কোথাকার!’ তার মা তাকে বকা দিল।

ঠিক তার পাশের সারিতেই অন্য এক বালকের হাত থেকে এক প্যাকেট মধু পড়ে গেল। প্যাকেটটি ফেটে গিয়ে মধু ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। ‘তুমি একটা বোকার মতো কাজ করেছ।’ তার মা তাকে বলল।

প্রথমবাচ্চাটি সারা জীবনের জন্য বোকাদের দলে পড়ে গেল। অন্য বালকটাকে শুধুমাত্র তার ভুলটা দেখিয়ে দেওয়া হলো। প্রথমজন সম্ভবত বোকা হয়েই বেড়ে উঠবে। অন্যজন বোকার মতো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে শিখবে।

আমি আমার জেলখানার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করি, তাদের অপরাধের দিনটাতে তারা আরও কী কী করেছিল। সেই বছরের অন্যান্য দিনে তারা কী কী করেছিল? তাদের জীবনের অন্যান্য বছরগুলোতে তারা কী কী করেছিল? এরপর আমি আমার ইটের দেয়ালটার গল্প শোনাই তাদের। দেয়ালের গায়ে অন্যান্য অনেক ইট রয়েছে যেগুলো অপরাধ নয়, বরং জীবনের অন্যান্য ভালো দিকগুলোরও প্রতিনিধিত্ব করে। প্রকৃতপক্ষে খারাপ ইটের চেয়ে ভালো ইটের সংখ্যা সব সময়ই অনেক অনেক বেশি। এখন, আপনি কি একটা খারাপ দেয়াল, যাকে ভেঙে ফেলাই উচিত? নাকি আপনি একটি ভালো দেয়াল, যেখানে বাদবাকি সবার মতোই আপনারও রয়েছে কয়েকটা মাত্র খারাপ ইট?

কয়েক মাস পরে বিহারাধ্যক্ষ হওয়াতে আমি জেলখানায় যাওয়া ছেড়ে দিই। পরে একটা ব্যক্তিগত ফোনকল পাই জেলখানার পুলিশ অফিসারদের একজনের কাছ থেকে। সে আমাকে আবার জেলখানায় যাওয়ার আমন্ত্রন জানায়। সে আমাকে এমন একটা প্রশংসাসূচক বাক্য বলে যা আমি সযত্নে মনের মণিকোঠায় সংরক্ষণ করে রেখেছি। সে আমাকে বলেছিল যে, আমার জেলখানার বন্ধুরা, আমার ছাত্ররা, তারা তাদের সাজার মেয়াদ পূর্ণ করে ছাড়া পেয়ে আর কখনোই জেলখানায় ফিরে আসে নি।

আমরা সবাই অপরাধী

আগের গল্পে আমি জেলখানায় যাদের নিয়ে কাজ করেছি, তাদের সম্পর্কে বলেছি। কিন্তু এর বার্তা শুধু জেলখানার বন্দীদের জন্য নয়, বরং বিবেকের অপরাধবোধে বন্দী যেকোনো জনের জন্যই এটা প্রযোজ্য। সেই ‘অপরাধ’ যার জন্য আমরা নিজেদের অপরাধী ভাবি - সেটি ছাড়াও সেই দিনে, সেই বছরে,

অন্যান্য বছরগুলোতে আমরা আর কী কী করেছি? আমরা কি দেয়ালের অন্যান্য ইটগুলোও দেখতে পাচ্ছি? আমরা কি সেই বোকার মতো কাজ - যার জন্য আমরা অপরাধবোধে ভুগছি - তার বাইরেও দেখতে পাচ্ছি? আমরা যদি বি ক্লাসের কাজের উপর বেশি মনোযোগ দিই, তাহলে হয়তো বি ক্লাসের লোক হয়ে উঠতে পারি। যার কারণে আমরা আমাদের ভুলগুলো করতেই থাকি, আর অপরাধবোধের পরিমাণ বাড়িয়ে চলি। কিন্তু যখন আমরা জীবনের অন্যান্য অংশকেও দেখি, দেয়ালের অন্যান্য ইটগুলোকেও দেখি, যখন আমরা বাস্তবি দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করি, তখন আমাদের মনে একটা চমৎকার অন্তর্দৃষ্টির ফুল ফুটে ওঠে : 'আমরা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য।'

অপরাধবোধকে যেতে দেওয়া, চিরদিনের জন্য

অপরাধবোধ থেকে মুক্তির পথে সবচেয়ে কঠিন ধাপটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের বুঝানো যে, আমরা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব কাহিনী বলা হলো, এগুলো আমাদের কিছুটা হয়তো সাহায্য করে; কিন্তু এই বন্দীদশা থেকে মুক্তির শেষ ধাপে একাই এগিয়ে যেতে হয়।

আমার এক বন্ধু শৈশবে তার এক সেরা বন্ধুর সাথে খেলছিল একটি ঘাটের পাড়ে। মজা করতে গিয়ে সে তার বন্ধুকে ঠেলে দিল পানিতে। তার বন্ধুটি ডুবে মরল। এরপর থেকে অনেক বছর ধরে সেই বন্ধুটি তার মনের মধ্যে কিলবিল করতে থাকা অপরাধবোধ নিয়ে জীবন কাটাল। তাদের বাড়ির পাশেই তার মৃত বন্ধুর বাবা-মা থাকত। সে বড় হয়ে উঠতে লাগল এই অপরাধবোধ নিয়ে যে সে তাদের সন্তানবঞ্চিত করেছে। এরপর এক সকালে, সে যেমনটা আমাকে বলেছে, সে নাকি উপলব্ধি করেছিল যে তার আর নিজেকে দোষী ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। সে তার নিজের তৈরি কারাগার থেকে বেরিয়ে এলো স্বাধীনতার উষ্ণ হাওয়ায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভালোবাসা ও অঙ্গীকার

নিঃস্বার্থ ভালোবাসা

আমার বয়স তখন তের। আমার বাবা আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে এমন একটা কথা বললেন, যা পরবর্তীকালে আমার জীবনটাকে বদলে দিয়েছিল। আমরা ছিলাম শুধু দুজন, লন্ডনের অন্যতম দরিদ্র একটা এলাকার রাস্তার ধারে, তার বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে পড়া গাড়ির মধ্যে। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বৎস, তুমি জীবনে যা-ই করো না কেন, এটা জেনে রেখো, আমার ঘরের দরজা তোমার জন্য সব সময় খোলা থাকবে।'

আমি তখন কেবল কিশোর। আমি ঠিক বুঝি নি তিনি কী বুঝাতে চেয়েছেন। তবে আমি জানতাম, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। তাই আমি তা মনে রেখেছিলাম। আমার বাবা এর তিন বছর পরে মারা যান।

যখন আমি উত্তরপূর্ব থাইল্যান্ডে এসে ভিক্ষু হলাম। আমি বাবার সেই কথাগুলো ভেবে দেখলাম। তখন আমাদের বাড়ি বলতে ছিল লন্ডনের দরিদ্র এলাকায় একটা ছোট ফ্ল্যাট। সেটা এমন ছিল না যে খোলা পাওয়া যাবে সব সময়। কিন্তু পরে বুঝলাম, বাবা আসলে সেটা বুঝাতে চান নি। আমার বাবার কথার মাঝে লুকানো ছিল আমার জানামতে সবচেয়ে সেরা ভালোবাসার প্রকাশ, যেন কাপড়ে মোড়ানো কোনো অমূল্য রত্নের মতো : 'বৎস, তুমি জীবনে যা-ই করো না কেন, এটা জেনে রেখো, আমার হৃদয়ের দরজা তোমার জন্য সব সময় খোলা থাকবে।'

আমার বাবা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়েছিলেন। কোনো পিছুটান নেই সেখানে, নিঃশর্ত নিঃস্বার্থ আমি তার ছেলে, সেটাই যথেষ্ট। এটি ছিল অপূর্ব! এটি ছিল সত্যি। তিনি আসলেই সেটা বুঝিয়েছিলেন।

কোনো 'যদি' না রেখে আপনার হৃদয়ের দরজা কারো জন্য খুলে দেওয়া, এমন কথা বলতে সাহস লাগে, জ্ঞান লাগে। আমরা হয়তো ভাবতে পারি, তারা আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নেবে। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন নয়, অন্তত আমার অভিজ্ঞতা সেটা বলে না। যখন আপনি অন্যের কাছ থেকে এমন ভালোবাসা পান, সেটা হয় অমূল্য একটা রত্ন উপহার পাওয়ার মতো। আপনি এটাকে সযত্নে আগলে রাখেন, হৃদয়ের কাছাকাছি রেখে দেন, যেন না হারায়। যদিও সেই সময়ে আমি বাবার কথার অর্থ আংশিক মাত্র বুঝেছিলাম, তবুও আমি এমন লোককে মনে আঘাত দেওয়ার সাহস করি নি। যদি আপনি আপনার কোনো কনিষ্ঠ জনকে এমন কথা দেন, যদি আপনি সত্যিই সেরকম ভাবেন, যদি সেই কথাগুলো আসে আপনার হৃদয় থেকে, তাহলে সেই ব্যক্তি আপনার

ভালোবাসা নিয়ে উপরেই উঠবে, নিচে নামবে না।

আপনার হৃদয়ের দরজা খুলে দেওয়া

কয়েক শতাব্দী আগে এশিয়ার কোনো এক জঙ্গলের গুহার মধ্যে সাতজন ভিক্ষু বাস করত। তারা আগের গল্পে উল্লেখিত নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ধ্যান করত। সেখানে ছিল প্রধান ভিক্ষু, তার ভাই ও তার সেরা বন্ধু। চতুর্থজন ছিল প্রধান ভিক্ষুর শত্রু, আর তাদের দুজনের মধ্যে কিছুতেই ভালো সম্পর্ক থাকত না। পঞ্চম ভিক্ষুটি একজন খুব বুড়ো ভিক্ষু, যে এমন বুড়ো হয়ে গিয়েছিল যে এখন মরে তো তখন মরে এমন অবস্থা। ষষ্ঠ ভিক্ষুটি ছিল অসুস্থ এমন অসুস্থ যে তারও প্রাণ যায় যায় অবস্থা। সপ্তম ভিক্ষুটি ছিল সবচেয়ে অকেজো ভিক্ষু। যখন ধ্যান করার কথা, তখন সে নাক ডেকে ঘুমাত। সে তার বন্দনার লাইনগুলো মনে রাখতে পারত না, আর পারলেও বন্দনা করত বেতালে, বেসুরে। সে এমনকি চীবরও পরতে পারত না ঠিকমতো। কিন্তু অন্যরা তাকে সহ্য করত এবং ধৈর্যের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ দিত।

একদিন এক ডাকাতদল গুহাটাকে খুঁজে পেল। জায়গাটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাই তারা এটাকে তাদের ঘাঁটি বানাতে চাইল। তারা সমস্ত ভিক্ষুদের মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। সৌভাগ্যক্রমে প্রধান ভিক্ষু একজ প্রভাবশালী বক্তা ছিল। সে এমনভাবে ব্যবস্থা করল - কীভাবে ব্যবস্থা করল তা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না - যে ডাকাতেরা সব ভিক্ষুকে যেতে দিল, কেবল একজন বাদে, যাকে মেরে ফেলা হবে। তাকে মেরে ফেলা হবে একটা হুঁশিয়ারি হিসেবে, যাতে অন্যরা কাউকে গুহার অবস্থান বলে না দেয়। প্রধান ভিক্ষুটির এর বেশি করার জো ছিল না।

প্রধান ভিক্ষুকে কয়েক মিনিট একা থাকতে দেওয়া হলো, যাতে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কাকে বলি দেবে সে, যাতে অন্যরা মুক্তি পায়।

যখন আমি শ্রোতাদের এই গল্পটা বলি, এই পর্যায়ে এসে আমি তাদের জিজ্ঞেস করি, 'তো, কী মনে হয় আপনাদের? প্রধান ভিক্ষু কাকে বেছে নিয়েছিল?' এমন প্রশ্ন শুনে যাদের চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয়ে আসছিল, তারা একটু নড়েচড়ে বসে, আর যারা ঘুমিয়ে গিয়েছিল তারা ঘুম থেকে জেগে ওঠে। আমি তাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিই যে সেখানে আছে সাতজন ভিক্ষু। প্রধান ভিক্ষু, তার ভাই, তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তার শত্রু, এক বুড়ো ভিক্ষু, এক অসুস্থ ভিক্ষু (দুজনেরই মরি মরি অবস্থা), আর একজন অকেজো হাবাগোবা ভিক্ষু। কাকে সে বেছে নিয়েছিল বলে আপনার মনে হয়?
কেউ কেউ তার শত্রুকে বলে। আমি বলি, 'না।' 'তার ভাই?'
'ভুল।'

সব সময়ই দেখি, সেই অকেজো ভিক্ষুটির নাম উঠে আসে খরচের তালিকায়। কেমন লোক আমরা! খানিক মজা করার পরে আমি উত্তরটা বলে দিই, প্রধান ভিক্ষু কাউকেই বেছে নিতে পারে নি।

সে তার ভাইকে যেমন ভালোবাসত, ঠিক তেমনই ভালোবাসত তার বন্ধুকে, বেশিও নয়, কমও নয়। ঠিক এমনই ভালোবাসা ছিল তার শত্রুর প্রতি, বুড়ো

ভিক্ষুটির প্রতি, অসুস্থ ভিক্ষুটির প্রতি, এমনকি অকেজো ভিক্ষুটির প্রতিও। সে সেই ভালোবাসার কথাগুলো পরিপূর্ণভাবে চর্চা করেছে : 'আমার হৃদয়ের দরজা তোমার জন্য সব সময় খোলা থাকবে, তুমি যা-ই করো না কেন, যে-ই হও না কেন।'

প্রধান ভিক্ষুটির হৃদয়ের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। নিঃশর্ত নিঃস্বার্থ বৈষম্যহীন, মুক্ত ও উদার ভালোবাসা। আর সবচেয়ে বড় কথা, অন্যদের প্রতি তার যেমন ভালোবাসা, ঠিক তেমন ভালোবাসা ছিল তার নিজের প্রতিও। তার হৃদয়ের দরজা তার নিজের জন্যও খোলা ছিল। এ কারণেই সে বলির জন্য অন্যদের তো বেছে নিতে পারে নি, নিজেকেও বেছে নিতে পারে নি।

আমি আমার শ্রোতাদের মধ্যে থাকা ইহুদি আর খ্রিস্টানদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ এই কথা বলে : 'প্রতিবেশীকে নিজের মতোই ভালোবাসো।' নিজের চেয়ে কমও নয়, বেশিও নয়, ঠিক নিজের সমান করে। এর মানে হচ্ছে, নিজেকে আপনি যেমন ভাবেন, অন্যকেও তেমন ভাবা, আর নিজেকেও অন্যদের মতো ভাবা।

কেন এমন হয় যে, শ্রোতাদের বেশির ভাগই মনে করে যে প্রধান ভিক্ষুটি নিজেকেই বেছে নেবে বলির জন্য? আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা এমন কেন, যেখানে আমরা সব সময় নিজেকে বলি দিচ্ছি, আর এটাকেই ভালো চোখে দেখা হচ্ছে?
কেন আমরা নিজেদের প্রতি সবচেয়ে সমালোচনামুখর হয়ে উঠি, আর অন্যদের বাদ দিয়ে নিজেদেরই শাস্তি দিই? এর একটাই কারণ, আমরা এখনো শিখিনি কীভাবে নিজেদের ভালোবাসতে হয়।

যদি অন্যকে এ কথা বলা আপনার পক্ষে কঠিন হয় : 'তুমি যা-ই করো না কেন, আমার হৃদয়ের দরজা তোমার জন্য সব সময় খোলা'। তাহলে এর থেকে শতগুণে কঠিন হবে নিজেকে এরূপ বলা : 'আমি। যতদূর মনে পড়ে যে একজনের সাথে আমি সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছি, সে হচ্ছে আমি নিজেই। আমার হৃদয়ের দরজা আমার জন্যও সব সময় খোলা। আমি যা-ই করি না কেন, সেটা আমার জন্য ব্যাপার নয়। এসো, ভেতরে এসো।'

নিজেদের ভালোবাসা বলতে আমি এটাকেই বুঝাই। এটাকে বলা হয় ক্ষমা। এটা হচ্ছে অপরাধবোধের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসা। এটা হচ্ছে নিজেকে নিয়ে শান্তিতে সহাবস্থান করা। আর আপনি যদি নিজেকে এই কথাগুলো বলার মতো সাহস আনেন, নিজের অন্তরের অন্তস্থলে সেই কথাগুলো গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনি সেই অন্তর্নিহিত ভালোবাসা নিয়ে উপরেই উঠবেন, তলিয়ে যাবেন না।

আমাদের সবারই একদিন নয় একদিন নিজেদের প্রতি এই কথাগুলো বলতে হবে। মজা করার জন্য নয়, খেলার জন্য নয়, সত্যি সত্যিই, আন্তরিকভাবে, সততার সাথে বলতে হবে।

যখন আমরা এটা করি, যেন আমাদের একটা অংশ, যাকে বের করে দেওয়া হয়েছে, যে বাইরের ঠান্ডায় এত দিন ধরে পড়ে ছিল, সে যেন এখন বাড়ি ফিরেছে। আমরা এখন অনুভব করি একত্ব সম্পূর্ণতা। সুখী হওয়ার জন্য এখন আর আমাদের কোনো পিছুটান নেই। যখন আমরা নিজেদের এভাবে

ভালোবাসব, তখনই আমরা জানতে পারব, অন্যকে ভালোবাসা বলতে সত্যিকার অর্থে কী বুঝায়, যা বেশিও নয়, কমও নয়।

আর দয়া করে মনে রাখুন যে, নিজেকে এমন ভালোবাসা দিতে গিয়ে আপনাকে অত নিখুঁত হতে হবে না, অত নির্দোষও হতে হবে না। যদি আপনি পরিপূর্ণতার জন্য অপেক্ষা করেন, নিখুঁত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন, তা কখনো আসবে না। আমরা যা করেছি, করেছি; তা নিয়েই আমাদের হৃদয়ের দরজা খুলে দিতে হবে নিজেদের জন্য। যখন আমরা ভেতরে প্রবেশ করব, তখনই আমরা পরিপূর্ণ।

লোকজন প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, যখন প্রধান ভিক্ষু ডাকাতদলকে বলল যে সে কাউকে বেছে নিতে অক্ষম, তখন সেই সাতজন ভিক্ষুর কপালে কী ঘটেছিল? এই গল্পটা আমি অনেক বছর আগে শুনেছিলাম। সেখানে তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা বলা হয় নি। আমি যতদূর বলেছি, সেখানেই গল্পটির সমাপ্তি। কিন্তু আমি জানি এর পরে কী হয়েছিল। সেটা আমি ভেবে ভেবে বের করে নিয়েছি। যখন প্রধান ভিক্ষুটি ডাকাতদলকে ব্যাখ্যা করে বলল যে সে কেন নিজেকে অথবা অন্যদের কাউকে বলি দেওয়ার জন্য বেছে নিতে পারে নি, আর তাদের ভালোবাসা ও ক্ষমার অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছে, যেমনটি আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিলাম, তখন ডাকাতেরা সবাই এমন মুগ্ধ ও উৎসাহিত হলো যে তারা কেবল ভিক্ষুদেরই যেতে দিল না, নিজেরাও ভিক্ষু হয়ে গেল!

বিয়ে

ব্রহ্মচারী ভিক্ষু হওয়ার পর থেকে আমি অনেক মেয়ের বিয়ে দিয়েছি।

বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে আমার কাজের একটা অংশ হলো বৌদ্ধ বিবাহ অনুষ্ঠানের ধর্মীয় অংশটা সম্পন্ন করা। আমার বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে, বিয়ের আনুষ্ঠানিক কাজ পরিচালনাকারী হলেন একজন গৃহী বৌদ্ধ। কিন্তু দম্পতিদের অনেকেই মনে করে, আমিই তাদের বিয়ে দিয়েছি। কাজেই, আমি অনেক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি, অনেক ছেলেকেও বিয়ে দিয়েছি।

বলা হয়ে থাকে, বিয়েতে তিনটা আংটি থাকে- অ্যানগেজমেন্ট আংটি, বিয়ের আংটি এবং দুঃখের আংটিও!

তাই ঝামেলা আসাটা প্রত্যাশিত। আর যখন ঝামেলা হয়, তখন আমি যাদের বিয়ে দিয়েছি, তারা প্রায়ই আমার সাথে কথা বলতে আসে। ভিক্ষু হওয়াতে আমি সাদাসিধে জীবন পছন্দ করি। তাই আমি আমার বিবাহ-পরবর্তী সেবা হিসেবে নিচের তিনটা গল্প বলি, যতদূর পারা যায় আমরা তিনজন যাতে ঝামেলামুক্ত থাকতে পারি আর কি!

অঙ্গীকার

সম্পর্ক ও বিয়ের ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, যখন তারা দুজন বাইরে একসাথে ঘুরতে যাচ্ছে, তখন তারা সামান্য জড়িয়ে গেছে মাত্র। যখন তারা অ্যানগেজড, তখনো তারা কেবল জড়িয়ে গেছে, হয়তো আরও একটু গভীরভাবে। কিন্তু যখন তারা বিয়ের শপথবাক্য পাঠ করে সবার সামনে, তখন

সেটা অঙ্গীকার হয়ে দাঁড়ায়।

বিয়ের অনুষ্ঠান মানেই হচ্ছে অঙ্গীকার। লোকেরা যাতে এর অর্থ সারা জীবনের জন্য মনে রাখে, এজন্য আমি অনুষ্ঠানের সময় এর অর্থ বুঝিয়ে দিই। আমি তাদের ব্যাখ্যা করে বলি যে, জড়িত হওয়া আর অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া দুটো ভিন্ন জিনিস, অনেকটা শুয়োরের মাংস ও ডিমের মতো।

এই পর্যায়ে এসে বর-কনের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা একটু কান খাড়া করে। তারা অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, 'বিয়ের সাথে শুয়োরের মাংস ও ডিমের সম্পর্ক কী?'

আমি বলতে থাকি, 'শুয়োরের মাংস ও ডিম, এই দুটো জিনিসে মুরগী জড়িত থাকে; কিন্তু শুয়োর থাকে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই বিয়েটা তাই শুয়োরের বিয়ে হোক!'

মুরগী ও হাঁস

এটা উত্তরপূর্ব থাইল্যান্ডে আমার শিক্ষক আজান চাহ্-র একটা প্রিয় গল্প। এক নববিবাহিত দম্পতি কোনো এক সুন্দর গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় রাতের খাবার খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে গেল। তারা দুজনে খুব আনন্দঘন সময় কাটাচ্ছিল যতক্ষণ না তারা দূর থেকে একটা শব্দ শুনল : 'কোয়াক! কোয়াক!'

স্ত্রী বলল, 'শোন তো, এটি নিশ্চয়ই একটা মুরগি হবে।' 'না, না। এটা একটা হাঁস' স্বামী বলল।

'না, আমি নিশ্চিত ওটা একটা মুরগি।'

'অসম্ভব। মুরগিরা ডাকে কুক্ কুরু কু! হাঁসেরা ডাকে কোয়াক্ কোয়াক! ওটা একটা হাঁস, প্রিয়তমা।' স্বামী এই প্রথম একটু বিরক্তি নিয়ে বলল।
'কোয়াক! কোয়াক!' আবার শব্দ হলো। 'শুনেছ! এটা একটা হাঁস।' স্বামীটি বলল।

'না, প্রিয়। ওটা একটা মুরগি, আমি নিশ্চিত।' স্ত্রীটি দৃঢ় স্বরে পা দাপিয়ে ঘোষণা করল।
'শোন স্ত্রী! ওটা ... একটা ... হাঁস। 'হ' আকার চন্দ্রবিন্দু 'স'। হাঁস! বুঝেছ?' স্বামী রেগে গিয়ে বলল।

'কিন্তু ওটা তো একটা মুরগি' স্ত্রী আপত্তি জানাল।
'ওটা একটা হাঁসের ছানা, তুমি, তুমি...' স্বামীটি এমন কিছু বলে বসল যা তার বলা উচিত ছিল না।
এটি আবার ডেকে উঠল, 'কোয়াক! কোয়াক!'

স্ত্রীটি এবার প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'কিন্তু এটা যে একটা মুরগি!'

স্বামীটি দেখল তার স্ত্রীর চোখ অশ্রুতে টলমল করছে। অবশেষে তার মনে পড়ল কেন সে তাকে বিয়ে করেছে। তার চেহারা কোমল হয়ে এলো আর সে নরম সুরে বলল, 'দুঃখিত প্রিয়তমা। আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক। ওটা একটা মুরগি।'

'ধন্যবাদ, প্রিয়তম' স্ত্রীটি স্বামীর হাত ধরে বলল।

বনের মধ্য থেকে 'কোয়াক! কোয়াক!' শব্দ ভেসে এলো আবার। তারা আবার তাদের ভালোবাসাময় যাত্রা শুরু করল।
গল্পটার শিক্ষা হলো, যা স্বামী অবশেষে বুঝেছিল যে, মুরগি হোক বা হাঁস হোক, তাতে কী আসে যায়? এর থেকে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের ঐকতান, যেটি তারা উপভোগ করেছিল এমন এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়। এমন গুরুত্বহীন ব্যাপার নিয়ে কত বিয়ে ভেঙে যায়? কত বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হয় এমন হাঁস না মুরগি বিষয়?

যখন আমরা এই গল্পটি বুঝি, আমরা আমাদের গুরুত্তপূর্ণ বিষয়গুলো বিবেচনা করি। হাঁস না মুরগি এ বিষয়ে সঠিক হওয়া থেকেও ঢের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিয়েটা। আচ্ছা, বলুন তো, কতবার আমরা নিশ্চিতভাবে, পরম আত্মবিশ্বাসের সাথে জানতাম যে আমরাই সঠিক, অথচ পরে জেনেছি যে আমাদের ধারণা ছিল ভুল? কে জানে, সেটি হয়তো জিন পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া কোনো মুরগিও হতে পারে, যা হাঁসের মতো করে ডাকে!

(লিঙ্গসমতা এবং শাম্পিত্মূর্ণ ভিক্ষুজীবনের জন্য, প্রতিবার গল্পটি বলতে গিয়ে আমি সাধারণত মুরগি ও হাঁসের দাবিকারী বক্তাদের পরস্পর পাল্টে দিই।)

কৃতজ্ঞতা

কয়েক বছর আগে সিঙ্গাপুরে একটা বিয়ের অনুষ্ঠানের পরে কনের বাবা নতুন জামাইকে একপাশে ডেকে নিল - বিয়েকে দীর্ঘস্থায়ী ও সুখময় করা যায় কীভাবে - সে-বিষয়ে কিছু উপদেশ দেওয়ার জন্য। সে যুবকটিকে বলল, 'তুমি সম্ভবত আমার মেয়েকে অনেক ভালোবাসো।'

'ও হ্যাঁ, তা তো বটেই!' যুবকটি গভীর আবেগে বলে উঠল।
'আর তুমি সম্ভবত মনে করো যে সে এই পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার এক মেয়ে।' বুড়ো বলে চলল।
'সে সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ ' যুবকটি মুগ্ধ স্বরে বলল।

বুড়ো বলল, 'যখন তুমি বিয়ে করো, তখন এমনই লাগে। কিন্তু কয়েক বছর পরে তুমি আমার কন্যার দোষ-ত্রুটিগুলো দেখতে শুরু করবে। আমি চাই, যখন তুমি তার দোষ-ত্রুটিগুলো দেখতে শুরু করবে, তখন যেন এই কথাগুলো স্মরণ কর। গোড়া থেকে যদি তার ওই দোষগুলো না থাকত, তাহলে হে জামাইবাবু,

তোমার চেয়েও ঢের ভালো অন্য একজনকে সে বিয়ে করতে পারত।'

তাই আমাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর দোষ-ত্রুটির জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ, শুরু থেকেই যদি তাদের মধ্যে সেই দোষ-ত্রুটিগুলো না থাকত, তারা আমাদের থেকেও অনেকগুণ ভালো এমন কাউকে বিয়ে করতে পারত।

প্রেম

যখন আমরা প্রেমে পড়ি, তখন আমরা আমাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর দেয়ালে কেবল ভালো ইটগুলো দেখি। আমরা কেবল সেগুলোই দেখতে চাই, আর তাই সেগুলোই কেবল দেখে থাকি। আরা অন্যগুলোকে অস্বীকার করি। পরে যখন উকিলের কাছে যাই বিবাহবিচ্ছেদের মামলা নিয়ে, তখন আমরা আমাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর দেয়ালে কেবল খারাপ ইটগুলো দেখি। আমরা তার ভালো গুণগুলোর প্রতি অন্ধ হয়ে যাই। আমরা ওগুলো দেখতে চাই না, তাই সেগুলো আর দেখি না। আমরা আবার অন্যগুলোকে অস্বীকার করি।

কেন এমন হয় যে প্রেম ঘটে নাইট ক্লাবের আলো আধারে, অথবা কোনো মোমবাতির আলোয় সারা কোনো সান্ধ্যভোজে অথবা কোনো পূর্ণিমা রাতে? কারণ, এসব অবস্থায় আপনি তার তিলগুলো দেখেন না। তার নকল দাঁতগুলো দেখেন না। আমরা তখন মোমবাতির আলোয় আমাদের কল্পনার রঙে স্বাধীনভাবে কল্পনা করে নিতে পারি যে অপর পাশে বসা মেয়েটি একটি সুপার মডেল, অথবা ছেলেটি দেখতে সিনেমার নায়কের মতো। আমরা কল্পনা করতে পছন্দ করি, আর আমরা কল্পনা করি প্রেম-ভালোবাসায় ভরা জীবন। অন্তত পক্ষে আমাদের জানা উচিত, আমরা কী করছি।

ভিক্ষুরা এমন মোমবাতির আলোর প্রেমের মধ্যে নেই। তারা আলো ফেলে চলে বাস্তবতার উপরে। যদি আপনি স্বপ্ন চান, কল্পনা চান, তাহলে বৌদ্ধ বিহারের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবেন না। উত্তরপূর্ব থাইল্যান্ডে আমার ভিক্ষু হওয়ার প্রথম বছরে, একবার আমি গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম। আমি বসেছিলাম গাড়ির পিছনের সিটে, আরও দুজন পশ্চিমা ভিক্ষুর সাথে। আজান চাহ্ –আমার গুরু - তিনি বসেছিলেন সামনের সিটে। তিনি হঠাৎ পিছনে ফিরে আমার পাশে বসা নতুন ভিক্ষুটির দিকে তাকালেন, আর থাই ভাষায় কিছু একটা বললেন। তৃতীয় পশ্চিমা ভিক্ষুটা থাই ভাষায় পারদর্শী ছিল। সে আমাদের তা অনুবাদ করে দিল, 'আজান চাহ্ বলেছেন যে তুমি লস এঞ্জেলসে ফেলে আসা তোমার প্রেমিকার কথা ভাবছ।'

বিস্ময়ে সেই আমেরিকান ভিক্ষুটির চোয়াল ঝুলে পড়ল। আজান চাহ্ তার চিন্তাগুলো পড়তে পেরেছেন নিখুঁতভাবে। আজান চাহ্ হাসলেন। তার পরের কথাগুলো অনুবাদিত হলো এভাবে : 'চিন্তা করো না। আমরা সেটার একটা ব্যবস্থা করতে পারি। পরের বারে চিঠি লিখলে তাকে বলো সে যেন তোমাকে তার খুব ব্যক্তিগত, তার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন একটা কিছু পাঠায়। যখনই তুমি তাকে মিস করবে, সেটা বের করে তার কথা মনে করতে পারবে।'

'সেরকম কোনো কিছু কি কোনো ভিক্ষু রাখতে পারে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ভিক্ষুটি।
'অবশ্যই।' জবাব দিলেন আজান চাহ।

বোধহয় ভিক্ষুরাও প্রেম ভালোবাসা বোঝে।
আজান চাহ্ এর পরে যা বললেন তা অনুবাদ করতে অনেক সময় লেগে গেল। কারণ, আমাদের অনুবাদককে জোর করে হাসি থামিয়ে নিজেকে আগে সংযত করে নিতে হয়েছিল।

'আজান চাহ্ বলেছেন,...' সে হাসির চোটে বেরিয়ে আসা চোখের পানি মুছে শব্দগুলো বের করার চেষ্টা চালাল, 'আজান চাহ্ বলেছেন, তুমি তোমার প্রেমিকাকে বলো, সে যেন তার এক বোতল গু পাঠায়। এরপর যখনই তুমি তাকে মিস করবে, সেই বোতলটা বের করে খুলে দেখবে!'
সত্যিই তো, গু হচ্ছে খুব ব্যক্তিগত একটা জিনিস। যখন আমরা আমাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কাছে আমাদের ভালোবাসাকে প্রকাশ করি, তখন কি আমরা বলি না যে আমরা তার সবকিছুকেই ভালোবাসি? একই উপদেশ দেওয়া যায় কোনো ভিক্ষুণীর ক্ষেত্রে, যে তার প্রেমিককে মিস করছে।

যেমনটি বলেছিলাম, যদি আপনি প্রেম ভালোবাসা নিয়ে কল্পনার জাল বুনতে চান, আমাদের বৌদ্ধ বিহার থেকে পরিষ্কার দূরে থাকুন।

সত্যিকারের ভালোবাসা

প্রেমের ঝামেলাটা হচ্ছে যখন কল্পনার জাল ছিঁড়ে যায়, তখন হতাশা ও অসন্তোষ আমাদের ভীষণ দুঃখ দিতে পারে। প্রেমের যে ভালোবাসা, তাতে আমরা আসলে আমাদের সঙ্গীকে ভালোবাসি না। আমরা কেবল ভালোবাসি, তারা আমাদের যে অনুভূতি জাগিয়ে দেয় সেটাকে। তারা কাছে থাকলে যে এক আবেশ বা ভালোলাগার অনুভূতি হয়, সেটাকেই আমরা ভালোবাসি। এজন্যই যখন তারা কাছে থাকে না, আমরা তাদের মিস করি আর এক বোতল ... পাঠাতে বলি (আগের গল্পটি দেখুন)। যে কোনো আবেশ বা ঘোরের মতোই এমন ভালোলাগার অনুভূতি কিছু সময় পরে কেটে যায়।

সত্যিকারের ভালোবাসা হচ্ছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। আমরা তখন অপর লোকটার ভালোমন্দ নিয়ে ভাবি। আমরা তাদের বলি, 'আমার হৃদয়ের দরজা তোমার জন্য সব সময় খোলা থাকবে, তুমি যা-ই করো না কেন।' আর আমরা সেটা মন থেকেই বলি। আমরা শুধু চাই তারা সুখী হোক। এমন সত্যিকারের ভালোবাসা দুর্লভ।

আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাবতে পছন্দ করে, আমাদের যে বিশেষ সম্পর্ক তা হচ্ছে সত্যিকারের ভালোবাসা, কোনো প্রেমের ভালোবাসা নয়। এখানে একটা পরীক্ষা দেওয়া হলো আপনার জন্য, যা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন, কোন ধরনের ভালোবাসা এটা।

আপনার সঙ্গীর কথা ভাবুন। আপনার মনে তার একটি ছবি কল্পনা করুন। সেই দিনের কথা মনে করে দেখুন, যেদিন আপনাদের প্রথম দেখা হয়েছিল, আর এরপর থেকে কী চমৎকার সময়ই না কাটিয়েছেন আপনারা।

এখন কল্পনা করুন, আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে আপনার কাছে। চিঠিতে লেখা আছে, সে আপনার শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে গভীর প্রেমে জড়িয়ে

পড়েছে, আর তারা দুজন পালিয়ে গেছে। আপনার অনুভূতিটা কেমন হবে?

যদি এটা সত্যিকারের ভালোবাসা হয়, তাহলে আপনি খুব রোমাঞ্চিত হবেন যে আপনার সঙ্গী আপনার থেকেও ভালো একজনকে খুঁজে পেয়েছে আর সে এখন আরও সুখী। আপনি আনন্দিত হবেন যে আপনার সঙ্গী ও আপনার সেরা বন্ধু দুজনে খুব ভালো সময় কাটাচ্ছে। আপনি খুশিতে উল্লসিত হয়ে উঠবেন যে তারা প্রেমে পড়েছে। সত্যিকারের ভালোবাসায় আপনার সঙ্গীর সুখই কি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়?

এমন সত্যিকারের ভালোবাসা দুর্লভ।

এক রাণী তার প্রাসাদের জানালা দিয়ে বুদ্ধকে পিন্ডচারণ করতে দেখছিল। রাজা তা দেখতে পেলেন। এই মহান সন্ন্যাসীর প্রতি রাণীর যে ভক্তি, তা রাজার অন্তরে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলল। তিনি তার রাণীকে ডেকে জানতে চাইলেন, কাকে সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, বুদ্ধকে না স্বামীকে? রাণী ছিল বুদ্ধের পরম ভক্ত। কিন্তু সেই আমলে আপনার স্বামী যদি হয় রাজা, তাহলে খুব সতর্ক হতে হবে। তখন বুদ্ধি হারানো মানে মাথাটা হারানো। সে তার মাথাকে বাঁচিয়েছিল নিখাঁদ সত্যের জবাব দিয়ে, ‘আমি তোমাদের দুজনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি নিজেকে।’

তৃতীয় অধ্যায়

ভয় এবং ব্যথা

ভয় থেকে মুক্তি

দেয়ালে শুধুমাত্র দুটি খারাপ ইট দেখাটা যদি মনস্তাপের কারণ হয়, তাহলে সেই দেয়াল দেখে দেখে ভবিষ্যতের খারাপ কিছু ভেবে বসাটা আমাদের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যখন আমরা ভয়ে অন্ধ হয়ে যাই, দেয়ালের বাকি অংশটা আর দেখতে পাই না। অতএব ভয়কে জয় করতে হয় পুরো দেয়ালটা দেখে, শুধু খারাপ অংশটা দেখে নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমার সিঙ্গাপুরে সাম্প্রতিক ভ্রমণের গল্পটা বলা যায়।

সিঙ্গাপুরে আমার ধারাবাহিক চারটি দেশনা দেওয়ার কথা ছিল অনেক মাস আগে থেকেই। দেশনালয় হিসেবে বুক করা হয়েছিল ২৫০০ আসন-সম্বলিত ব্যয়বহুল সিঙ্গাপুরের সানটেক সিটি অডিটোরিয়াম। বাস স্টেশনগুলোতে দেশনার পোস্টার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর এলো সার্স সংকট (সার্স একটি সংক্রামক রোগ)। আমি যখন সিঙ্গাপুরে পৌঁছলাম, তখন স্কুলগুলো বন্ধ, আবাসিক এলাকাগুলো অবরুদ্ধ, সরকার লোকজনকে কোনো জনসভায় যোগ না দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। ভয় ছিল আকাশচুম্বী। আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আমরা কি দেশনার প্রোগ্রামগুলো বাতিল করব?'

সেদিন সকালে সংবাদপত্রের প্রথমপাতায় বড. বড. অক্ষরে ছাপা হলো যে নিরানববই জন সিঙ্গাপুরিয়ানের সার্স রোগ ধরা পড়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সিঙ্গাপুরের বর্তমান জনসংখ্যা কত?' 'প্রায় চল্লিশ লাখ।' আমি মন্তব্য করলাম, 'তো, তার মানে হচ্ছে ৩৯,৯৯,৯০১ জনের সার্স রোগ হয় নি। কাজেই দেশনা চলুক।'

'কিন্তু কেউ যদি সার্স রোগে আক্রান্ত হয়?' ভয় বলল।

'কিন্তু যদি না হয়?' প্রজ্ঞা পাল্টা প্রশ্ন করল। সম্ভাবনার পাল্লা ভারি ছিল প্রজ্ঞার দিকেই।

তাই আগের সিডিউল অনুযায়ী দেশনার আয়োজন করা হলো। প্রথম রাতে দেশনা শুনতে এলো পনের শ লোক। এরপর থেকে প্রতিরাতে লোকজনের সংখ্যা বাড়তেই থাকল। শেষ দেশনার রাতে হাউসফুল হয়ে গেল অডিটোরিয়াম। প্রায় ৮০০০ লোক দেশনাগুলো শুনতে এসেছিল। তারা অযৌক্তিক ভয়ের বিরুদ্ধে যেতে শিখেছিল, সেটা ভবিষ্যতে তাদের সাহসকে আরও শক্তিশালী করবে। তারা দেশনাগুলো বেশ উপভোগ করেছিল, আর খুশিমনে চলে গিয়েছিল। তার মানে হচ্ছে তাদের ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ার রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা আরও মজবুত হয়েছিল। প্রত্যেক দেশনার শেষে আমি তাদের জোর গলায় বলে দিয়েছিলাম যে, যেহেতু তারা আমার মজার গল্পগুলো শুনে হেসে লুটোপুটি খেয়েছে, এতে করে তাদের ফুসফুসের ব্যায়াম হয়ে গেছে, আর তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের সিস্টেমটা আরও সুদৃঢ় হয়েছে! সেই শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজনও তো সার্স রোগে আক্রান্ত হয় নি।

ভবিষ্যতের আছে অপার সম্ভাবনা। যখন আমরা খারাপ সম্ভাবনাগুলোতে নিজেদের ডুবিয়ে রাখি, সেটাকেই বলে ভয়। যখন আমরা অন্যান্য সম্ভাবনাগুলোকেও দেখতে পাই, আর সেটাই বেশির ভাগ সময় হয়, সেটাকেই বলে ভয় থেকে মুক্তি।

ভবিষ্যদ্বাণী করা

অনেকেই ভবিষ্যৎ জানতে চান। কেউ কেউ অধৈর্য হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিষ্যৎবক্তাদের সাহায্য নেন। আমি আপনাকে ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চাই : কখনোই একজন গরিব ভবিষ্যৎ বক্তাকে বিশ্বাস করবেন না!

ধ্যানী ভিক্ষুরা দারুণ ভবিষ্যৎ বক্তা হিসেবে খ্যাত, কিন্তু তারা তা সহজে আপনাকে বলবে না।

একদিন এক ভক্ত আজান চাহ্-কে তার ভবিষ্যৎ বলে দিতে অনুরোধ জানাল। আজান চাহ্ না করে দিলেন এই বলে : 'ভালো ভিক্ষুরা ভবিষ্যৎ বলে দেয় না।' ভক্ত তো নাছোড়বান্দা। সে আজান চাহ্-কে মনে করিয়ে দিল কতবার সে তাকে পিন্ডদান করেছে, তার বিহারে সে কত টাকা দান করেছে, আজান চাহ্-কে সে তার নিজের গাড়িতে করে কতবার ঘুরিয়েছে, নিজের কাজ ও পরিবার ফেলে। আজান চাহ্ দেখলেন যে লোকটি তার ভবিষ্যৎ জেনেই ছাড়বে। তাই তিনি বললেন যে একবারের জন্য তার ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া যায়। 'ঠিক আছে, তোমার হাতটা দাও। একটু দেখে দিই।'

ভক্ত তো উত্তেজনায় ভরপুর। আজান চাহ্ অন্য কোনো ভক্তকে হাত দেখে দেন নি। এটা বিশেষ একটা সুযোগ। তা ছাড়া আজান চাহ্ একজন সিদ্ধপুরুষ হিসেবে খ্যাত। তার অলৌকিক শক্তির কথা সবার জানা। তিনি যা বলেন তা হবেই, নিশ্চিতভাবেই হবে। আজান চাহ্ তার ভক্তের হাতের রেখাগুলো আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখতে লাগলেন। একটু পর পর তিনি বলতে লাগলেন, 'ওহ, দারুণ তো' অথবা 'ভালো, ভালো', 'অসাধারণ!' বেচারা ভক্ত ভালো কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর আশায় খুশিতে ডগমগ।

যখন আজান চাহ-র দেখা শেষ হলো, তিনি ভক্তের হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'হে উপাসক, তোমার ভবিষ্যৎ এটাই হবে।'

'জি, বলুন।' ভক্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

'আর, আমি কিন্তু কখনোই ভুল করি না।' আজান চাহ্ এর সাথে যোগ করলেন।

'আমি জানি, আমি জানি। ঠিক আছে। আমার ভবিষ্যৎ কেমন হবে?' ব্যগ্র সুরে বলে উঠল ভক্ত।

'তোমার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত' আজান চাহ্ বললেন। তিনি কিন্তু ভুল বলেননি!

জুয়া বা বাজি ধরা

টাকা কামানো কঠিন, কিন্তু হারানো সহজ। আর হারানোর সবচেয়ে সহজ পথটি হচ্ছে জুয়া। সকল জুয়াড়িই অবশেষে হেরো পার্টিতে পরিণত হয়। তবুও লোকজন ভবিষ্যৎ জানতে পছন্দ করে, যাতে করে তারা জুয়া খেলে অথবা বাজি ধরে প্রচুর টাকা কামাতে পারে। আমি দুটো গল্প বলব ভবিষ্যৎ অনুমান করাটা যে কত বিপদজনক তা দেখানোর জন্য, এমনকি যদি সেরকম লক্ষণ দেখা যায়, তবুও।

এক বন্ধু কোনো এক সকালে ঘুম থেকে জাগল এক স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নটা এতই পরিষ্কার যে মনে হয়েছিল বাস্তব থেকেও বাস্তব। সে স্বপ্ন দেখেছিল যে পাঁচজন দেবতা এসে তাকে পাঁচটি বড় বড় কলসিভরা ধনসম্পদ দিয়ে গেল। ঘুম ভেঙে চোখ মেলে দেখল তার বেডরুমে কোনো দেবতা নেই, আর আফসোস, কোনো কলসিভরা ধনসম্পদও নেই। কিন্তু স্বপ্নটি ছিল খুব অদ্ভুত।

সে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল যে তার স্ত্রী তাকে পাঁচটি ডিম সেদ্ধ ও পাঁচ পিস পাউরুটি গরম করে দিয়েছে নাস্তার জন্য। সকালের খবরের কাগজে সে তারিখ দেখল ৫ মে (পঞ্চম মাস)। অদ্ভুত কিছু একটা হচ্ছে, তাই না! পেছনের পাতায় সে দেখল ঘোড়দৌড়ের খবর। সে অবাক হয়ে দেখল যে এসকটে (ASCOT) পাঁচ অক্ষর) যে ঘোড়দৌড়ের খেলা হচ্ছে, সেখানে পঞ্চম দৌড়ের পঞ্চম ঘোড়ার নাম পঞ্চ দেবতা! স্বপ্নটা আসলে ছিল দৈববাণী!

সেই বিকেলে সে অফিস থেকে ছুটি নিল। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলল পাঁচ হাজার ডলার। ঘোড়দৌড়ের বাজির মাঠে গিয়ে সে পঞ্চম বাজিকরের কাছে গিয়ে বাজি ধরল : পাঁচ নম্বর ঘোড়দৌড়ের পাঁচ নম্বর ঘোড়া পঞ্চ দেবতার ওপর পাঁচ হাজার ডলার বাজি। স্বপ্ন তো আর মিথ্যা হতে পারে না। সৌভাগ্যের সংখ্যা পাঁচ তো আর মিথ্যা হতে পারে না। স্বপ্নটা আসলেই মিথ্যা ছিল না। ঘোড়াটা এসেছিল পঞ্চম হয়ে।

দ্বিতীয় গল্পটা সিঙ্গাপুরে ঘটেছিল অনেক বছর আগে। একজন অস্ট্রেলিয়ান লোক বিয়ে করেছিল সিঙ্গাপুরের এক সুন্দরী চাইনিজ মেয়েকে। যখন তারা সিঙ্গাপুরে তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে বেড়াতে আসল, লোকটার শালারা তখন বিকেলে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাচ্ছিল। তারা তাকেও যাওয়ার আমন্ত্রন জানাল।

লোকটি রাজি হলো। ঘোড়দৌড়ে যাওয়ার আগে তারা একটা বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে সৌভাগ্যের প্রার্থনা করবে বলে মনস্থির করল। কিন্তু ছোট্ট সেই বিহারে পৌঁছে দেখল যে সেটা যেন জঞ্জালের স্তুপ । তাই তারা ঝাড়ু ও বালতি হাতে নিয়ে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করল পুরো বিহারটা। তারপর তারা তাদের বাতি জ্বালিয়ে সৌভাগ্যের প্রার্থনা করল এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে গেল। কিন্তু তারা বাজিতে শোচনীয়ভাবে হারল।
সে রাতে অস্ট্রেলিয়ান লোকটা একটা ঘোড়ার স্বপ্ন দেখল। জাগার পরে তার স্পষ্ট মনে পড়ল ঘোড়ার নামটা। খবরের কাগজে দেখল যে সেদিন বিকেলের ঘোড়দৌড়ে আসলেই সেই ঘোড়ার নাম আছে। সে তার শালাদের এই সুখবরটা জানাল। কিন্তু তার শালারা কিছুতেই সেটা বিশ্বাস করল না। সিঙ্গাপুরের বিহার রক্ষাকারী চাইনিজ দেবতা একজন বিদেশি অস্ট্রেলিয়ানকে জয়ী ঘোড়ার নাম বলে দেবে, এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। তারা এটাকে আমলেই নিল না।

অস্ট্রেলিয়ান লোকটা একাই ঘোড়দৌড়ে গেল, সেই ঘোড়াটার উপরে বড় অঙ্কের বাজি ধরল, আর ঘোড়াটা জিতল।

বিহার রক্ষাকারী চাইনিজ দেবতা নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ানদের পছন্দ করত। তার শালারা রাগে ফুঁসতে লাগল।

ভয় কী

ভয় হচ্ছে ভবিষ্যতের কোনো ভুল, দোষ বা অপ্রীতিকর কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া। ভবিষ্যত যে কীরূপ অনিশ্চিত তা যদি আমরা মনে রাখতে পারি, তাহলে আমরা আর কখনো চেষ্টা করতে যাব না কী কী ঝামেলা হতে পারে। ভয়ের সেখানেই সমাপ্তি।

একবার ছোটবেলায় আমি দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত ছিলাম। ওইদিন আমার ডাক্তারের সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি যেতে চাই নি। আমি বোকার মতো নিজেকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম। কিন্তু ডাক্তারের কাছে পৌঁছে জানলাম যে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল হয়ে গেছে। এতেই বুঝলাম, ভয়টা যে কী মারাত্মক সময় অপচয়কারক।

ভয় মিশে থাকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায়। কিন্তু প্রজ্ঞাকে কাজে না লাগালে ভয় আমাদেরই মেরে ফেলতে পারে। কুংফু নামে একটা পুরনো টেলিভিশন সিরিজে এই ভয়টা তরুণ বৌদ্ধ শ্রামণ ছোট্ট ঘাসফড়িংকে প্রায় মেরে ফেলেছিল।

ছোট্ট ঘাসফড়িংয়ের আচার্য ছিল অন্ধ। সেই অন্ধ আচার্য একদিন তার শিষ্য ছোট্ট ঘাসফড়িংকে নিয়ে গেল বিহারের পিছনের এক রুমে, যা সাধারণত তালাবদ্ধ থাকত। রুমের ভেতরে ছিল ছয় মিটার চওড়া একটি পুকুর, যার মাঝামাঝি জায়গায় ছিল একটা ছোট কাঠের ব্রিজ। সেই আচার্য ছোট্ট ঘাসফড়িংকে সাবধান করে দিল যেন পুকুরের কিনারা থেকে দূরে থাকে। কারণ, পুকুরে পানি ছিল না, ছিল এসিড।

ঘাসফড়িংকে বলা হলো, 'তোমাকে সাত দিন পরে পরীক্ষা করা হবে। এই ছোট্ট কাঠের ব্রিজ পার হয়ে তোমাকে পুকুরের ওপারে যেতে হবে। সাবধান! পুকুরের তলায় জমা হওয়া ওই হাড়গোড়গুলো দেখতে পাচ্ছ তো?'

ঘাসফড়িং ভয়ে ভয়ে পুকুরের তলায় তাকাল এবং অনেক হাড়গোড় দেখল। 'ওগুলো তোমার মতো অনেক শ্রামণের হাড়গোড়।'

আচার্য ঘাসফড়িংকে সেই ভয়ংকর রুম থেকে বাইরে নিয়ে এলো। বিহারের উঠোনে ভিক্ষুরা একটা একই মাপের কাঠের ব্রিজ বানিয়ে সেটাকে দুটো ইটের উপরে বসাল। সাত দিন ধরে ঘাসফড়িংয়ের সেই ব্রিজ হেঁটে পার হওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না।

কাজটা সহজ। কয়েক দিনের মধ্যেই সে নিখুঁতভাবে ছোট্ট ব্রিজটা হেঁটে পার হতে পারত। এমনকি চোখ বাঁধা অবস্থায়ও পার হয়ে যেতে পারত অবলীলায়। এবার পরীক্ষার পালা আসল।

আচার্য ঘাসফড়িংকে নিয়ে গেল এসিডের পুকুরের রুমে। পুকুরের তলায় শ্রামণগুলোর হাড়গোড়গুলো চক চক করছিল। ঘাসফড়িং ব্রিজের এক প্রান্তে উঠে দাঁড়াল এবং আচার্যের দিকে তাকাল। 'হাঁটো' তাকে আদেশ দেওয়া হলো। এসিডের পুকুরের উপরে যে ব্রিজটা, তা উঠোনের সেই একই মাপের ব্রিজের চেয়ে অনেক অনেক সংকীর্ণ ঘাসফড়িং হাঁটতে শুরু করল, কিন্তু তার পদক্ষেপ নড়বড়ে হয়ে উঠল। সে টলতে শুরু করল। অর্ধেক পথও পেরোয়নি, এরই মাঝে সে আরও ভীষণভাবে দুলে উঠল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে এসিডের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। এমন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় একটা বিজ্ঞাপন বিরতি হলো।

অনেক বিরক্তি চেপে সেই জঘন্য বিজ্ঞাপনগুলো সহ্য করেছিলাম আমি। মনে সব সময় ভাবনা ছিল বেচারা ঘাসফড়িং কী করে নিজেকে বাঁচাবে।

বিজ্ঞাপন শেষ হলো। আমরা আবার ফিরে এলাম যেখানে ঘাসফড়িং ব্রিজের মাঝপথে গিয়ে ভয়ে আত্মবিশ্বাস হারাতে বসেছে। আমি তাকে টলমল পায়ে পা বাড়াতে দেখলাম। এরপর সে দুলে উঠল, আর পুকুরে পড়ে গেল।

ছোট্ট ঘাসফড়িংয়ের পুকুরে পড়ার শব্দ শুনে বৃদ্ধ অন্ধ আচার্য হেসে উঠল। এটা এসিড নয়, ছিল কেবল পানি। হাড়গোড়গুলো ফেলে দেওয়া হয়েছিল 'স্পেশাল ইফেক্ট' হিসেবে, গল্পটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য। সেগুলোই ঘাসফড়িংকে বোকা বানিয়েছিল, আর বোকা বনে গিয়েছিলাম আমিও।

আচার্য জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমাকে ফেলে দিয়েছিল? ভয়ই তোমাকে ফেলে দিয়েছিল, হে ছোট্ট ঘাসফড়িং, কেবল ভয়।'

লোকজনের সামনে কথা বলতে ভয় পাওয়া

আমি শুনেছি, বড় ভয়গুলোর একটা হলো জনগণের সামনে কথা বলার ভয়।

আমাকে প্রচুর কথা বলতে হয় জনগণের সামনে, বিহারে, আলোচনা সভায়, বিয়ের অনুষ্ঠানে, দাহক্রিয়ায়, রেডিওতে, টেলিভিশনে, সরাসরি সাক্ষাৎকারে।

এটা আমার পেশার একটা অংশ।
আমার মনে পড়ে, কোনো একসময় দেশনা দেওয়ার পাঁচ মিনিট আগে ভয় আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছিল। আমার কোনো প্রস্তুতিই ছিল না। কী যে দেশনা দেব, সে-বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না। দেশনালয়ে তখন প্রায় তিনশ জন লোক একটা ভালো, অনুপ্রেরণামূলক দেশনা শোনার আশায় আমার দেশনা শুনতে এসেছিল। আমি ভাবতে লাগলাম, 'যদি বলার মতো কিছু খুঁজে না পাই, তাহলে কী হবে? যদি ভুল কিছু বলে বসি? যদি বোকার মতো কিছু করে ফেলি?'

সমস্ত ভয়ের শুরু হয় 'যদি... তাহলে কী হবে?' এমন চিন্তা থেকে এবং যা একেবারে ভয়ংকর পরিণামের চিন্তার দিকে গড়ায়। আমি ভবিষ্যতের অনুমান করছিলাম এবং না বোধক ভবিষ্যতের কথাই ভাবছিলাম। আমি ছিলাম বোকা। আমি জানতাম, আমি বোকার মতো ভাবছি। আমি থিওরি অনুযায়ী সবকিছু জানতাম, কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছিল না। মনে সীমাহীন ভয় ঢুকতে শুরু করেছিল। আমি বেশ ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম।

এখন যখনই আমি দেশনা দিই, আমি মজা করি। আমি নিজেকে উপভোগ করি। আমি মজার মজার গল্প বলি, তা প্রায়ই বলি নিজেকে হাসাতে, আর সেগুলো শুনে শ্রোতাদের সাথে সাথে আমিও হাসি। একবার সিঙ্গাপুরে রেডিওতে সরাসরি সংলাপে ভবিষ্যতের টাকা-পয়সা কেমন হবে সে-সম্পর্কে আজান চাহ্-র ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে বলেছিলাম (সিঙ্গাপুরিয়ানরা অর্থনৈতিক ব্যাপারে খুব আগ্রহী)।

আজান চাহ্ একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে পৃথিবীতে একদিন টাকা বানানোর কাগজ ফুরিয়ে যাবে, পয়সা বানানোর ধাতু ফুরিয়ে যাবে। লোকজন তখন দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য অন্য জিনিস ব্যবহার করবে। তিনি বলেছিলেন, লোকজন তখন মুরগির শুকনো বিষ্ঠাকে টাকা-পয়সারূপে ব্যবহার করবে। তারা পকেটে করে মুরগির বিষ্ঠা নিয়ে ঘুরবে। ব্যাংকের ভল্ট মুরগির বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ থাকবে। ডাকাতেরা সেগুলো লুট করতে চাইবে। ধনীরা গর্বে নাক উঁচু করে বেড়াবে যে তাদের কাছে এত বেশি মুরগির বিষ্ঠা আছে। গরিবরা লটারিতে এক বিরাট স্তুপ মুরগির বিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্ন দেখবে। সরকার তাদের দেশের মুরগির বিষ্ঠার অবস্থার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেবে এবং সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যাগুলো মুরগির বিষ্ঠার চেয়ে কম গুরুত্ব পাবে।
টাকা, পয়সা ও মুরগির বিষ্ঠার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা কী? কোনো পার্থক্য নেই।

আমি গল্পটা বলতে বেশ উপভোগ করি। এটা আমাদের প্রচলিত সংস্কৃতির এক মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরে। এটি মজারও বটে। সিঙ্গাপুরিয়ান শ্রোতারা গল্পটা পছন্দ করেছিল।

আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে লোকজনের সামনে বক্তৃতা দিয়ে আপনি যদি মজা পেতে চান, তাহলে রিল্যাক্স করুন। মনে একই সাথে ভয় ও মজা থাকাটা মনস্তত্ত্ববিদ্যামতে অসম্ভব। যখন আমি রিল্যাক্স থাকি, দেশনার সময় আইডিয়াগুলো মনে আসতে থাকে একটার পর একটা, আর মুখ দিয়ে সেগুলো মসৃণভাবে কথার ঝংকার হয়ে বেরিয়ে পড়ে। তা ছাড়া, শ্রোতারা মজার কথা শুনতে বিরক্ত বোধ করে না।

একবার একজন তিববতীয় ভিক্ষু দেশনার সময় শ্রোতাদের হাসানোর গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছিল। সে বলেছিল, 'যখন তারা হাসার জন্য মুখ খুলবে, আপনি তখন তাদের মুখে জ্ঞানের ট্যাবলেট ছুঁড়ে দিতে পারবেন।'

আমি কখনোই দেশনার প্রস্তুতি নিই না। বরং আমি হৃদয় ও মনকে প্রস্তুত করি। থাইল্যান্ডে ভিক্ষুদের শেখানো হয় যেন তারা কখনোই দেশনা প্রস্তুত না করে; বরং যেকোনো সময় বিনা নোটিশে দেশনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।

দেশনা প্রস্তুত করবে না, প্রস্তুত করবে নিজেকে। তখন ছিল মাঘী পূর্ণিমা, উত্তরপূর্ব থাইল্যান্ডে সেটা বছরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। আমি ছিলাম আজান

চাহ-র বিহার ওয়াট পাপং এ। সেখানে ভিক্ষু ছিল দুই শ-এর মতো, আর উপাসক-উপাসিকা ছিল কয়েক হাজার। আজান চাহ্ খুব বিখ্যাত ছিলেন। তখন ভিক্ষু হিসেবে আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর।

সন্ধ্যার পরে দেশনার সময়। এমন প্রধান প্রধান অনুষ্ঠানে আজান চাহ্ সাধারণত নিজেই দেশনা করেন। কিন্তু সব সময় নয়। মাঝে মাঝে তিনি ভিক্ষুদের সারিতে চোখ বুলিয়ে নেন। যদি তাঁর দৃষ্টি আপনার উপর এসে থামে, তাহলে আপনি ঝামেলায় পড়ে গেছেন। তিনি আপনাকে দেশনা দিতে বলবেন। যদিও আমি সিনিয়র ভিক্ষুদের তুলনায় এখনো নবীন, তবুও নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না, আজান চাহ্ কখন কাকে দেশনা দিতে বলেন।

তিনি ভিক্ষুদের সারিতে চোখ বুলালেন। তাঁর দৃষ্টি আমাকে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল। আমি নিরবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এর পরে তার দৃষ্টি আবার সামনে থেকে পিছনে এগিয়ে আসতে লাগল। ভাবুন তো কার উপর তার দৃষ্টি থেমে গেল?
আজান চাহ্ নির্দেশ দিলেন, 'ব্রাহ্ম প্রধান দেশনাটা দাও।'

পালানোর পথ ছিল না। অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাকে থাই ভাষায় এক ঘণ্টা ধরে দেশনা দিতে হলো আমার গুরুর সামনে, ভিক্ষুদের সামনে এবং হাজারো লোকজনের সামনে। দেশনাটা ভালো হয়েছিল কি হয় নি, সেটা ব্যাপার না। ব্যাপার হলো, আমি দেশনা দিয়েছিলাম।

আজান চাহ্ আপনাকে কখনোই বলবেন না দেশনা ভালো হয়েছে কি হয় নি। ব্যাপারটা সেটা নয়। একবার তিনি একজন সুদক্ষ পশ্চিমা ভিক্ষুকে সাপ্তাহিক উপোসথের দিনে জড়ো হওয়া উপাসক-উপাসিকাদের সামনে দেশনা দিতে বললেন। এক ঘণ্টা থাই ভাষায় দেশনা দিয়ে ভিক্ষুটি তা সমাপ্ত করার প্রস্তুতি নিল। আজান চাহ্ তাকে শেষ করতে দিলেন না, আরও এক ঘণ্টা বলতে বললেন। এটি ছিল কঠিন কাজ। তবুও সে বলল। কোনোমতে থাই ভাষায় যখন সে দ্বিতীয় ঘণ্টার দেশনা শেষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আজান চাহ্ আরও এক ঘণ্টা দেশনা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এটি ছিল অসম্ভব। পশ্চিমা ভিক্ষু হিসেবে কতটুকুই বা থাই ভাষা জানে সে? তখন আপনাকে একই কথা বার বার বলতে হবে। শ্রোতারা বিরক্ত। কিন্তু আপনার করার কিছু নেই। তৃতীয় ঘণ্টা শেষে বেশির ভাগ লোক উঠে চলে গেল, কয়েকজন যারা ছিল তারা নিজেদের মধ্যেই কথা বলছিল। এমনকি মশা ও টিকটিকিরাও ঘুমিয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় ঘণ্টা শেষে আজান চাহ্ আরও এক ঘণ্টা দেশনা দিতে বললেন! পশ্চিমা ভিক্ষুটি তার নির্দেশ পালন করল। সে বলেছিল যে, এমন একটা অভিজ্ঞতার পরে (দেশনাটা চার ঘণ্টা পরে তবেই শেষ হয়েছিল) যখন আপনি শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া যাচাই করতে যাবেন, তখন আর জনসমক্ষে বক্তৃতা দিতে ভয় পাবেন না।

এভাবেই আমরা মহান আজান চাহ্-র কাছ থেকে ট্রেনিং পেয়েছিলাম।

ব্যথার ভয়

ব্যথার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে ভয়। এটাই ব্যথাকে তীব্রতর করে। ভয়কে সরিয়ে দিন, কেবল অনুভূতিটা থাকবে।

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে উত্তরপূর্ব থাইল্যান্ডের দরিদ্র ও দুর্গম বনবিহারে আমার ভীষণ দাঁতের ব্যথা শুরু হয়। সেখানে না ছিল কোনো ডেন্টিস্ট, না ছিল টেলিফোন, না ছিল বিদ্যুৎ। ওষুধের বাক্সে সামান্য প্যারাসিটামল পর্যন্ত ছিল না। বনভিক্ষুরা সহনশীল হবে, এটাই আশা করা হয়।

সন্ধ্যার পরে, অসুখের বেলায় সচরাচর যেমনটি হয় আর কি, দাঁতের ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। আমি নিজেকে বেশ শক্তসমর্থ বনভিক্ষু ভাবতাম। কিন্তু এই দাঁতের ব্যথার কাছে আমার সামর্থ্যের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হলো। আমার মুখের একপাশ ব্যথায় শক্ত হয়ে গেল। এমন দাঁতের ব্যথা এই জনমে আর হয় নি। আমি শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্যানে বসে ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে চাইলাম। আমি শিখেছিলাম, মশার কামড় সত্ত্বে ও কীভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসে মনকে কেন্দ্রীভূত করা যায়। মাঝে মাঝে আমি এক থেকে চল্লিশ পর্যন্ত গুণতাম। একটা অনুভূতিতে মনোযোগ দিলে অন্য অনুভূতি আর থাকত না। কিন্তু এবারের ব্যথাটা ছিল অসাধারণ। আমি মাত্র দুই তিন সেকেন্ড শ্বাসপ্রশ্বাসে মনোযোগ দেওয়ার পরপরই ব্যথাটা আরও ভয়ংকর হয়ে ফিরে আসত।

আমি উঠে বসলাম, বাইরে গিয়ে চংক্রমণ করার চেষ্টা করলাম। খুব শীঘ্রই সেটাও বাদ দিতে হলো। আমি চংক্রমণ করছিলাম না, সত্যিকার অর্থেই দৌড়াচ্ছিলাম, কোনোমতেই ধীরস্থির হয়ে হাঁটতে পারছিলাম না। ব্যথাটা আমাকে নিয়ন্ত্রন করছিল, এটা আমাকে দৌড়াতে বাধ্য করছিল। কিন্তু যাওয়ার কোনো জায়গা ছিল না। আমি ব্যথায় দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম, কেবল পাগল হওয়া বাকি।

আমি দৌড়ে কুটিরে ঢুকে গেলাম। বসে পড়ে সূত্র আবৃত্তি শুরু করলাম। বৌদ্ধ সূত্রগুলো অলৌকিক শক্তি ধারণ করে বলে সবাই বলে। তারা আপনাকে সৌভাগ্য এনে দিতে পারে, বিপদজনক প্রাণীগুলোকে দূরে রাখতে পারে, অসুখ ও ব্যথা ভালো করে দিতে পারে - এমনটিই বলা হয়। আমি সেটা বিশ্বাস করতাম না। আমি বিজ্ঞানী হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। যাদুকরী সূত্রগুলো সব ভুয়া, বুজরুকি। সেগুলো সহজ সরলদের জন্য যারা সবকিছু সহজে বিশ্বাস করে। তাই আমি সূত্র আবৃত্তি শুরু করলাম এই অযৌক্তিক আশায় যে এতে কাজ হবে। আমি বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম। শীঘ্রই আমাকে সেটাও থামাতে হলো। আমি বুঝতে পারছিলাম আমি চিৎকার করে প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণ করছি। তখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, আমার ভয় ছিল অন্যরা না শুনে ফেলে!

যেভাবে তীব্র স্বরে সূত্র আবৃত্তি করছিলাম, তাতে মনে হয় কয়েক কিলোমিটার দূরের গ্রামের লোকজনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিলাম। ব্যথার শক্তি আমাকে স্বাভাবিকভাবে সূত্র আবৃত্তি করতে দেয় নি।

আমি ছিলাম একা, স্বদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে, দুর্গম এক জঙ্গলে যেখানে কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই, অসহ্য ব্যথা থেকে পালাবার কোনো পথ নেই। আমি যা যা জানি সব চেষ্টা করেছিলাম, একেবারে সবকিছু। কিন্তু কোনো কিছুতেই কাজ হয় নি।

এমন বেপরোয়া মুহূর্তগুলো প্রজ্ঞার দরজাগুলোকে খুলে দেয়, স্বাভাবিক জীবনে যেগুলোর দেখা পাওয়া ভার। ঠিক সেই মুহূর্তে এমনই এক প্রজ্ঞার দরজা খুলে

গিয়েছিল আমার সামনে এবং আমি সেই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সত্যি কথা বলতে কী, আমার আর কোনো বিকল্প ছিল না।

আমার মনে পড়ল দুটো ছোট্ট শব্দ, 'যেতে দাও'। আমি এই শব্দগুলো আগেও বহুবার শুনেছি। আমার বন্ধুদেরও এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছি অনেকবার। আমি ভাবতাম এর অর্থ আমি জানি : মোহ এমনই হয়!

আমি যেকোনো কিছু চেষ্টা করে দেখতে রাজি ছিলাম, তাই আমি যেতে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। শতভাগ যেতে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। জীবনে প্রথমবারের মতো আমি সত্যিকার অর্থেই যেতে দিলাম।

পরে যা ঘটল তা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। সেই ভয়ানক ব্যথাটা নিমেষেই উধাও হয়ে গেল। তার জায়গায় মনোহর এক সুখ জায়গা করে নিল। আনন্দের ঢেউ একটার পর একটা এসে আমার সারা শরীরকে ভাসিয়ে নিল। আমার মন গভীর প্রশান্তিতে ভরে গেল, এত শান্ত ও উপভোগ্য হলো যে বলার মতো নয়। আমি সহজেই এবং অনায়াসেই ধ্যানে বসলাম। ধ্যানের পরে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়লাম, আর গভীর ও শান্তির একটা ঘুম দিলাম।

বিহারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের জন্য যথাসময়ে যখন ঘুম থেকে জাগলাম, তখন খেয়াল করলাম যে আমার দাঁতে ব্যথা, কিন্তু সেটা গতরাতের তুলনায় কিছুই নয়।

ব্যথাকে যেতে দেওয়া

আগের গল্পটাতে, দাঁতের ব্যথার যে ব্যথার ভয় সেই ভয়টাকেই আমি যেতে দিয়েছিলাম। আমি ব্যথাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। এটিকে জড়িয়ে ধরে তাকে তার মতোই থাকতে দিয়েছিলাম। এজন্যই এটি চলে গিয়েছিল। আমার বন্ধুদের অনেকেই প্রচন্ড ব্যথার সময়ে এই পদ্ধতি কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনো কাজে আসে নি। তারা আমার কাছে এসে অভিযোগ করে বলেছে যে আমার দাঁতের ব্যথা নাকি তাদের ব্যথার তুলনায় কিছু না। সেটা সত্যি নয়। ব্যথা ব্যক্তিগত এবং সেটা মাপা যায় না।

আমি তাদের নিচের তিন শিষ্যের গল্প দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলাম কেন যেতে দেওয়াটা তাদের বেলায় কাজ করেনি।

প্রথমশিষ্য প্রচন্ড ব্যথায় কাতর হয়ে যেতে দেওয়ার চেষ্টা করল। 'যেতে দাও' তারা ভদ্রভাবে বলে এবং অপেক্ষা করে।

'যেতে দাও!' যখন ব্যথার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, তখন তারা আবার বলে।

'শুধু যেতে দাও!' 'ওহ, যেতে দাও না!'
'আমি বলছি, যেতে দাও!' 'যেতে দাও!'

মজার মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা বেশির ভাগ সময় এমনই করে থাকি। আমরা ভুল জিনিসকে যেতে দিই। আমাদের যেতে দেওয়া উচিত, যে 'যেতে দাও' বলছে তাকেই। আমাদের যেতে দেওয়া উচিত আমাদের মধ্যকার সেই খেপাটে নিয়ন্ত্রণ কারীকে। আমরা সবাই জানি কে সেই খেপাটে নিয়ন্ত্রণকারী।

যেতে দেওয়া মানে হচ্ছে 'কোনো নিয়ন্ত্রণকারী নেই'।

দ্বিতীয় শিষ্য, ভয়ানক ব্যথায় এই উপদেশ স্মরণ করে নিয়ন্ত্রণকারীকে যেতে দিল। তারা ব্যথা সহ্য করেও বসে রইল, ধরে নিল যে তারা যেতে দিচ্ছে। দশ মিনিট পরে সেই একই ব্যথা। তাই তারা অভিযোগ করে যে যেতে দেওয়াতে কোনো কাজ হয় না। আমি তাদের বলি যে যেতে দেওয়াটা কোনো ব্যথার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার পদ্ধতি নয়; বরং ব্যথা থেকে স্বাধীন হওয়ার পদ্ধতি। দ্বিতীয় শিষ্যটা ব্যথার সাথে একটা চুক্তি করার চেষ্টা করেছিল : 'আমি দশ মিনিট ধরে যেতে দেব; আর হে ব্যথা, তুমি চলে যাবে, বুঝেছ?'

এটা ব্যথাকে যেতে দেওয়া নয়, ব্যথার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা।

তৃতীয় শিষ্য, ভয়ানক ব্যথায় জর্জরিত হয়ে ব্যথাকে এরূপ বলে : 'হে ব্যথা, আমার হৃদয়ের দরজা তোমার জন্য খোলা, তুমি আমাকে যা কিছুই করো না কেন। এসো, ভেতরে এসো।'

তৃতীয় শিষ্যটি ব্যথাকে যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণ থাকার অনুমতি দিয়েছিল, এমনকি সারা জীবন হলে সারা জীবন, আরও বেশি হয় হোক। তারা ব্যথাকে স্বাধীনতা দিয়েছিল। তারা এটাকে নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা ত্যাগ করেছিল, অর্থাৎ যেতে দিয়েছিল। ব্যথা থাকল কি গেল, সেটা এখন তাদের কাছে একই জিনিস। কেবল তখনই ব্যথা চলে যায়।

যেভাবে দাঁতের ব্যথার উর্ধ্বে যাওয়া যায়

আমাদের ভিক্ষুসংঘের একজনের দাঁত খুব খারাপ ছিল। তার অনেকগুলো দাঁত তুলে ফেলার প্রয়োজন হয়েছিল; কিন্তু এনেসথেশিয়া দিতে দেবে না সে কিছুতেই। অবশেষে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে একজন ডেন্টাল সার্জন খুঁজে পাওয়া গেল যে এনেসথেশিয়া ছাড়াই তার দাঁতগুলো তুলে দেবে। সে কয়েকবার ওই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল দাঁত তুলতে, কোনোবারই সমস্যা হয় নি।

এনেসথেশিয়া ছাড়া দাঁত তুলতে দেওয়াটা বেশ সাহসের বটে, কিন্তু আরেক ব্যক্তি ছিল এর থেকে এক ডিগ্রি উপরে। সে নিজেই নিজের দাঁত তুলে ফেলেছিল কোনো এনেসথেশিয়া ছাড়া।

আমরা তাকে দেখেছিলাম আমাদের বিহারের যন্ত্রপাতির ঘরের বাইরে, প্লায়ার্সে তখন ধরা আছে তার রক্তমাখা দাঁত। কোনো সমস্যাই হয় নি। সে প্লায়ার্সটা

ধুয়ে মুছে আবার যন্ত্রপাতির ঘরে রেখে দিয়েছিল।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কী করে এমন জিনিস করতে পারল।

সে যা বলল, তা থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন ভয় ব্যথার একটা প্রধান উপকরণ হিসেবে থাকে। সে বলল, 'যখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, দাঁতটা নিজেই তুলব, কেননা ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়ার অনেক ঝক্কি ঝামেলা, সেই মুহূর্তে কোনো ব্যথা লাগে নি। যখন আমি প্লায়ার্সটা হাতে তুলে নিলাম, তখনো ব্যথা লাগে নি। যখন আমি প্লায়ার্স দিয়ে দাঁতটা ধরলাম শক্ত করে, তখনো ব্যথা লাগল না। যখন আমি প্লায়ার্সে মোচড় দিলাম এবং টান দিলাম, তখন ব্যথা লাগল, কিন্তু সেটা কয়েক সেকেন্ড মাত্র। যখন দাঁতটা বের করলাম, সেটা আর মোটেও এত ব্যথা করল না। পাঁচ সেকেন্ডের ব্যথা, এই আর কি!'

প্রিয় পাঠক, এই সত্যি ঘটনা পড়ে হয়তো ভয়ে মুখ বিকৃত করে ফেলেছেন।

সে যতটা না ব্যথা পেয়েছে, আপনি সম্ভবত তার থেকেও বেশি ব্যথা অনুভব করেছেন। যদি এমন কাজে আপনি চেষ্টা করতেন, তাহলে ভয়ানক ব্যথা লাগত। হয়তো যন্ত্রপাতির ঘরে গিয়ে প্লায়ার্স হাতে নেওয়ার আগেই আপনি ব্যথায় কাতর হয়ে পড়তেন। আশঙ্কা, ভয়-ব্যথার প্রধান উপাদান।

কোনো দুশ্চিন্তা নয়

নিয়ন্ত্রণকারীকে যেতে দেওয়া, বর্তমান মুহূর্তের সাথে থাকা এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার প্রতি যা হয় হবে এমন খোলা একটা মনমানসিকতা নিয়ে থাকা আমাদের ভয়ের কারাগার থেকে মুক্তি দেয়। এটা আমাদের জীবনের চ্যালেঞ্জগুলোকে আমাদের নিজস্ব প্রজ্ঞা দিয়ে মোকাবেলা করতে শেখায় এবং অনেক অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে বের করে নিয়ে যায় নিরাপদে।

শ্রীলঙ্কায় চমৎকার একটা ভ্রমণ শেষে সিঙ্গাপুর হয়ে অস্ট্রেলিয়া ফেরার সময় পার্থের বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনের ছয়টা লাইনের একটাতে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। লাইনটা শম্বুক গতিতে এগোচ্ছিল, তার মানে খুব ভালোমতো চেক করা হচ্ছে সবাইকে।

একজন পুলিশ অফিসার কোত্থেকে উদয় হলো, সাথে আছে মাদকদ্রব্য ধরার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছোট্ট একটা কুকুর। অফিসারটিকে কুকুর নিয়ে আসতে দেখে লাইনের লোকজন নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসি হাসি মুখ করল, যদিও তাদের কাছে কোনো মাদকদ্রব্য ছিল না। কুকুরটি তাদের শোঁকার পরে যখন পরের জনের কাছে যাচ্ছিল, আপনি নিশ্চিতভাবেই তাদের দেখে বুঝতে পারবেন যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে তারা। এতক্ষণ কী টেনশনই না করেছে!

যখন সেই সুন্দর ছোট্ট কুকুরটা আমার কাছে এসে শুঁকল, এটি থেমে দাঁড়াল। এটি তার নাকটা আমার কোমরের কাছে চীবরের ভেতর গুঁজে দিল এবং দ্রুত বড় বড় করে লেজ নাড়তে লাগল। কাস্টমস অফিসারটি কোনোমতে টেনেহিঁচড়ে কুকুরটিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। লাইনে আমার সামনের লোকজন যারা

এতক্ষণ বেশ বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, এখন তারা এক পা দূরে সরে গেল। আমি নিশ্চিত, আমার পিছনের জুটিও এক পা পিছনে সরে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে, আমি কাউন্টারের বেশ সামনে চলে আসলাম। তারা আবার শোঁক শোঁক করা কুকুরটাকে নিয়ে আসল। কুকুরটিকে প্রত্যেক লাইনের সামনে থেকে পেছনে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। লাইনের প্রত্যেককে একটু করে শুঁকে আবার সামনে এগোল কুকুরটি। আমার কাছে এসে এটি আবার থামল। এটি আমার চীবরে নাক গুঁজে দিয়ে প্রচন্ডভাবে লেজ নাড়তে শুরু করল। আবারও কাস্টমস অফিসারটিকে জোর করে কুকুরটিকে সরিয়ে নিতে হলো। আমি অনুভব করলাম, সবার চোখ এখন আমার দিকে। যদিও অনেকেই এ পর্যায়ে এসে কিছুটা উদ্বিগ্ন হতে পারত, আমি ছিলাম পুরোপুরি রিলাক্সড। যদি আমাকে জেলে যেতে হয়, তো ভালো। আমার সেখানে অনেক বন্ধু। আর তারা বিহারের চেয়েও ভালো করে খাওয়াবে আমাকে।
যখন আমি কাস্টমস চেক পয়েন্টে আসলাম, তারা আমাকে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করল। আমার কোনো ড্রাগস ছিল না। ভিক্ষুরা এমনকি মদও খায় না, ড্রাগ তো দূরের কথা। তারা অবশ্য আমাকে ন্যাংটা করে সার্চ করেনি। কারণটা, আমার মনে হয়, আমি কোনো ভয় পাওয়ার বা ঘাবড়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখাই নি। তারা কেবল জিজ্ঞেস করেছিল, আমার কী মনে হয়, কেন কুকুরটি কেবল আমার কাছে এসে থেমে গেল। আমি বললাম যে ভিক্ষুরা প্রাণীদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। হয়তো আমাকে শুঁকে কুকুরটি সেটাই বুঝেছে। অথবা হতে পারে, কুকুরটি অতীত জন্মে কোনো ভিক্ষু ছিল। তারা অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিল।

আমি একবার খুব ক্রুদ্ধ ও অর্ধমাতাল এক বিশালদেহী আমেরিকানের ঘুষি খাওয়ার খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। নির্ভীক মনোভাব সেদিন আমাকে ও আমার নাকটাকে বাঁচিয়েছিল।

আমরা সবেমাত্র আমাদের নতুন শহরের বিহারে চলে এসেছি, পার্থ শহরের সামান্য উত্তরে। নতুন বিহারের জমকালো উদ্বোধন করতে যাচ্ছি আমরা। অবাক করা খুশির খবর এই যে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন গভর্নর স্যার গর্ডন রীড ও তার স্ত্রী আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

আমাকে উঠোনের সাজসজ্জা এবং অতিথি ও ভিআইপিদের চেয়ারগুলো ম্যানেজ করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। আমাদের কোষাধ্যক্ষ পই পই করে বলে দিলেন সবচেয়ে ভালো জিনিসপত্র জোগাড় করতে। আমরা খুব ভালো একটা বিহার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতে চাই।

সামান্য খোঁজাখুঁজির পর খুব ব্যয়বহুল একটা কোম্পানিকে খুঁজে পেলাম আমি। এটা পার্থের পশ্চিমে ধনী আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। তারা কোটিপতিদের বাগানে পার্টির জন্য সাজসজ্জা ভাড়া দিয়ে থাকে। আমি তাদের বললাম, আমি কী চাই এবং কেন এটা খুব ভালো হতে হবে। আমি যে মহিলার সাথে কথা বলেছিলাম, সে বলল যে সে সবকিছু বুঝেছে, তাই অর্ডারটা তাদেরই দেওয়া হলো।

শুক্রবার বিকেলে যখন সাজসজ্জা ও চেয়ারগুলো পৌঁছাল, আমি তখন আমাদের নতুন বিহারের পেছনে একজনকে সাহায্য করছিলাম। যখন মালপত্রগুলো দেখতে আসলাম, তখন ডেলিভারি দিতে আসা ট্রাক ও লোকজন সব চলে গেছে।

আমি সাজসজ্জার বেহাল দশা দেখে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সেগুলো লাল লাল ধুলোয় ঢাকা পড়ে আছে। আমি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলাম, তবে সমস্যাটা ঠিক

করা যাবে। আমরা সাজসজ্জাগুলো সাজিয়ে রাখতে শুরু করলাম। এরপর আমি অতিথিদের চেয়ারগুলো চেক করলাম। সেগুলোর অবস্থাও তথৈবচ।

চেয়ারের ফুটো দিয়ে ভেতরের ফোম, ছেঁড়া ন্যাকড়া সব বেরিয়ে এসেছে। আমার অমূল্য ভলান্টিয়াররা সেগুলোর প্রত্যেকটিকে পরিষ্কার করতে শুরু করল। অবশেষে আমি ভিআইপিদের জন্য আনা স্পেশাল চেয়ারগুলো দেখলাম।

সেগুলো ছিল আসলেই স্পেশাল। একটা চেয়ারেরও পাগুলো সমান ছিল না! সবগুলো চেয়ার ছিল নড়বড়ে, প্রচুর নড়বড়ে, একটাও ঠিকমতো বসে না। অবিশ্বাস্য কান্ড! খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে এটা। আমি ফোনের কাছে দৌড় গেলাম। সেই ভাড়াটে কোম্পানিকে ফোন করলাম এবং সেই মহিলাকে পেলাম, যে সাপ্তাহিক ছুটিতে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমি অবস্থাটা ব্যাখ্যা করলাম। জোর গলায় বললাম যে অনুষ্ঠান চলাকালে আমরা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার গভর্নরকে এমন নড়বড়ে চেয়ারে দুলতে দিতে পারি না। যদি তিনি পড়ে যান, তো কী হবে? সে ব্যাপারটা বুঝল, ক্ষমা চাইল এবং আশ্বস্ত করল যে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে চেয়ারগুলো পাল্টানোর ব্যবস্থা করবে।

এবার আমি ডেলিভারি ট্রাকের অপেক্ষায় রইলাম। আমি সেটাকে মোড় ঘুরে আসতে দেখলাম। অর্ধেক পথও পেরোয় নি, বিহার থেকে প্রায় ষাট মিটার দূরে থাকতেই, ট্রাকটা তখনো বেশ দ্রুতগতিতে চলছিল, সেই অবস্থাতেই তাদের একজন ট্রাক থেকে লাফিয়ে নামল এবং আমার দিকে ঘুষি উঁচিয়ে তেড়ে আসল।

সে চিৎকার করল, 'এখানকার দায়িত্বে আছে কোন ব্যাটা? আমি সেই ব্যাটাকে দেখতে চাই।'

পরে আমি জেনেছিলাম যে আমাদের প্রথমঅর্ডারটা ছিল তাদের জন্য সপ্তাহের শেষ ডেলিভারি। আমাদের মাল ডেলিভারি দেওয়ার পরে তাদের লোকেরা বাক্স পেটরা গুছিয়ে মদের দোকানে ঢুকে সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে শুরু করে দিয়েছিল। তাদের মদ্যপান নিশ্চয়ই অনেক দূর এগিয়েছিল, যখন কোম্পানির ম্যানেজার এসে তাদের আবার কাজে ফেরার নির্দেশ দিল। বুড্ডিস্টদের চেয়ারগুলো বদলে দিতে হবে।

আমি সেই লোকটার কাছে এগিয়ে গেলাম এবং ভদ্রভাবে বললাম, 'আমিই এখানকার দায়িত্বে থাকা ব্যাটা ছেলে। কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

সে তার মুখটা আমার কাছে নিয়ে এলো, তার ডান হাতের ঘুষি তখনো উদ্যত, আমার নাকের ডগা থেকে সামান্য দূরে। তার চোখগুলো রাগে জ্বলছিল। কয়েক ইঞ্চি দূরে থাকা তার মুখ থেকে বিয়ারের তীব্র গন্ধ ভেসে এলো। আমি শুধু রিলাক্সড ছিলাম।

আমার সেই তথাকথিত বন্ধুরা চেয়ার পরিষ্কারের কাজ ফেলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকল শুধু। তাদের একজনও আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না। অনেক ধন্যবাদ, বন্ধুরা! আমাদের এই মুখোমুখি থাকাটা কয়েক মিনিট স্থায়ী হলো। যা ঘটছিল তাতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেই রাগী কর্মচারীটা আমার নির্বিকার প্রতিক্রিয়ার সামনে একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল। তার চিরাচরিত অভ্যাস শুধু ভয় পেতে বা রুখে দাঁড়াতে দেখতে অভ্যস্ত ছিল। তার মস্তিষ্ক জানত না এমন একজন ব্যক্তির প্রতি কীভাবে সাড়া দেবে যে তার নাকের সামনে উদ্যত ঘুষি দেখেও নির্বিকার থাকে। আমি জানতাম, সে আমাকে ঘুষিও মারতে

পারবে না, সরে যেতেও পারবে না। আমার নির্ভীকতা তাকে হতবুদ্ধি করে তুলেছিল। এই কয়েক মিনিটে ট্রাকটা পার্ক করে তার বস আমাদের দিকে এগিয়ে গেল। সে তার জমে যাওয়া কর্মচারীর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এসো, চেয়ারগুলো নামাই।' এতে অচলাবস্থা ভাঙলো, উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ তৈরি হলো তার জন্য।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমিও আপনাদের সাহায্য করব।' আর আমরা একসাথে চেয়ারগুলো নামালাম।

চতুর্থ অধ্যায়

রাগ ও ক্ষমা

রাগ

রাগ কোনো ভালো প্রতিক্রিয়া নয়। জ্ঞানী লোকেরা সুখী, আর সুখী লোকেরা রাগ করে না। প্রথমত, রাগ করা অযৌক্তিক।

একদিন আমাদের বিহারের গাড়িটা রাস্তায় ট্রাফিক লাইটের লাল সিগন্যালে থেমে গেল। পাশের একটা প্রাইভেট কারের গাড়ির চালক ট্রাফিক লাইটকে এভাবে গালাগালি করছিল : 'নরকে যাও, হে ট্রাফিক লাইট! তুমি জানতে আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তুমি জানতে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর সেই তুমি কিনা অন্যান্য গাড়িকে আমার আগে আগে চলে যেতে দিলে, শুয়োর কোথাকার! তোমার এ ধরনের কাজ কিন্তু এটাই প্রথম নয়, আগেও ...'

সে ট্রাফিক লাইটগুলোকে গালি দিচ্ছিল যেন তাদের কোনো কিছু করার আছে। সে ভেবেছিল যে ট্রাফিক লাইট উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাকে ঝামেলায় ফেলেছে : 'আহা, এই যে আসছে সে! আমি জানি তার দেরি হচ্ছে। আমি অন্যান্য গাড়িগুলোকে আগে যেতে দিই। আর ... লাল! থামো! পেয়েছি তাকে!' ট্রাফিক লাইটগুলোকে হিংসুটে মনে হতে পারে, কিন্তু তারা শুধু ট্রাফিক লাইট মাত্র, আর কিছু না। আপনি ট্রাফিক লাইটের কাছ থেকে আর কীই বা আশা করতে পারেন?

আমি কল্পনা করলাম সে বাসায় দেরি করে পৌঁছেছে এবং তার স্ত্রী তাকে দুষছে, 'তুমি একটা যাচ্ছেতাই স্বামী! তুমি জানতে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তুমি জানতে দেরি করা যাবে না। আর তুমি কিনা আমার চেয়ে অন্য কাজগুলোকেই বেশি গুরুত্ব দিলে। শুয়োর কোথাকার! তোমার এ রকম কিন্তু এটাই প্রথমবার নয়...'

সে তার স্বামীকে দুষছে যেন তার স্বামীর কোনো কিছু করার ছিল। সে ভেবেছে তার স্বামী ইচ্ছে করেই তাকে মনে দুঃখ দিয়েছে : 'আহা, আমার তো স্ত্রীর সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে! আমি একটু দেরি করে যাব। আমি প্রথমে এই লোকটার সাথে দেখা করব। দেরি হয়ে গেছে? খুব ঠিক হয়েছে!' স্বামীরা হয়তো হিংসুটে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তারা তো স্বামীই। সেটাই তো সব। স্বামীদের থেকে আপনি আর কীই বা আশা করতে পারেন? রাগজনক বেশির ভাগ পরিস্থিতির মোকাবেলায় এই গল্পের চরিত্রগুলো পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলে নেওয়া যেতে পারে।

বিচার

রাগ দেখাতে চাইলে প্রথমে সেটা নিজে নিজে বিচার করে দেখতে হবে। আপনার নিজেকে বুঝাতে হবে যে রাগটা ন্যায্য, যথার্থ রাগের এই মানসিক প্রক্রিয়ায় যেন আপনার মনের মধ্যেই একটা বিচার সভা বসে।

এই বিচার সভায় আপনার মনের আদালতের কাঠগড়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দাঁড়ায়। আপনি অভিযোগকারী, আপনি জানেন তারা দোষী। কিন্তু সেটা বিচারকের কাছে, আপনার বিবেকের কাছে আগে প্রমাণ করতে হবে। আপনি আপনার বিরুদ্ধে করা সেই অপরাধের একটা সচিত্র ভিডিও দেখিয়ে দেন।

আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাজের পেছনে যে সমস্ত বিদ্বেষ, ছলচাতুরী ও আপাত নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে আছে তার সবগুলো তুলে ধরেন। অতীত থেকে খুঁড়ে আনেন তাদের অন্যান্য অপরাধগুলোকেও। আপনার বিবেককে এগুলো দেখিয়ে বুঝিয়ে দেন যে তারা ক্ষমার অযোগ্য।

বাস্তবের আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির একজন উকিল থাকে, যাকে তার পক্ষ হয়ে নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু এই মানসিক বিচারে আপনি আপনার রাগকে ন্যায়সঙ্গত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আপনি কোনো মর্মান্তিক অজুহাত শুনতে চান না, অবিশ্বাস্য ব্যাখ্যাও আপনার দরকার নেই, ক্ষমা করে দেওয়ার কাতর মিনতিও আপনি শুনতে চান না। এখানে অভিযুক্তের উকিলকে কথা বলতে দেওয়া হয় না। আপনার একপেশে যুক্তি দিয়ে আপনি বিশ্বাসযোগ্য একটা মামলা সাজান। সেটাই যথেষ্ট। বিবেক তার হাতুড়ি দিয়ে দমাদম বাড়ি দেয়, আর তারা দোষী সাব্যস্ত হয়। এখন তাদের সাথে রাগ করাটা যুক্তিযুক্ত। বহু বছর আগে আমি যখন রেগে যেতাম তখনই আমার মনের মধ্যে এই বিচার প্রক্রিয়াটা ঘটতে দেখতাম। এটা খুবই অন্যায্য দেখাত। তাই পরের বার যখন আমি কারো সাথে রাগ করতে চাইতাম, আমি এক মুহূর্ত থেমে তাদের কী বলার আছে, তা বিবাদী পক্ষের উকিলকে বলতে দিতাম। আমি তাদের আচরণের সম্ভাব্য অজুহাতগুলো এবং যুতসই ব্যাখ্যাগুলো ভেবে ভেবে বের করতাম। আমি ক্ষমার সৌন্দর্যকেই গুরুত্ব দিতাম। আমি দেখতাম যে বিবেক আর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দোষী বলে রায় দিচ্ছে না। অন্যদের আচরণকে বিচার করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে গেল। রাগ ন্যায়সঙ্গত না হওয়ায় তার আহার না পেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা গেল।

একটি ভাবনা কোর্স

আমাদের রাগের বেশির ভাগ অংশই জ্বলে ওঠে অন্যায্য আশা থেকে। মাঝে মাঝে আমরা নিজেদের এমনভাবে ঢেলে দিই যে, যখন কোনো কিছু যেমনটা হওয়া উচিত, তেমনটা হয় না, তখন আমরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠি। সব রকম 'উচিত'গুলো নির্দেশ করে আশাকে, যা হচ্ছে ভবিষ্যতের অনুমান। আমরা হয়তো এতক্ষণে বুঝে গেছি যে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, অনুমান করে বলার মতো নয়। ভবিষ্যতের আশা বা উচিত-এর উপরে খুব বেশি নির্ভর করা মানে হচ্ছে ঝামেলাকে ডেকে আনা।

অনেক বছর আগে আমি একজন পশ্চিমা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীকে চিনতাম যে দূরপ্রাচ্যের কোনো এক দেশে একজন ভিক্ষু হয়েছিল। সে এক দুর্গম পাহাড়ের উপরে অবস্থিত কড়া নিয়মের অধীনে পরিচালিত এক ভাবনাকেন্দ্রে যোগ দিল। প্রতিবছর তারা ষাট দিনের এক ভাবনা কোর্স করত। এটি ছিল কঠিন, কড়া শৃঙ্খলার অধীন এবং দুর্বলমনাদের জন্য নয়।

তারা রাত ৩:০০টায় ঘুম থেকে উঠত। ৩:১০ মিনিটে সবাই ধ্যানে বসে যেত। পুরো দিনের রুটিন ছিল
পঞ্চাশ মিনিট ধ্যান, দশ মিনিট চংক্রমণ, - পঞ্চাশ মিনিট ধ্যান, দশ মিনিট চংক্রমণ - এভাবে চলত। যে হলরুমে বসে তারা ধ্যান করত, সেখানেই খাবার খেয়ে নিতে হতো। কোনো কথাবার্তা চলত না। রাত ১০:০০টায় তারা শুয়ে পড়তে পারত, কিন্তু সেটা সেই হলরুমেই, যেখানে বসে ধ্যান করত ঠিক সে জায়গায়।

৩:০০টায় ঘুম থেকে ওঠা ছিল অপশনাল ব্যাপার, আপনি যদি চান তারও আগে উঠতে পারবেন, কিন্তু তার পরে নয়। মাঝখানে ব্রেক ছিল কেবল তাদের ভয়ংকর গুরুর সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বের সময়। আর অবশ্যই ছিল সংক্ষিপ্ত টয়লেট ব্রেক।

তিন দিন পরে পশ্চিমা ওই ভিক্ষুর পা ও পিঠে খুব ব্যথা হলো। সে এভাবে বসে থাকতে অভ্যস্ত ছিল না। একজন পশ্চিমার জন্য এভাবে বসে থাকাটা ছিল খুব অস্বস্তিকর। তা ছাড়াও কোর্স শেষ হওয়ার এখনো আট সপ্তাহ বাকি আছে এখনো। তার সন্দেহ দেখা দিল, এত লম্বা ভাবনা কোর্সে টিকে থাকতে পারবে কি না।

প্রথম সপ্তাহ শেষে অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না। এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে সে প্রায়ই ব্যথায় কাতরাত। যাদের দশ দিনের ভাবনা কোর্সে যোগ দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে, তারা বুঝবে কেমন ব্যথা লাগে। তাকে আরও সাড়ে সাত সপ্তাহ সহ্য করতে হবে।

এই লোকটা ছিল কঠিন ধাতের। সে তার সবটুকু শক্তি একত্র করল, আর প্রত্যেকটা সেকেন্ড গুণে গুণে সহ্য করল। দু সপ্তাহ শেষে তার মনে হলো, যথেষ্ট হয়েছে। ব্যথা বেড়েছে খুব বেশি। এমন ব্যবস্থায় তার পশ্চিমা দেহ অভ্যস্ত নয়। এটা বৌদ্ধধর্ম নয়। এটা মধ্যপথ নয়। এরপর সে আশেপাশে অন্যান্য এশিয়ান ভিক্ষুদের দেখল, তারাও দাঁত-মুখ খিঁচে বসে আছে। জেদ তাকে আরও দু সপ্তাহ কাটাতে সাহায্য করল। এ সময় তার মনে হলো দেহটা যেন ব্যথার আগুনে সেঁকা হচ্ছে। দম ফেলার ফুরসত মিলত কেবল রাত ১০:০০টার ঘণ্টায়, যখন সে একটু শুয়ে পড়ে তার নির্যাতিত দেহকে একটু বিশ্রাম দিতে পারত। কিন্তু মনে হতো যেন ঘুমিয়ে পড়ার আগেই সকাল ৩:০০টার ঘণ্টা বেজে উঠেছে। আরেকটি নতুন দিনে নিপীড়নে জর্জরিত হওয়ার জন্য সে জেগে উঠত। ত্রিশতম দিনের শেষে যেন নিভু নিভু আশার বাতি জ্বলে উঠল বহু দূরে। সে এখন অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে। সে এখন নিজেকে নিজে বুঝাতে পারে, 'এই তো পৌঁছে গেছি'। দিনগুলো দিন দিন আরও দীর্ঘ হলো, আর তার হাঁটু ও পিঠের ব্যথা তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হলো। মাঝে মাঝে মনে হতো সে কেঁদে ফেলবে। তবু সে ঠেলেঠুলে নিজেকে এগিয়ে নিল। আরও দু সপ্তাহ। আরও এক সপ্তাহ। সেই শেষ সপ্তাহে সময় এমনভাবে টেনে টেনে কাটতে লাগল যেন পানির ধারায় আটকে যাওয়া পিঁপড়ার মতো। যদিও এখন সে ব্যথা সহ্য করতে অভ্যস্ত তবুও তা আগের চাইতে সহজ ছিল না মোটেও। সে ভাবল, এখন হাল ছেড়ে দেওয়া মানেই হলো, এত দিন ধরে এত কষ্ট সে করেছে, তার প্রতি অবিচার করা হবে। সে এটার শেষ দেখেই ছাড়বে, এতে যদি মরতে হয় তো মরবে। মাঝে মাঝে সত্যিই ভাবত সে মারা যাচ্ছে!

ষাটতম দিনে সকাল তিনটার ঘণ্টায় সে জেগে উঠল। প্রায় পৌঁছে গেছে সে। শেষ দিনের ব্যথা ছিল অসহনীয়। এত দিন পর্যন্ত ব্যথা যেন সামান্য মজা করছিল

তাকে নিয়ে; কিন্তু এখন এটি কোনো ঘুষিই বাদ রাখছে না। যদিও শেষ হবার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি, তার সন্দেহ হলো, সে এটা শেষ করতে পারবে কি না। এরপর আসল সর্বশেষ পঞ্চাশ মিনিট। সে এই সর্বশেষ ধ্যান শুরু করল কল্পনা নিয়ে। এক ঘণ্টা পরে ভাবনা কোর্স শেষ হলে সে কী কী করবে, গরম পানিতে একটা লম্বা গোসল, আয়েশি খানা, কথা বলা, গল্পগুজব; কিন্তু ব্যথা এসে তার পরিকল্পনায় বার বার ব্যঘাত ঘটাল, তার মনকে সেদিকে দিতে বাধ্য করল। সে তার চোখ সামান্য খুলে চুপি চুপি কয়েকবার ঘড়ির দিকে তাকাল। সে বিশ্বাসই করতে পারল না সময় কেন এত ধীরে ধীরে যায়। ঘড়ির ব্যাটারিগুলো কি পাল্টানো দরকার নাকি? ভাবনা কোর্স শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগেই হয়তো ঘড়িটা বন্ধ হয়ে সেখানেই থেমে যাবে চিরকালের জন্য? শেষ পঞ্চাশ মিনিট যেন পঞ্চাশ যুগ বলে মনে হলো। কিন্তু মহাকালেরও শেষ আছে। আর তাই এটিও শেষ হলো একসময়। মিষ্টি সুরে ভাবনা কোর্সের সমাপ্তিসূচক ঘণ্টা বেজে উঠল।

আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল তার সারা শরীর জুড়ে। ব্যথাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অনেক দূরে। সে পেরেছে। সে এখন নিজেকে একটু পরিচর্যা করবে। গোসলখানা কই?

ভাবনা গুরু আবার ঘণ্টা বাজিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন, ‘একটা ঘোষণা। এটি সত্যিই অসাধারণ একটি ভাবনা কোর্স ছিল। অনেক ভিক্ষুর অগ্রগতি খুব ভালো হয়েছে। আর তাদের কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রশ্নোত্তর পর্বে আমাকে পরামর্শ দিয়েছে যে, ভাবনা কোর্সের মেয়াদ আরও দু সপ্তাহ বাড়ানো উচিত। আমি মনে করি এটা একটা চমৎকার আইডিয়া। ভাবনা কোর্সের মেয়াদ বাড়ানো হলো। ধ্যান করতে থাকো সবাই।’
সব ভিক্ষু আবার তাদের পা ভাঁজ করে নিথর হয়ে ধ্যানে বসে পড়ল, আরও দু সপ্তাহের জন্য। পশ্চিমা ভিক্ষুটি আমাকে বলেছিল যে, সে আর দেহে কোনো ব্যথা অনুভব করছিল না। সে শুধু নির্ণয় করার চেষ্টা করছিল, কারা সেই হতভাগা ভিক্ষু, যারা এই মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে; আর ভাবছিল, একবার খুঁজে পেলে সে তাদের নিয়ে কী করবে! সেই অবিবেচক ভিক্ষুদের জন্য সবচেয়ে অভিক্ষুসুলভ বিভিন্ন প্ল্যান করতে লাগল সে।

তার রাগ যেন পুরনো সব ব্যথাকে শুষে নিয়েছিল। সে রাগে জ্বলছিল। সে যেন খুনের নেশায় মাতাল। এমন রাগ তার আগে কখনো হয় নি। এরপর আবার ঘণ্টা বাজল। এটা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে স্বল্পমেয়াদী পনের মিনিট।

গুরু ঘোষণা করলেন, ‘ভাবনা কোর্স সমাপ্ত। তোমাদের সবার জন্য খাবার প্রস্তুত আছে ক্যান্টিনে। সবাই বিশ্রাম নাও। তোমরা এখন কথা বলতে পারো।’
পশ্চিমা ভিক্ষুটি বিমূঢ় হয়ে গেল। আমি তো ভেবেছি আরও দু সপ্তাহ ধ্যান করতে হবে। হচ্ছেটা কী? একজন ইংরেজি জানা সিনিয়র ভিক্ষু তার বিমূঢ় ভাব লক্ষ করে তার দিকে এগিয়ে এলো। হেসে সে পশ্চিমা ভিক্ষুটিকে বলল, ‘চিন্তা করো না, গুরু এ রকম করে থাকেন প্রতিবছর!’

রাগখেকো দানব

রাগ নিয়ে একটা সমস্যা হলো আমরা রেগে যাওয়াটা উপভোগ করি। রাগ দেখানোর সাথে কেমন জানি একটা মাদকতা জড়ানো থাকে। অন্য ধরনের বন্য আনন্দ কাজ করে। যাতে আনন্দ থাকে, তাকে আমরা উপভোগ করি, তাকে আমরা যেতে দিতে চাই না। তবে রাগ দেখানোতে বিপদও আছে। রাগ

দেখানোর ফল এই আনন্দের চেয়েও ভারী হয়ে চেপে বসে। যদি আমরা রাগের ফল উপলব্ধি করতাম, তাহলেই আমরা রাগকে সানন্দে যেতে দিতে রাজি হতাম।

অনেক অনেক আগে কোনো এক জগতে এক রাজ প্রাসাদে এক দানব প্রবেশ করল। সে সময় রাজা কী একটা কাজে বাইরে ছিলেন। দানবটি দেখতে এমন কুৎসিত, গা থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হয়, আর তার কথাবার্তাও এমন বিশ্রী যে রাজপ্রাসাদের সৈন্যসামন্ত কর্মচারী সবাই ভয়ে কাত। এই সুযোগে সে বাইরের রুমগুলো পেরিয়ে রাজদরবারে গিয়ে সোজা রাজসিংহাসনে বসে পড়ল। তাকে সেখানে বসতে দেখে সৈন্যসামন্ত ও অন্যান্যদের হুঁশ ফিরে এলো।

তারা চিৎকার করে বলল, 'বের হও ওখান থেকে! তোমার জায়গা ওখানে নয়! এখুনি যদি তোমার পাছা ওখান থেকে না সরাও তো তলোয়ার দিয়ে গুঁতিয়ে ওটাকে বের করে দেব আমরা।'

এই কয়েকটি রাগের কথায় দানবটি কয়েক ইঞ্চি বড় হয়ে গেল। তার চেহারা আরও কদাকার হলো। দুর্গন্ধ আরও তীব্র হলো। কথাবার্তা আরও অশ্লীল হয়ে উঠল।

তলোয়ার উঁচিয়ে ধরা হলো। ছোরা বের করা হলো খাপ থেকে। অনেক হুমকি ধামকি দেওয়া হলো। প্রত্যেকটি রাগের কথায়, কাজে, এমনকি প্রত্যেকটি রাগমূলক চিন্তায় দানবটি এক ইঞ্চি করে বাড়ল, আরও বিশ্রী চেহারা হলো, দুর্গন্ধ আরও বাড়ল, কথাবার্তা আরও অশ্রাব্য হয়ে উঠল।

এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর রাজা ফিরলেন। তিনি তার আসনে এক বিশালকায় দানবকে বসে থাকতে দেখলেন। এমন জঘন্য ও কুৎসিত কোনো কিছু আগে কখনো দেখেননি তিনি, এমনকি কোনো ফিল্মেও নয়। দানবটার গায়ের দুর্গন্ধে কৃমিও অসুস্থ হয়ে পড়বে। তার কথাবার্তা শুঁড়িখানার মাতালদের গালিকেও হার মানাবে।

রাজা কিন্তু জ্ঞানী ছিলেন। এজন্যই তো তিনি রাজা। তিনি জানতেন কী করতে হবে। রাজা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন, 'স্বাগতম, স্বাগতম আমার প্রাসাদে। আপনাকে কেউ কী পানীয়-টানীয় কিছু দিয়েছে ইতিমধ্যে? অথবা কোনো খাদ্য-ভোজ্য?'

এমন দয়ালু আচরণে দানবটি কয়েক ইঞ্চি ছোট হয়ে গেল, বিশ্রী ভাব একটু কমল, দুর্গন্ধ একটু কমে গেল। কথাবার্তা আগের থেকে কম অশ্লীল শোনাল। প্রাসাদের লোকজন দ্রুত ব্যাপারটা ধরতে পারল। একজন দানবটিকে জিজ্ঞেস করল, তার এক কাপ চা লাগবে কি না। আমাদের আছে দার্জিলিংয়ের চা, ইংলিশ চা, অথবা আপনি যদি চান তো আর্ল গ্রে চা। নাকি পেপারমিন্ট দেব? এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হবে। আরেকজন ফোনে পিৎজার অর্ডার দিল। যেন তেন পিৎজা নয়, এমন বড় দানবের জন্য বড়সড় ফ্যামিলি সাইজের পিৎজা। অন্যরা স্যান্ড্যুইচ বানিয়ে দিল মাংসের ভুনা দিয়ে। একজন সৈন্য দানবটির পা মালিশ করে দিল। আরেকজন তার ঘাড়ের আশগুলো চুলকে দিল। 'উম্ ম্ ম! কী দারুণ!' ভাবল দানবটা।

প্রত্যেকটি দয়ার কথায়, কাজে ও চিন্তায় সেটি আরও ছোট হলো। আরও কম কুৎসিত হলো। আরও কম দুর্গন্ধ ছড়াল। আরও কম অশ্লীল কথাবার্তা আওড়াল। পিৎজা নিয়ে আসার আগেই সে আগের সাইজে ফিরে আসল। কিন্তু তাই বলে অন্যরা ভালো আচরণ করা বন্ধ করল না। শীঘ্রই দানবটির সাইজ এমন ছোট হয়ে গেল যে তাকে দেখতে পাওয়াই দায়। পরিশেষে আরও একটা দয়ার কাজের পরেই সে পুরোপুরি মিলিয়ে গেল। আমরা এমন দানবকে বলি 'রাগখেকো দানব'।

আপনার সঙ্গী হয়তো মাঝেমধ্যে এমন রাগখেকো দানবে পরিণত হতে পারে। আপনি তাদের সাথে রাগ করলে তারা আরও খারাপ, আরও কুৎসিত, আরও বেশি দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং কথাবার্তা আরও অশ্রাব্য হয়ে ওঠে। প্রত্যেক রাগের কথায় সমস্যাটা আরও বড় হয়, এমনকি রাগের চিন্তা করলেও। বোধহয় এখন আপনি আপনার ভুল বুঝতে পেরেছেন, আর জেনে গেছেন কী করতে হবে।

ব্যথাও আরেকটা রাগখেকো দানব। যখনই আমরা রাগের চোটে ভাবি, 'ব্যথা! বের হও এখান থেকে! তোমার এখানে কোনো জায়গা নেই!' তখন ব্যথা আরেকটু বড় হয়, অবস্থা আরেকটু খারাপ হয়। ব্যথার মতো এমন জঘন্য ও বিশ্রী কোনো কিছুর প্রতি দয়া দেখানো কঠিন, কিন্তু জীবনে মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন আমাদের হাতে অন্য কোনো উপায় থাকে না। আমার দাঁতের ব্যথার গল্পের মতো, যখন আমরা ব্যথাকে সত্যি সত্যিই আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই, এটি কমতে থাকে। সমস্যা হাল্কা হয়ে ওঠে, আর মাঝে মাঝে পুরোপুরি উধাও হয়ে যায়।

কিছু কিছু ক্যান্সারও রাগখেকো দানবের মতো। কুৎসিত ও বমি উদ্রেককারী এই দানবগুলো আমাদের দেহে, আমাদের সিংহাসনে বাস করে। এটা বলা স্বাভাবিক, 'বের হও এখান থেকে! এটা তোমার জায়গা নয়!' যখন সবকিছু ব্যর্থ অথবা তারও আগে আগে আমরা বলতে পারি : 'স্বাগতম।' কিছু কিছু ক্যান্সার আছে যেগুলো দুশ্চিন্তাকে খেয়ে খেয়ে বেড়ে ওঠে, এজন্যই এগুলো 'রাগখেকো দানব'। এ ধরনের ক্যান্সার ভালো সাড়া দেয় যখন 'প্রাসাদের রাজা' সাহসের সাথে বলে, 'হে ক্যান্সার, আমার হৃদয়ের দরজা তোমার জন্য পুরোপুরি খোলা, তুমি যা-ই করো না কেন। এসো, ভেতরে এসো!'

ঠিক আছে! অনেক হয়েছে! আমি চলে যাচ্ছি!

রাগের আরেকটা ফল আমাদের মনে রাখা উচিত। সেটা হচ্ছে এটি আমাদের সম্পর্ককে ধ্বংস করে, এবং বন্ধুদের কাছ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেয়। কেন এমন হয়? এত বছর একসাথে কাটিয়ে যখন তারা কোনো ভুল করে, আমাদের মনে খুব দুঃখ দেয়, আমরা তখন কেন এমন রেগে যাই যে এত দিনের সম্পর্কটাকে শেষ করে দিই? কত চমৎকার মুহূর্তগুলো আমরা একসাথে কাটিয়েছি (৯৯৮টি ইট) সেগুলো এখন যেন তুচ্ছ ও নগণ্য। আমরা এখন দেখি একটি মাত্র মারাত্মক ভুলকে (২টি খারাপ ইট) আর এতেই পুরো জিনিসটাকে ধ্বংস করে দিই। এটা কেন জানি ন্যায্য বলে মনে হয় না। যদি আপনি একা হতে চান, তবে রাগী হোন।

এক তরুণ কানাডিয়ান দম্পতিকে আমি চিনতাম। তারা পার্থে তাদের কাজ শেষ করেছিল। অস্ট্রেলিয়া থেকে কানাডার টরন্টোতে ফিরে যাওয়ার প্ল্যান করতে গিয়ে তাদের মাথায় একটা বুদ্ধি আসল। তারা সাগর পাড়ি দিয়ে কানাডায় যাবে। তারা ছোট একটা ইয়ট কেনার প্ল্যান করল। তাদের ইয়ট কিনতে সাহায্য

করল আরও এক তরুণ দম্পতি। তারাও প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে কানাডার ভ্যাংকুভারে যেতে চায়। সেখানে তারা ইয়টটাকে বিক্রি করে তাদের টাকাটা তুলে নেবে আর সেই টাকা দিয়ে বাড়ি বানাবে। এটা কেবল অর্থনৈতিকভাবেই লাভজনক ছিল না, বরং একজোড়া তরুণ দম্পতির জন্য এটা ছিল জীবনের একটা রোমাঞ্চকর অভিযান।

নিরাপদে কানাডায় পৌঁছে তারা আমাকে একটা চিঠি লিখে তাদের সেই চমৎকার অভিযানের কথা জানাল। বিশেষ করে তারা একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করল যা থেকে দেখা যায় রেগে গেলে আমরা কেমন বোকা বনে যেতে পারি, আর কেনই বা রাগকে দমন করতে হয় তার কারণ।

ভ্রমণের মাঝপথে প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো এক জায়গায় তীর থেকে বহু বহু কিলোমিটার দূরে তাদের ইয়টের ইঞ্জিন বিগড়ে গেল। তরুণ দুজন কাজের পোশাক পরে নিয়ে ছোট ইঞ্জিন রুমে নেমে গেল, এবং ইঞ্জিনটা সারানোর চেষ্টা করল। তরুণী দুজন ইয়টের ডেকে বসে আরামদায়ক রোদে ম্যাগাজিন পড়তে লাগল।

ইঞ্জিন রুমটা গরম ও খুব ছোট ছিল। ইঞ্জিনটা যেন একগুঁয়ে হয়ে গিয়েছিল, কিছুতেই সারতে চাইছিল না। বড় বড় নাটগুলো যেন কিছুতেই ঘুরতে চাচ্ছিল না। ছোট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ স্ক্রুগুলো পিছলে গিয়ে হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, আর এমন ফাঁক ফোঁকরের মধ্যে গিয়ে পড়ছিল যে সেখান থেকে সেগুলো খুঁজে পাওয়াও দায়, তুলে আনা তো দূরের কথা। লিকগুলো কিছুতেই বন্ধ হতে চাচ্ছিল না। এমন দিশেহারা অবস্থা রুদ্ররোষের জন্ম দিল। প্রথমে ইঞ্জিনটাকে দুষল তারা, পরে দুষতে শুরু করল পরস্পরকে। এমন রুদ্ররোষ শীঘ্রই পরিণত হলো রাগে। রাগ পরিণত হলো উন্মত্ততায়। একজন রেগেমেগে হাল ছেড়ে দিল। যথেষ্ট হয়েছে তার। সে হাতের রেঞ্চ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'ঠিক আছে! অনেক হয়েছে! আমি চলে যাচ্ছি!'

সে রাগে এমন উন্মত্ত হয়ে গেল যে তার কেবিনে ঢুকে সাফসুতরো হয়ে কাপড় বদলে নিয়ে, ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে ইয়টের ডেকে বেরিয়ে এলো। রাগে তখনো ফুঁসছে সে, গায়ে জ্যাকেট, দুহাতে ধরা দুটো ব্যাগ।

মেয়ে দুজন বলেছিল যে তাদের নাকি হাসতে হাসতে বোট থেকে গড়িয়ে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। বেচারা তরুণটি চারপাশের অসীম সাগরে চোখ বুলিয়ে নিল, যত দূর দুচোখ যায় তত দূর পর্যন্ত সবখানে। যাওয়ার কোথাও জায়গা ছিল না।
সে এমন বোকা হয়ে গেল যে নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কেবিনে ফিরে গিয়ে সবকিছু আবার ব্যাগ থেকে বের করল, কাজের পোশাক পরল আবার, আর ইঞ্জিনরুমে ফিরে গেল অন্যজনকে সাহায্য করতে। সে বাধ্য হয়েছিল ফিরে যেতে। যাওয়ার আর কোথাও জায়গা ছিল না যে।

যেভাবে বিদ্রোহ থামাতে হয়

যখন আমাদের উপলব্ধি হয় যে, যাওয়ার কোথাও জায়গা নেই, তখন আমরা পালিয়ে না গিয়ে সমস্যার মোকাবেলা করি। বেশির ভাগ সমস্যার সমাধান আছে, যা আমরা উল্টো দিকে দৌড় মারতে গিয়ে খেয়ালই করি না। আগের গল্পে ইয়টের ইঞ্জিনটা ঠিক হয়ে গিয়েছিল, তরুণ দুজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু হয়ে গিয়েছিল, আর

ভ্রমণের বাকি অংশটা তারা একসাথে দারুণভাবে কাটিয়েছিল।

আমাদের এই জগতে লোকজন যখন একসাথে থাকার জন্য কাছাকাছি চলে আসে, তখন নিজেদের সমস্যাগুলোর সমাধান নিজেদেরই করতে হয়। পালানোর কোনো পথ নেই। আমরা আর বেশি মতপার্থক্য নিয়ে চলতে পারি না।

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছিলাম, কীভাবে একটা দেশের সরকার একটা বড. সংকটের এমন চমৎকার সমাধান খুঁজে পেয়েছিল, যে সংকটটা তাদের দেশের গণতন্ত্রের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছিল।

১৯৭৫ সালে কয়েক দিনের মাথায় দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া কমিউনিস্টদের হাতে চলে গেল। পশ্চিমা শক্তিগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে থাইল্যান্ড হচ্ছে এর পরবর্তী শিকার। সেই সময় আমি উত্তরপূর্ব থাইল্যান্ডে একজন নবীন ভিক্ষু হয়েছি মাত্র। যে বিহারে আমি থাকতাম, তা হ্যানয়ের যতটা কাছে ছিল, ব্যাংকক থেকে ছিল এর দ্বিগুণ দূরে। আমাদের দূতাবাসে গিয়ে রেজিস্টারে নাম লেখাতে বলা হলো, আর আমাদের সরিয়ে নেওয়ার প্ল্যানও রেডি করা হলো। বেশির ভাগ পশ্চিমা সরকার অবাক হয়ে গিয়েছিল, যখন তারা দেখল যে থাইল্যান্ড পড়ে. যায় নি।

আজান চাহ্ তখন বেশ বিখ্যাত ছিলেন। অনেক উচ্চপদস্থ থাই জেনারেল ও সংসদের সিনিয়র সদস্যরা উপদেশ ও অনুপ্রেরণা নিতে তার বিহারে যেতেন। আমি তখন থাই ভাষা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি। লাও ভাষাও বলতে পারি কিছু কিছু। তাই পরিস্থিতির গুরুত্বটা বুঝতে বেগ পেতে হয় নি। থাইল্যান্ডের সামরিক বাহিনী ও সরকার বাইরের কমিউনিস্ট কর্মীদের নিয়ে অতটা উদ্বিগ্ন ছিল না, তাদের যত উদ্বেগ ছিল দেশের ভেতরের কমিউনিস্ট কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে।

অনেক মেধাবী থাই ইউনিভার্সিটির ছাত্র উত্তরপূর্ব থাইল্যান্ডের জঙ্গলে ঢুকে অভ্যন্তরীণ থাই কমিউনিস্ট গেরিলা বাহিনীকে সাহায্য করতে লাগল। বর্ডারের বাইরে থেকে তাদের জন্য অস্ত্র গোলাবারুদ, ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে লাগল।

সেই অঞ্চলের গ্রামবাসীরাও তাদের খুশিমনে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র যোগাতে লাগল। তাদের ছিল স্থানীয় সমর্থন। তারা হয়ে উঠছিল এক ভয়ংকর হুমকি।

থাই সামরিক বাহিনী ও সরকার এর সমাধান করল তিন ধাপের একটি সমন্বিত কৌশলে।

১.সংযম

সামরিক বাহিনী কোনো কমিউনিস্ট ঘাঁটিকে আক্রমণ করল না। যদিও প্রত্যেকটি সৈন্য জানত সেগুলো কোথায়। যখন আমি ১৯৭৯-৮০ সালের দিকে শুধু জঙ্গলে কাটিয়েছি, নির্জনে ধ্যান করার জন্য পাহাড, পর্বত ও জঙ্গল খুঁজে বেরিয়েছি, তখন মাঝে মাঝে আর্মিদের সাথে দেখা হতো। তারা আমাকে একটা পাহাড. আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত, এবং ওদিকে যেতে মানা করত, ওখানে কমিউনিস্টদের আস্তানা। তারা অন্য পাহাড. দেখিয়ে দিয়ে বলত ওটা ধ্যান করার

জন্য ভালো জায়গা, ওখানে কোনো কমিউনিস্ট নেই। তাদের পরামর্শ আমাকে মানতে হয়েছিল। আমি শুনেছিলাম, সেই বছর কমিউনিস্টরা কয়েকজন ধুতাঙ্গ ভিক্ষুকে জঙ্গলে ধ্যান করার সময় ধরে ফেলে, এবং পরে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছিল।

২.ক্ষমা

এই বিপদজনক সময়ে সেখানে তখন অঘোষিত যুদ্ধবিরতি চলছিল। যখনই কোনো কমিউনিস্ট বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করতে চাইত, সে সহজেই অস্ত্র ত্যাগ করে গ্রামে বা ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যেতে পারত। তাকে হয়তো চোখে চোখে রাখা হতো, কিন্তু কোনো শাস্তি দেওয়া হতো না। আমি একবার কো ওং জেলার এক গ্রামে পৌঁছলাম যেখানে কয়েক মাস আগে কমিউনিস্টরা এমবুশ করে তাদের গ্রামের বাইরে এক জীপ থাই সৈন্যকে মেরে ফেলেছিল। গ্রামের তরুণেরা বেশির ভাগই কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, যদিও তারা সরাসরি কমিউনিস্টদের কাজ করত না। তারা আমাকে বলেছিল যে তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, হেনস্থা করা হয়েছে, কিন্তু পরে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

৩.মূল সমস্যার সমাধান

সেই বছরগুলোতে আমি দেখতাম নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে। পুরনো পথগুলো পাকা করা হচ্ছে। গ্রামবাসীরা এখন তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলো সহজেই শহরে বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে পারে। থাইল্যান্ডের রাজা ব্যক্তিগতভাবে শত শত পানি সেচ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের খোঁজখবর নিয়েছেন, যাতে গরিব কৃষকরা প্রত্যেক বছর দ্বিতীয়বার ফসল ফলাতে পারে। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছিল পাড়ায় পাড়ায়। তার সাথে সাথে আসল একটি করে স্কুল ও ক্লিনিক। থাইল্যান্ডের সবচেয়ে দরিদ্র অঞ্চলটাকে ব্যাংককের সরকার দেখাশোনা করছে, যার ফলে গ্রামবাসীরা আগের থেকে উন্নত হয়ে উঠল।
একজন থাই সৈন্য জঙ্গলে টহল দেওয়ার সময় আমাকে এই কথাগুলো বলেছিল :

কমিউনিস্টদের গুলি করার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। তারা আমাদেরই থাই বন্ধুবান্ধব। তারা পাহাড় থেকে নামার সময় অথবা গ্রাম থেকে রসদ আনতে যাবার সময় যখন তাদের সাথে আমার দেখা হয়, আমরা সবাই পরস্পরকে চিনি। আমি তাদের আমার নতুন হাতঘড়িটা দেখাই, অথবা আমার নতুন রেডিওতে শোনাই একটা থাই গান, তখন তারা কমিউনিস্ট হওয়াটা ত্যাগ করে।

সেটা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সৈন্যদের অভিজ্ঞতাও একই।

থাই কমিউনিস্টরা তাদের সরকারের প্রতি এমন রাগ নিয়ে বিদ্রোহ শুরু করেছিল যে তারা তাদের তরুণ জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সরকারের সংযম প্রদর্শনের ফলে তাদের রাগ খারাপের দিকে গড়ানোর সুযোগ পায় নি। ক্ষমা ও অঘোষিত অস্ত্রবিরতি তাদের নিরাপদ ও সম্মানজনক পথে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছিল। উন্নয়নের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে গরিব গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা হয়েছিল। গ্রামবাসীরা কমিউনিস্টদের সাহায্য করার আর কোনো কারণ খুঁজে পেল না। সরকার তাদের যেরূপ উন্নয়ন করে দিয়েছে, তাতে তারা যারপরনাই সন্তুষ্ট। ওদিকে

কমিউনিস্টদের মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল, তারা এটা কী করছে? এই জঙ্গলে ঢাকা পাহাড় পর্বতে এমন কষ্টের মাঝে জীবন কাটাচ্ছে কেন তারা? একের পর এক তারা অস্ত্র জমা দিয়ে নিজ নিজ পরিবারে, গ্রামে বা ইউনিভার্সিটিতে ফিরে গেল। ১৯৮০ সালের প্রারম্ভে বলতে গেলে আর কোনো বিদ্রোহীই অবশিষ্ট রইল না। অতএব কমিউনিস্টদের লিডাররাও আত্মসমর্পণ করল। আমি ব্যাংকক পোস্ট নামের একটা সংবাদপত্রে একটা লেখা পড়েছিলাম একজন নবীন উদ্যোক্তাকে নিয়ে, যে থাই টুরিস্টদের জঙ্গলে, গুহায় কমিউনিস্টদের ফেলে যাওয়া আস্তানা দেখিয়ে আনত।
সেই কমিউনিস্ট বিদ্রোহের নেতাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল? সেই একই নিঃশর্ত ক্ষমার প্রস্তাব কি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছিল? ঠিক সেরকম ঘটে নি। তাদের শাস্তি দেওয়া হয় নি, নির্বাসনও দেওয়া হয় নি। তার বদলে তাদের থাই প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছিল তাদের নেতৃত্বের গুণাবলী, কঠোর পরিশ্রমের ক্ষমতা এবং জনগণের প্রতি তাদের চিন্তার স্বীকৃতি হিসেবে। কী কৌশল! এমন সাহসী ও নিবেদিতপ্রাণ যুবসম্পদকে কেন নষ্ট করতে যাওয়া? তার চেয়ে কাজে লাগাও তাদের।

এটি একটি সত্যি ঘটনা যা আমি সেই সময়ের সৈন্য ও গ্রামবাসীদের কাছ থেকে শুনেছি। এটি এমন একটি ঘটনা যা আমি দু চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। দুঃখের বিষয়, এটি পরে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি।

এই বই লেখার সময়ে, সেই প্রাক্তন কমিউনিস্ট নেতাদের দুজন তখন থাই জাতীয় সংসদে মন্ত্রী হিসেবে দেশের জন্য কাজ করছিলেন।

ক্ষমা দিয়ে ঠান্ডা করা

যখন কেউ আমাদের আঘাত দেয়, তখন তাকে শাস্তি দেওয়ার কাজটা যে আমাদেরই করতে হবে, এমন নয়। আমরা যদি খ্রিস্টান, মুসলিম বা ইহুদি হই, তাহলে আমরা কি নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করি না যে, সৃষ্টিকর্তা তাকে যথেষ্ট শাস্তি দেবেন? যদি আমরা বুড্ডিস্ট, হিন্দু বা শিখ হই, আমরা জানব যে, কর্ম নিশ্চয়ই আক্রমণকারীকে তার কর্ম অনুসারে ফল দেবে। আর যদি আপনি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অনুসারী হন, তাহলে তো জানেন যে আক্রমণকারীকে তার অপরাধবোধের চিকিৎসা করতে গিয়ে অনেক ব্যয়বহুল থেরাপি নিতে হবে প্রতিবছর।

তাই ‘তাদের একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া’টা কেন আমরা করতে যাব? ভালোমতো বিচার বিবেচনা করলে দেখব যে আমাদের তা করার কোনো দরকার নেই। যখন আমরা রাগকে যেতে দিই, আর ক্ষমা দিয়ে ঠান্ডা করে দিই, তখনো কিন্তু আমরা জনগণের প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলো পালন করে যাই প্রতিনিয়ত।

আমার দুজন পশ্চিমা বন্ধু ভিক্ষু তর্কাতর্কি করছিল। এক ভিক্ষু ছিল প্রাক্তন ইউএস মেরিন সেনা, যে ভিয়েতনামে সম্মুখ যুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং গুরুতর আহত হয়েছিল। অন্যজন ছিল খুব সফল একজন ব্যবসায়ী, যে অল্প বয়সেই এত টাকা কামিয়েছিল যে পঁচিশের কোঠায় এসে কাজকর্ম থেকে ‘অবসর’ নিয়েছিল। তারা দুজনই ছিল খুব চালাক, শক্ত সামর্থ অত্যন্ত কঠিন চরিত্রের লোক।

ভিক্ষুদের তর্কাতর্কি করার কথা নয়, কিন্তু তারা করছিল। ভিক্ষুদের ঘুষি মারামারি করার কথা নয়, কিন্তু তারা তা করতে যাচ্ছিল। তাদের একজনের চোখ আরেকজনের চোখে স্থির, একজনের নাক আরেকজনের নাক স্পর্শ করছে, আগুনঝরা দৃষ্টি দুজনেরই। এমন একটি উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মাঝখানে প্রাক্তন মেরিন সেনা হঠাৎ করে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে পরম শ্রদ্ধার সাথে সালাম করল বিস্মিত প্রাক্তন ব্যবসায়ী ভিক্ষুকে। এর পরে সে মাথা তুলে বলল, 'আমি দুঃখিত, আমাকে ক্ষমা করো।'

এটি ছিল সেই দুর্লভ সদাচারগুলোর একটি যা আসে সরাসরি হৃদয় থেকে। যা কোনো পরিকল্পনামাফিক নয়, বরং সব সময় স্বতঃস্ফূর্ত ও অনুপ্রেরণাদায়ী। এ ধরনের কাজ দেখামাত্র চেনা যায় আর সেগুলো হয় সম্পূর্ণ অপ্রতিরোধ্য।

প্রাক্তন ব্যবসায়ী ভিক্ষু কেঁদে ফেলল।
কয়েক মিনিট পরে তাদের একসাথে বন্ধু হিসেবে হাঁটতে দেখা গেল। ভিক্ষুদের সেটাই করার কথা।

ইতিবাচক ক্ষমা

আমি আপনাদের বলতে শুনি, ক্ষমা দিয়ে হয়তো বৌদ্ধ বিহারে কাজ হতে পারে, কিন্তু বাস্তব জীবনে এমন ক্ষমা দিলে আমাদের কাছ থেকে সুযোগসন্ধানীরা সুবিধা আদায় করে নেবে। লোকজন আমাদের পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাবে। তারা ভাববে আমরা দুর্বল। আমি এ বিষয়ে একমত। এমন ক্ষমায় কদাচিৎ কাজ হয়। সেই প্রবাদটা আছে না : 'একটা গালে চড় খেলে যে আরেকটা গাল এগিয়ে দেয়, তাকে একবার নয়, দু দুবার ডেন্টিস্টের কাছে যেতে হয়।'

আগের গল্পে থাই সরকার নিঃশর্ত ক্ষমার মাধ্যমে শুধু ক্ষমা নয়, এর থেকে বেশি কিছু করেছিল। এটি মূল কারণ দারিদ্র্যতাকেও খুঁজে নিয়ে এটিকে দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করেছিল। এ কারণেই এমন ক্ষমায় কাজ হয়েছিল।

আমি এমন ক্ষমাকে বলি 'ইতিবাচক ক্ষমা'। 'ইতিবাচক' মানে হচ্ছে, আমরা যে ভালো গুণগুলো দেখতে চাই, সেগুলোকে আরও শক্তিশালী করে তোলা।

'ক্ষমা' মানে হচ্ছে, সমস্যার অংশ হিসেবে যে খারাপ গুণগুলো, সেগুলোকে যেতে দেওয়া, সেগুলো নিয়ে পড়ে না থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়া। উদাহরণস্বরূপ, বাগানে শুধু আগাছাতে পানি দেওয়া মানে সমস্যাগুলোকে বাড়ানো, পানি না দেওয়া মানে ক্ষমা প্র্যাকটিস করা, শুধুমাত্র ফুলগুলোতে পানি দেওয়া, কিন্তু আগাছাগুলো বাদে। এটি হচ্ছে ইতিবাচক ক্ষমা।

প্রায় দশ বছর আগে পার্থে এক শুক্রবার সন্ধ্যায় ধর্মদেশনা শেষে একজন মহিলা আমার সাথে কথা বলতে এগিয়ে এলো। আমি যতদূর মনে করতে পারি, আমাদের সবগুলো সাপ্তাহিক দেশনাতেই তার নিয়মিত উপস্থিতি ছিল। কিন্তু এই প্রথম সে আমার সাথে কথা বলল। সে বলল যে, সে একটা বড় ধন্যবাদ দিতে চায়, কেবল আমাকে নয়, আরও অন্যান্য ভিক্ষুদেরও, যারা এই বিহারে দেশনা দিয়েছে। এর পরে সে এর কারণ ব্যাখ্যা করল। সে আমাদের বিহারে

আসা শুরু করে সাত বছর আগে থেকে। সে স্বীকার করল যে বৌদ্ধধর্ম বা ধ্যান সম্পর্কে তার মোটেও কোনো আগ্রহ ছিল না। তার এখানে আসার প্রধান কারণ ছিল বাসা থেকে বের হওয়ার একটা অজুহাত দেখানো।

মহিলাটি ভীষণ পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ছিল। তার স্বামী তাকে বাসায় প্রচন্ড নির্যাতন করত। সেই সময়ে এ ধরনের পারিবারিক নির্যাতনের শিকার যারা, তাদের সাহায্য করার মতো কোনো সহায়ক প্রতিষ্ঠান ছিল না। এমন পরিবেশে সে বেরিয়ে আসার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই সে আমাদের বুড্ডিস্ট সেন্টারে আসত এই ভেবে যে, এখানে দুই ঘণ্টা কাটালে সেই দুই ঘণ্টা অন্তত নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচা যাবে।

আমাদের বিহারে এসে সে যা শুনল, তা তার জীবনটাকে বদলে দিল। সে ভিক্ষুদের কাছ থেকে শুনল ইতিবাচক ক্ষমার কথা। সে এটা তার স্বামীর উপর চেষ্টা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিল। সে আমাকে বলেছিল যে, প্রতিবার যখন তার স্বামী তাকে মারত, সে তাকে ক্ষমা করে যেতে দিত। কীভাবে সে এটা করত, কেবল সে-ই জানে। প্রত্যেক বারে তার স্বামীর যে কোনো সদয় কাজ ও কথায়, তা যতই নগণ্য হোক না কেন, সে তাকে জড়িয়ে ধরত, চুমু দিত অথবা এমন কোনো ইশারা করে তাকে জানিয়ে দিত এমন দয়া তার কাছে কতটুকু বিশাল।

সে কোনো কিছুকেই নিয়তি বলে মেনে নেয় নি।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে বলেছিল যে, দীর্ঘ সাত বছর লেগেছে তার এ কাজে সফল হতে। এ পর্যায়ে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে এসেছিল। আমারও চোখ ভিজে গিয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল, 'সাতটি দীর্ঘ বছর। এখন আপনি তাকে চিনতেও পারবেন না। সে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমাদের মাঝে এখন খুব মূল্যবান ভালোবাসার সম্পর্ক বিরাজ করছে, আর আছে দুটো ফুটফুটে সন্তান।' তার মুখ সন্ন্যাসীদের মতো আভা ছড়াচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল হাঁটু গেড়ে তাকে সম্মান জানাই। সে আমাকে থামিয়ে বলল, 'এই টুলটা দেখেছেন? এই সপ্তাহে সারপ্রাইজ হিসেবে সে আমাকে এই কাঠের টুলটা বানিয়ে দিয়েছে ধ্যান করার জন্য। সাত বছর আগে হলে সে এটা দিয়ে আমাকে পেটাত।' আমরা একসাথে হেসে উঠলাম।

আমি এই মহিলার প্রশংসা করি। সে তার নিজের সুখ নিজেই অর্জন করেছে, যা তার পরিস্থিতি বিবেচনা করলে অসামান্যই বলতে হয়। সে একটা দানবকে যত্নশীল মানুষে পরিণত করেছে। সে আরেকজন মানুষকে সাহায্য করেছে, দারুণভাবে সাহায্য করেছে। এটা ইতিবাচক ক্ষমার একটা চরম উদাহরণ। যারা সাধুসন্তের পথ ধরেছে, তাদের জন্য আমি এমনই করার সুপারিশ করি। এত কিছু বাদেও, এটি আমাদের দেখিয়ে দেয়, যখন ক্ষমার সাথে ভালো কিছু করার অনুপ্রেরণাও যুক্ত হয়, তখন কী অর্জন করা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

সুখ সৃষ্টি করা

প্রশংসা বাক্য আপনাকে সব জায়গায় নিয়ে যাবে

আমরা সবাই নিজেদের সম্বন্ধে প্রশংসাবাক্য শুনতে চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বেশির ভাগ সময় কেবল আমাদের দোষের কথাই শুনি। আমি মনে করি সেটা ন্যায্য পাওনা, কেননা বেশির ভাগ সময় আমরা অন্যের দোষ নিয়েই কথা বলি। প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করি খুব কদাচিৎ। আপনি কথা বলার সময় নিজের কথাগুলো শোনার চেষ্টা করুন।

প্রশংসা না পেলে ভালো গুণগুলো সুদৃঢ় হয় না, আর তাতে সেই গুণগুলো ক্ষয় হয়ে হয়ে একসময় মারা যায়। কিন্তু ছোট্ট একটা প্রশংসা সেখানে বিরাট এক উৎসাহের ভিত্তি গড়ে দেয়। আমরা সবাই প্রশংসিত হতে চাই; আর সেই প্রশংসাবাক্য শোনার জন্য আমাদের কী করা উচিত সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে চাই।

একবার আমি একটা ম্যাগাজিনে একটা চিকিৎসক দল সম্পর্কে পড়েছিলাম, যারা ছোট বাচ্চাদের খাওয়ার সমস্যা দূর করতে ভালো গুণাবলীগুলো সুদৃঢ় করার ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়েছিল। এই বাচ্চারা যখনই কোনো কঠিন খাদ্যবস্তু খেত, সাথে সাথে সেটা বমি করে ফেলে দিত। কোনো বাচ্চা এক মিনিট বা তারও বেশি সময় খাদ্যবস্তু পেটে রাখতে পারলে চিকিৎসকের দলটি তার জন্য একটা পার্টির আয়োজন করত। তাদের বাবা-মারা কাগজের টুপি মাথায় দিয়ে চেয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে উল্লাস করত আর হাততালি দিত, নার্সেরা নাচত আর রঙিন কাগজের ফিতে নাচিয়ে বেড়াত। কেউ একজন বাচ্চাদের প্রিয় গানটি বাজিয়ে শোনাত। খাদ্যের সবটুকু পেটের মধ্যে রাখতে পারলে সেই বাচ্চাটিকে নিয়ে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো।

এভাবে বাচ্চারা বেশি বেশি সময় ধরে খাদ্যকে তাদের পেটে ধরে রাখতে সমর্থ হলো। এমন আনন্দ ও উৎসবের কারণ হতে পেরে তাদের স্নায়ুতন্ত্র নতুন করে পুনর্বিন্যস্ত হলো, সেই শিশুরা প্রশংসাকে এতটাই চেয়েছিল। আমরাও তা- ই চাই।

যে এই কথা বলেছে, 'প্রশংসাবাক্যতে কোথাও পৌঁছানো যায় না' সে একজন... কিন্তু আমি মনে করি তাকে আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। হে বন্ধু, প্রশংসাবাক্য আপনাকে সবখানে নিয়ে যাবে!

কীভাবে একজন ভিআইপি হতে হয়

আমাদের বিহারের প্রথম বছরে আমাকে শিখতে হয়েছিল কীভাবে কোনো কিছু নির্মাণ করতে হয়। প্রথম বড় নির্মাণ কাজ ছিল ছয়টা টয়লেট ও ছয়টা বাথরুম নিয়ে গঠিত গোসলখানার অংশটি। আমাকে পাইপ বসানোর কাজের সবকিছু শিখতে হয়েছিল। আমি বিহারের একটা ডিজাইন নিয়ে একটা দোকানে

গেলাম, ডিজাইনটা কাউন্টারে বিছিয়ে বললাম, 'সাহায্য চাই!'

আমার বিল্ডিংয়ে অনেক মাল লাগবে, তাই কাউন্টারের লোকটা, যার নাম ফ্রেড, সে কিছুটা অতিরিক্ত সময় দিতে কোনো কাপর্ণ্য করল না। সামান্য কিছু সময় নিয়ে সে বুঝিয়ে দিল কোন কোন পার্টস লাগবে, কেন সেগুলো লাগবে, কীভাবে সেগুলোকে একসাথে জোড়া দিতে হয়। অবশেষে প্রচুর ধৈর্য, কান্ডজ্ঞান ও ফ্রেডের উপদেশ নিয়ে বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের পাইপ বসানোটা শেষ হলো।

স্থানীয় কাউন্সিলের স্বাস্থ্যপরিদর্শক আসল, তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করল পুরো পাইপিং সিস্টেমটা। এটি পাস হয়ে গেল। আমি তো খুশিতে ডগমগ।
কয়েক দিন পরে পাইপ ও তার সরঞ্জামগুলোর বিল এসে গেল। আমি বিহারের কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে একটি চেক চেয়ে নিয়ে একটি ধন্যবাদের চিঠি, বিশেষ করে আমাদের বিহারটি শুরু করতে ফ্রেডের সাহায্যের কথা উল্লেখ করে তাদের ঠিকানায় চেকসহ চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম।

আমি সেই সময় বুঝি নি যে, দোকানটা একটা বড় একটা পাইপের সরঞ্জাম সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, যার অনেকগুলো শাখা ছড়িয়ে আছে গোটা পার্থ শহর জুড়ে। তাদের আছে আলাদা একটা অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট। আমার চিঠিটা ওই ডিপার্টমেন্টের এক কেরানী খুলে পড়ে দেখল। সে এই প্রশংসাসূচক চিঠিটা পেয়ে এমন অবাক হলো যে তারা চিঠিটা তৎক্ষণাৎ অ্যাকাউন্টসের ম্যানেজারের কাছে নিয়ে গেল। সাধারণত অ্যাকাউন্টস সেকশন চেকের সাথে কোনো চিঠি পেলে তা হয় অভিযোগপত্র। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের প্রধানও অবাক হয়ে গেল, আর চিঠিটা নিয়ে সোজা কোম্পানির এমডির কাছে গেল। এমডি চিঠিটা পড়ে এমন খুশি হলো যে সে তাদের অনেকগুলো শাখা থেকে খুঁজে খুঁজে যে শাখায় ফ্রেড কাজ করে, সেখানকার কাউন্টারে ফ্রেডকে ফোন করে দেওয়া চিঠিটা সম্পর্কে বলল, যা তখনো এমডির সামনে মেহগনি টেবিলে পড়ে ছিল।

'ঠিক এমন জিনিসই আমরা আমাদের কোম্পানিতে খুঁজছিলাম, ফ্রেড।
ক্রেতাদের সাথে সুন্দর বোঝাপাড়া, সেটাই তো সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ!' 'জ্বি স্যার।'

'তুমি খুব চমৎকার একটা কাজ করেছ, ফ্রেড।' 'জ্বি স্যার।'

'তোমার মতো আরও অনেক কর্মচারী পেলে ভালো হতো।' 'জ্বি স্যার।'

'তোমার বেতন কত এখন? আমরা মনে হয় সেটা আরেকটু ভালো করতে পারি?'
'জ্বি স্যার।'
'ভালো কাজ করেছ, ফ্রেড!' 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

তো, আমি ঘণ্টা দুয়েক পরে আবার সেই পাইপের সরঞ্জামের দোকানে গেলাম, কী যেন একটা পার্টস বদলাতে। আমার আগেই দুজন অস্ট্রেলিয়ান মিস্ত্রি

দাঁড়িয়েছিল, এক একজনের কাঁধ টয়লেটের টাংকির মতো বিশাল চওড়া। তারা আমার আগে এসে মালের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ফ্রেড আমাকে দেখল। সে বিশাল একটা হাসি দিয়ে বলল, 'ব্রাক্ষ এখানে এসো।'

আমাকে ভিআইপি অভ্যর্থনা দেওয়া হলো, নিয়ে যাওয়া হলো দোকানের পিছনের স্টোরে, যেখানে কোনো কাস্টমারের যাওয়ার কথা নয়। সেখান থেকে আমাকে প্রয়োজনমতো যেকোনো পার্টস পছন্দ করতে দেওয়া হলো। কাউন্টারে ফ্রেডের সহকারী আমাকে এমডির ফোনের ব্যাপারটা জানাল।
আমি যে পার্টসটা খুঁজছিলাম, তা পেয়ে গেলাম। তবে যেটা ফেরত দিচ্ছিলাম, তা থেকে এটা ঢের দামী ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কত দিতে হবে আমার? আগেরটার সাথে এটার দামের পার্থক্য কেমন?'
ফ্রেড একটা একান-ওকান চওড়া হাসি দিয়ে বলল, 'ব্রাক্ষ তুমি হলে সেটা আমার জন্য কোনো পার্থক্য নয়।'
তাই প্রশংসার ভালো অর্থনৈতিক দিকও আছে।

দুই আঙুলের হাসি

প্রশংসা আমাদের টাকা বাঁচিয়ে দেয়, সম্পর্ককে সমৃদ্ধ করে এবং সুখের সৃষ্টি করে। তাই আমাদের প্রশংসার চর্চাকে আরও বেশি করে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।

আমরা যাকে প্রশংসা করতে সবচেয়ে কাপর্ণ্য করি, সে হলো নিজেকে। আমি এই বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে বড. হয়েছিলাম যে, যারা নিজেদের প্রশংসা করে, তারা আসলেই মাথামোটা লোক। ব্যাপারটা সেরকম নয়। তারা বরং মহান হৃদয়ের অধিকারী হয়ে ওঠে। আমাদের ভালো গুণগুলোকে নিজেদের কাছে প্রশংসা করলে এই গুণগুলো আরও সুদৃঢ. হয়ে ওঠে।

যখন আমি একজন ছাত্র ছিলাম, আমার প্রথম ধ্যানের শিক্ষক আমাকে বাস্তব কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, আমি সকালে উঠে সবার আগে কী করি?

'বাথরুমে যাই।' আমি বললাম।

'তোমাদের বাথরুমে কি আয়না আছে?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। 'অবশ্যই আছে।'

তিনি বললেন, 'ভালো, আমি চাই, এখন থেকে প্রত্যেক সকালে দাঁত মাজার আগেই তুমি আয়নায় নিজেকে দেখবে এবং নিজের দিকে তাকিয়ে হাসবে।'

আমি প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলাম, 'স্যার, আমি একজন ছাত্র। মাঝে মাঝে অনেক দেরিতে ঘুমাই, আর সকালে উঠে শরীরটা ভালো বোধ করি না।

কোনো কোনো সকালে আয়নায় নিজেকে দেখতেই ভয় পাই, হাসা তো দূরের কথা!'

তিনি হাসলেন আর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'যদি স্বাভাবিক হাসি হাসতে না পারো, তাহলে তোমার তর্জনী দুটো ঠোঁটের দুকোণায় রেখে উপরে ঠেলে দেবে।' বলে তিনি আমাকে সেটা করে দেখালেন।

তাকে হাস্যকর দেখাচ্ছিল। আমি হেসে উঠলাম। তিনি আমাকে সেটা চেষ্টা করতে বললেন। আমিও তা-ই করলাম।
পরের দিন সকালে আমি বিছানা থেকে নিজেকে টেনে তুললাম, আর টলতে টলতে বাথরুমে ঢুকলাম। সেখানে আয়নায় নিজেকে দেখে 'উহ! ' করে আর্তনাদ করে উঠলাম। নিজেকে এমন চেহারায় দেখা কোনো সুখকর দৃশ্য ছিল না। এমন অবস্থায় কোনো স্বাভাবিক হাসি আসে না। তাই আমি তর্জনী উঁচিয়ে দু ঠোঁটের কোণা ধরে উপরে ঠেলে দিলাম। আমি আয়নায় এই বোকা ছাত্রকে দেখলাম উদ্ভট চেহারা করে আছে। তা দেখে আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না। স্বাভাবিক হাসি আসাতে এবার দেখলাম আয়নার ছাত্রটা আমাকে দেখে হাসছে। তাই আমি আরও বেশি হাসলাম। আয়নার মানুষটা আরও বেশি হাসল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা পরস্পরকে দেখে হাসিতে ফেটে পড়লাম।

আমি দুবছর ধরে প্রত্যেক সকালে এই অভ্যাসটা করেছিলাম। প্রত্যেক সকালে ঘুম থেকে উঠে শরীর যেমন লাগে লাগুক, আমি তাড়াতাড়ি আয়নায় নিজেকে দেখে হাসতাম, সাধারণত দুটো আঙুলের সাহায্য নিয়ে। লোকজন বলে, আমি নাকি ইদানিং প্রচুর হাসি। সম্ভবত আমার মুখের চারপাশের মাংসপেশীগুলো অনেকটা সেই হাস্যকর অবস্থায় আটকে গেছে।

আমরা এই দুই আঙুলের কৌশলটা দিনের যেকোনো সময় কাজে লাগাতে পারি। এটা বিশেষ করে কার্যকরী হয় যখন আমরা অসুস্থ ত্যক্ত বিরক্ত অথবা হতাশ বোধ করি। হাসি আমাদের রক্তে অ্যানডোরফিনস্ নিঃসরণ করায় বলে প্রমাণিত হয়েছে, যা আমাদের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে এবং আমাদের সুখী হওয়ার অনুভূতি দেয়।

এটা আমাদের দেয়ালের ৯৯৮টি ভালো ইট দেখতে সাহায্য করে, কেবল ২টি খারাপ ইট নয়। আর হাসির কারণে আমাদের সুন্দর দেখায়। এজন্যই আমি পার্থে আমাদের বৌদ্ধ বিহারটাকে মাঝে মাঝে বলি, 'আজান ব্রাহমের সৌন্দর্য সেলুন'।

অমূল্য শিক্ষা

আমাকে জানানো হয়েছিল যে হতাশা একটি শত কোটি ডলারের ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটা সত্যিই হতাশার! লোকজনের হতাশাকে পুঁজি করে বড়লোক হওয়াটা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয় না আমার।

আমাদের কট্টরপন্থী ঐতিহ্য অনুযায়ী, ভিক্ষুরা টাকা নিজেদের কাছে রাখতে পারে না। আমরা আমাদের বক্তৃতার জন্য কখনোই কোনো সম্মানী দাবি করি না।

পরামর্শ বা অন্য কোনো সহায়তা দিতে গিয়েও কোনো ফি নিই না।

একবার এক আমেরিকান মহিলা আমাদের এক সতীর্থ ভিক্ষুকে ফোন করল। ভিক্ষুটি ছিল বিখ্যাত ধ্যান প্রশিক্ষক। মহিলাটি তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইল কী করে ধ্যান করতে হয়।

'আমি শুনেছি আপনি ধ্যান করা শেখান।' সে টেনে টেনে বলে উঠল ফোনে।

'জ্বি ম্যাডাম, শেখাই।' ভিক্ষুটি নম্রভাবে জবাব দিল।

'কত টাকা নেন আপনি?' সে এবার আসল কথায় আসল। 'কিছুই নিই না, ম্যাডাম।'

'তার মানে আপনি ভালো নন।' এই বলে মহিলাটি ফোন নামিয়ে রাখল। কয়েক বছর আগে আমিও এক পোলিশ-আমেরিকান ভদ্রমহিলার কাছ থেকে এমন একটা ফোন পেয়েছিলাম।

'আপনার বুড্ডিস্ট সেন্টারে কি আজকে সন্ধ্যায় কোনো দেশনার পালা আছে?' মহিলা জানতে চাইল।

'হ্যাঁ ম্যাডাম। এটি রাত ৮টায় শুরু হয়।' আমি তাকে জানিয়ে দিলাম। 'কত টাকা দিতে হবে আপনাকে?' সে জিজ্ঞেস করল।

'কিছুই দিতে হবে না, ম্যাডাম। এটি ফ্রী ' আমি তাকে ব্যাখ্যা করে দিলাম। ওপাশে খানিকক্ষণ নিরবতা।
এর পরে সে জোরে জোরে বলল, 'আপনি আমার কথা বোঝেন নি। সেই দেশনা শোনার জন্য আপনাকে আমার কত টাকা দিতে হবে?'

'ম্যাডাম, আপনাকে কোনো টাকা দিতে হবে না। এটি ফ্রী ' আমি তাকে শান্ত করার সুরে বললাম।

সে ফোনে চিৎকার করে বলল, 'শুনুন! আমি ডলারের কথা বলছি, সেন্টের কথা বলছি। ভেতরে আসার জন্য ঠিক কী পরিমাণ ডলার দিতে হবে আমাকে?'

'ম্যাডাম, আপনাকে কোনো কিছুই কেঁশে বের করতে হবে না। আপনি সোজা ভেতরে ঢুকে যাবেন। পেছনে বসবেন। যখন খুশি চলে যাবেন। কেউই আপনার নামধাম পর্যন্ত জিজ্ঞেস করবে না। কোনো লিফলেটও দেওয়া হবে না। দরজায় কোনো চাঁদাও চাওয়া হবে না। এটি সম্পূর্ণ ফ্রী এবার বেশ দীর্ঘক্ষণ বিরতি।
এরপর সে জিজ্ঞেস করল, আন্তরিকভাবেই জানতে চাইল, 'তো, তাহলে আপনারা এসব করে কী পান?'

আমি উত্তর দিলাম, 'সুখ, ম্যাডাম, সুখ!'

আজকাল যখন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, এই শিক্ষার মূল্য কত? আমি কখনোই বলি না এগুলো ফ্রী আমি বলি, এগুলো অমূল্য।

এটাও কেটে যাবে

এটি সেই অমূল্য শিক্ষাগুলোর একটি, যেটি হতাশা দূর করতে বেশ কাজের।

সেটি আবার অত্যন্ত সহজ শিক্ষাগুলোরও একটি। কিন্তু সহজ শিক্ষাগুলোই ভুল বুঝা হয় বেশি। যখন আমরা হতাশা থেকে মুক্ত, কেবল তখনই আমরা নিচের গল্পটা সত্যিকারভাবে বুঝেছি বলে দাবি করতে পারি।

নতুন এক কয়েদি খুব শংকিত ও হতাশাগ্রস্থ তার রুমের পাথরের দেয়াল শুষে নিয়েছে সব উষ্ণতাকে, কঠিন লোহার শিকগুলো যেন মৈত্রীভাবকে ব্যঙ্গ করছে। গেট বন্ধ হওয়ার সময় স্টীলের ঝনঝন শব্দ সব আশাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে বন্দী করে রেখেছে। যতই দিন গেল, ততই তার মন হতাশায় ডুবতে লাগল। দেয়ালে, তার বিছানার মাথার দিকে, সে দেখল পাথরের উপরে আকিবুকি করে লেখা : 'এটাও কেটে যাবে।'

এই কথাটা তাকে হতাশার সাগর থেকে টেনে তুলে আনল, যা নিশ্চিত সাহায্য করেছিল আগের বন্দীকেও। যতই কঠিন মনে হোক না কেন, সে এই খোদাই করা লেখাটার দিকে তাকাত আর ভাবত, 'এটাও কেটে যাবে।'

যখন সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পুনর্জীবন লাভ করল, সে কথাটা একটা কাগজে লিখে নিয়ে বিছানার পাশে, তার গাড়িতে এবং কাজের সময় পাশে রেখে দিত। খুব খারাপ সময়েও সে আর কখনোই হতাশ হয় নি। সে শুধু স্মরণ করত, 'এটাও কেটে যাবে।' আর কাজে মন দিত। সেই খারাপ সময়গুলো খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী বলে মনে হয় নি। যখন ভালো সময় এসেছে, সেগুলোকে সে উপভোগ করেছে, তবে অতটা বেখেয়ালি হয়ে নয়। সেখানেও সে স্মরণ করত, 'এটাও কেটে যাবে।' আর কাজে মন দিত। জীবনে সে কোনো কিছুকে চিরস্থায়ী বলে ধরে নেয় নি। ভালো সময়গুলো সব সময়ই অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় ধরে থাকত বলে তার মনে হতো।

এমনকি যখন তার ক্যান্সার হয়, 'এটাও কেটে যাবে' কথাটা তাকে আশা যুগিয়েছিল। আশা তাকে শক্তি ও ইতিবাচক মনোভাব যুগিয়েছিল, যা রোগটাকে হার মানিয়েছিল। একদিন বিশেষজ্ঞ নিশ্চিত করে জানাল যে, 'তার ক্যান্সারটাও কেটে গেছে।'

তার জীবনের দিনগুলোর শেষে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে তার প্রিয়জনদের ফিসফিস করে শুনিয়েছিল, 'এটাও কেটে যাবে।' আর সহজভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল। তার কথাগুলো ছিল তার পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি সর্বশেষ ভালোবাসার উপহার।

তারা জেনেছিল যে, 'শোকও একসময় কেটে যাবে।' হতাশা এমন একটি কারাগার, যা থেকে আমাদের অনেকেই কাটিয়ে উঠেছে।

‘এটাও কেটে যাবে’ কথাটা আমাদের উঠে বসতে সহায়তা করে। হতাশার অন্যতম বড় একটা কারণ হচ্ছে, সুখের সময়গুলো চিরদিন থাকবে বলে ধরে নেওয়া। কিন্তু এই কথাটা এমন ধারণাকে পরিহার করতে সাহায্য করে।

বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গ

যখন আমি একজন স্কুলশিক্ষক ছিলাম, তখন ক্লাসের একজন ছাত্রের প্রতি আমার মনোযোগ গেল। বার্ষিক পরীক্ষায় তার রোল নম্বর হয়েছিল ত্রিশ জনের মধ্যে ত্রিশতম। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তার ফলাফলের কারণে সে বেশ হতাশ। তাই আমি তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেলাম। আমি তাকে বললাম, ‘ত্রিশ জনের একটা ক্লাসে কাউকে না কাউকে রোল নম্বর ত্রিশ হতেই হয়। এই বছর ঘটনাক্রমে সেটা তুমি হয়েছ। এটাকে বলা যায় বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গ। তোমার এই আত্মোৎসর্গের ফলে তোমার বন্ধুদের ক্লাসের সবচেয়ে নিচে থাকার লজ্জা পেতে হচ্ছে না। তুমি আসলেই খুব দয়ালু, অন্যদের প্রতি তোমার দারুণ সহানুভূতি। তোমাকে একটা পদক দেওয়া দরকার।’

আমরা উভয়েই জানতাম, আমার কথাগুলো রীতিমতো উদ্ভট। কিন্তু সে হাসল। সে আর এটাকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার মতো মারাত্মক ঘটনা বলে মনে করল না। পরের বছর সে অনেক ভালো ফল করল। তার বদলে অন্য আরেকজনের বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গের পালা আসল।

এক ট্রাক গোবর

আমরা চাই না এমন অনেক খারাপ জিনিস, যেমনটা হচ্ছে ক্লাসে সবচেয়ে নিচে থাকা, এমন ঘটনা জীবনে ঘটে। প্রত্যেকের জীবনেই ঘটে। সুখী মানুষ ও হতাশ মানুষের মধ্যে এখানে পার্থক্যটা কেবল হচ্ছে তারা এমন দুর্যোগে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়।

কল্পনা করুন আপনি সাগর সৈকতে এক বন্ধুর সাথে বিকেলটা চমৎকার কাটিয়েছেন। যখন ঘরে ফিরলেন, দেখলেন বিরাট এক ট্রাকে করে এক ট্রাক গোবর ঢেলে দেওয়া হয়েছে ঠিক আপনার ঘরের দরজার সামনে। এখানে তিনটি বিষয় জানেন আপনি :

প্রথমত, আপনি কোনো গোবরের অর্ডার দেন নি। এটা আপনার দোষ নয়।

দ্বিতীয়ত, আপনি এটা নিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেছেন। কেউই দেখে নি কে এটা ওখানে ঢেলে দিয়ে গেছে। তাই কাউকে ডেকেও এটাকে সরিয়ে নিতে বলতে পারছেন না।

তৃতীয়ত, এমন নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত সেই গোবর, যার জন্য ঘরে টেকা দায় হয়ে পড়েছে।

এই রূপক গল্পে ঘরের সামনের সেই গোবরের স্তুপ হচ্ছে জীবনে আমাদের উপর ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনাগুলো। সেই গোবরের স্তুপের মতোই,

আমাদের জীবনের দুঃখজনক ঘটনাগুলোতেও তিনটি জিনিস জানা আছে :

আমরা এগুলো অর্ডার দিয়ে ডেকে আনি নি। আমরা বলি, 'আমাকে কেন এত দুঃখ পোহাতে হচ্ছে?'

আমরা ঝামেলায় পড়ে গেছি। কেউ না, এমনকি আমাদের সেরা বন্ধুরাও এই ঝামেলাকে দূর করে দিতে পারবে না (যদিও তারা তা চেষ্টা করতে পারে)।

এটা এমন জঘন্য ও আমাদের সুখকে এমনভাবে ধ্বংস করে যে, আমাদের সারা জীবনটাকে দুঃখে ভরিয়ে দেয়। এটা সহ্য করাও দায় হয়ে পড়েছে।

এমন এক ট্রাক গোবরের ব্যাপারে আমাদের দুটো পথ খোলা আছে। প্রথম পথ হচ্ছে, গোবরটা সাথে করে ঘুরে বেড়ানো। পকেটে কিছু, ব্যাগে কিছু, জামায় কিছু, এমনকি প্যান্টেও কিছু গোবর লাগিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াই। আমরা দেখি যে, যখনই আমরা গোবর সাথে নিয়ে ঘুরি, তখন আমরা অনেক বন্ধু হারাই! এমনকি সেরা বন্ধুরাও তখন আশেপাশে কম আনাগোনা করে।

গোবর বয়ে নিয়ে বেড়ানো হচ্ছে হতাশা, নাবোধক চিন্তাভাবনা ও ক্রোধে ডুবে যাওয়ার মতো। এটা হচ্ছে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমাদের স্বাভাবিক ও বোধগম্য প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আমরা অনেক বন্ধু হারাই। কারণ, এটাও স্বাভাবিক এবং বোধগম্য যে, যখন আমরা হতাশার মধ্যে থাকি, তখন আমাদের বন্ধুরা আমাদের আশেপাশে থাকতে পছন্দ করে না। তা ছাড়া, গোবরের স্তুপ তো কমেই না; বরং যতই দিন যায়, ততই এর দুর্গন্ধ আরও তীব্র হয়।

সৌভাগ্যবশত, দ্বিতীয় আরেকটা পথ আছে। যখন এমন ট্রাকভর্তি গোবর আমাদের ঘরের সামনে ফেলে রাখা হয়, তখন কী আর করা! আমরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠেলাগাড়ি, বেলচা ও কোদাল বের করে কাজে নেমে পড়ি।

বেলচা দিয়ে গোবরগুলো ঠেলাগাড়িতে তুলে নিয়ে ঘরের পেছনে যে বাগান আছে, সেখানে পুঁতে ফেলি। ক্লান্তিকর ও পরিশ্রমের একটা কাজ। কিন্তু আমরা জানি, আর কোনো বিকল্প নেই আমাদের। মাঝে মাঝে এমনও হয়, দিনে কোনোমতে অর্ধেক ঠেলাগাড়ি পরিমাণ গোবর সরাতে পারি। আমরা তখন কিন্তু হতাশা নিয়ে অভিযোগ করছি না; বরং সমস্যাটার সমাধানের ব্যাপারে কিছু একটা করছি। দিনের পর দিন আমরা গোবরের স্তুপে কোদাল চালিয়ে যাই। দিনের পর দিন গোবরের স্তুপ ছোট থেকে ছোট হতে থাকে। মাঝে মাঝে হয়তো কয়েক বছরও লেগে যায়। কিন্তু কোনো এক সকাল আসে যখন আমরা দেখি যে বাড়ির সামনের গোবরের স্তুপ আর নেই। আর বাড়ির অন্যপাশে তখন যেন জাদুর ছোঁয়া লেগেছে। আমাদের বাগানের ফুলগুলো ঝলমলে রং নিয়ে ফুটেছে সারা এলাকা জুড়ে। তাদের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়ও। যাতে প্রতিবেশীরা তো বটেই, রাস্তার পথচারীরাও আনন্দে হেসে উঠছে। বাড়ির কোণাটায় ফলের গাছটা তো ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা, এত ফল ধরেছে সেখানে। আর ফলগুলো এত মিষ্টি। এমনটি আপনি কোথাও কিনতে পাবেন না। এত বেশি ফল ধরেছে যে আমরা সেখান থেকে প্রতিবেশীদেরও দিতে পারি। এমনকি পথচারীরাও এই জাদুর ফলের অপূর্ব স্বাদ নিতে পারে!

'গোবরের স্তুপে কোদাল চালানো' হচ্ছে দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক ঘটনাগুলোকে জীবনের জন্য সার হিসেবে স্বাগত জানানোর রূপকীয় কথা। এই কাজটা

আমাদের একাই করতে হয়। আমাদের সাহায্য করার মতো কেউ নেই এখানে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ের বাগানে দিনের পর দিন এটাকে একটু একটু করে পুঁতে ফেলার ফলে দুঃখের বোঝা কমতে থাকে। এতে হয়তো কয়েক বছরও লেগে যায়। কিন্তু কোনো এক সকাল আসে যখন আমরা আমাদের জীবনে আর কোনো দুঃখ দেখি না। আর আমাদের হৃদয় যেন জাদুর ছোঁয়া পায়। তার পুরোটা জুড়ে দয়ার ফুল ফুটে থাকে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সৌরভ তখন ছড়িয়ে পড়ে রাস্তাতে, প্রতিবেশীদের কাছে। ঘরের কোণায় সেই জ্ঞানের বৃক্ষ নুয়ে পড়ে আমাদের দিকে। জীবনের স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহে মিশে থাকা মিষ্টি প্রজ্ঞার ফল দিয়ে এটি ভরা থাকে। আমরা সেই সুস্বাদু ফলগুলো মুক্ত হস্তে বিলিয়ে যাই, এমনকি পথচারীদেরও এর ভাগ দিই নির্বিচারে।
যখন আমরা এমন হৃদয়ভাঙা ব্যথাকে জানি, এর থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আমাদের বাগানকে গড়ে তুলি। তখন আমরা আরও গভীর ব্যথাকে দু হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে পারি, আর নরম সুরে বলতে পারি, 'আমি জানি।' তারা উপলব্ধি করে যে আমরা সত্যিই বুঝি। মৈত্রী জেগে ওঠে। আমরা তাদের ঠেলাগাড়ি, বেলচা ও কোদাল দেখাই, অপরিসীম উৎসাহ দেখাই। আমাদের বাগানকে যদি আমরা এখনো গড়ে না তুলি, তাহলে এমনটি ঘটতে পারবে না। আমি অনেক ভিক্ষুকে চিনি যারা ধ্যানে অত্যন্ত দক্ষ। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তারা থাকে শান্ত, সংযত এবং অটল। কিন্তু তাদের মধ্যে কেবল কয়েকজনই মহান আচার্য হয়েছে। আমি প্রায়ই অবাক হতাম, কেন এমন হয়!

এখন আমার কাছে মনে হয় যে, যেসব ভিক্ষুরা তুলনামূলকভাবে সহজ জীবন কাটিয়েছে, যাদের খোঁড়ার মতো গোবর অল্পই ছিল, তারাই সেসব ভিক্ষু যারা আচার্য হয় নি। যেসব ভিক্ষু অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, কিন্তু নিরবে খুঁড়ে গেছে, তারা সমৃদ্ধশালী এক বাগান গড়েছে, যাতে করে তারা মহান আচার্য হয়ে উঠেছে। তাদের সবারই প্রজ্ঞা, প্রশান্তি ও মৈত্রী ছিল। কিন্তু যাদের গোবর বেশি ছিল, তাদের এই জগতে ভাগাভাগি করার জিনিসও বেশি ছিল। আমার শিক্ষক আজান চাহ্ যিনি আমার কাছে সবার সেরা আচার্য - তাঁর জীবনের প্রথম দিকে নিশ্চিতই ট্রাক কোম্পানির সমস্ত ট্রাকগুলো লাইন ধরে তাঁর ঘরের দরজায় গোবর ঢেলে দিয়ে এসেছিল।

সম্ভবত এই গল্পের উপদেশ হচ্ছে, যদি আপনি এই জগতের কোনো কাজে নিজেকে লাগাতে চান, যদি মৈত্রীর পথ অনুসরণ করতে চান, তাহলে পরের বার আপনার জীবনে কোনো হৃদয়ভাঙা ঘটনা ঘটলে আপনি বলতে পারেন : 'বাহ! আমার বাগানের জন্য আরও সার!'

বেশি আশা করাটা বাড়াবাড়ি

ব্যথাবিহীন জীবন আশা করাটা বাড়াবাড়ি, ব্যথাবিহীন জীবন আশা করাটা ভুল। কারণ, ব্যথা হচ্ছে আমাদের শরীরের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। আমরা যতই ব্যথাকে অপছন্দ করি না কেন, এবং কেউই কিন্তু ব্যথাকে পছন্দ করে না, তবুও ব্যথা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর ব্যথার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত! তা না-হলে কীভাবে জানতাম, আমাদের হাতটা আগুনের কাছ থেকে সরাতে হবে? আঙুলটা সরাতে হবে ব্লেডের কাছ থেকে?

তাই ব্যথা খুব গুরুত্বপূর্ণ
আর ব্যথার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত!

তবে একধরনের ব্যথা আছে যা কোনো কাজে লাগে না। তা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা।
এটা সেই সম্ভ্রান্ত শেণীর ব্যথা, যা দেহের প্রতিরক্ষার জন্য নয়। এটা একটা আক্রমণকারী শক্তি।
এটা একটা অভ্যন্তরীণ আক্রমণকারী, ব্যক্তিগত সুখের ধ্বংসকারী, ব্যক্তিগত সামর্থ্যের উপর আক্রমণাত্মক হামলাকারী, ব্যক্তিগত সুখের মাঝে এক বিরামহীন অনুপ্রবেশকারী, আর জীবনের জন্য এক অবিরাম উৎপীড়ন!
দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা হচ্ছে মনের লাফ দেওয়ার জন্য সবচেয়ে কঠিন বাধা। মাঝে মাঝে লাফ দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।
তবুও আমাদের অবশ্যই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আরও চেষ্টা করতে হবে।
আরও চেষ্টা করতে হবে।
কারণ, তা না করলে এটি ধ্বংস করে ফেলবে আমাদের। আর এই যুদ্ধ থেকে আসবে কিছু ভালো দিক।
ব্যথাকে জয় করার সন্তুষ্টি। সুখ ও শান্তিকে লাভ, জীবনে এটার বিনিময়ে।
এটা একটা বলার মতন অর্জন,
এমন একটা অর্জন, যা খুবই বিশেষ কিছু, খুব ব্যক্তিগত, একটা সতেজ অনুভূতি, ভেতরের একটা শক্তি,
যাকে বুঝতে হলে এমন অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। তাই ব্যথাকে গ্রহণ করতে হবে সাদরে,
মাঝে মাঝে এমনকি ধ্বংসাত্মক ব্যথাকেও। কারণ, এটা হচ্ছে প্রকৃতির একটা অংশ; আর মন এটার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে,
বার বার এরূপ চর্চার মধ্য দিয়ে মন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

-জোনাথন উইলসন ফুলার

রচয়িতার সদয় অনুমতি নিয়ে এই কবিতাটি এখানে যোগ করার কারণ হলো, কবিতাটা লেখার সময় জোনাথনের বয়স ছিল মাত্র নয় বছর!

ডাস্টবিন হওয়া

আমার কাজের একটা অংশ হলো লোকজনের সমস্যাগুলো শোনা। ভিক্ষুরা সব সময়ই টাকা বাঁচানোর একটা ভালো উপায়। কারণ, তারা বিনিময়ে কোনো কিছুই দাবি করে না। প্রায়ই এমন হয়, যখন আমি জটিলতাগুলোর কথা শুনি, যেগুলো আঠালো আবর্জনার মতো, যাতে কিছু কিছু লোক আটকে যায়, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে আমিও বিষণ্ন হয়ে পড়ি। কোনো ব্যক্তিকে খাদ থেকে বের করে আনার জন্য আমাকেও মাঝেমধ্যে খাদের মধ্যে ঢুকে পড়তে হয় তাদের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরার জন্য। কিন্তু আমি সব সময় সাথে করে একটা মই নিয়ে আসি। আলোচনাটার পরে আমি আবার আগের মতো সতেজ হয়ে যাই সব সময়। আমার পরামর্শের কাজ আমার ভেতরে কোনো প্রতিধ্বনি তোলে না, কারণ আমি সেভাবেই প্রশিক্ষেত হয়েছি।
আজান চাহ যিনি থাইল্যান্ডে আমার শিক্ষক ছিলেন, তিনি বলতেন যে ভিক্ষুদের অবশ্যই ডাস্টবিন হতে হবে। ভিক্ষুরা, বিশেষ করে সিনিয়র ভিক্ষুদের বিহারে বসে বসে লোকজনের সমস্যার কথা শুনতে হয়, আর তাদের সব আবর্জনাগুলো গ্রহণ করতে হয়। বিবাহিত জীবনের সমস্যা, পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা, উঠতি বয়সের সন্তানদের নিয়ে ঝামেলা, আর্থিক সমস্যা – সব ধরনের সমস্যাই আমাদের শুনতে হয়। আমি জানি না কেন। একজন ব্রহ্ম

ভিক্ষু বিবাহিত জীবনের সমস্যার ব্যাপারে কী জানে? আমরা সংসার ত্যাগ করেছি তো এসব ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকার জন্য। কিন্তু দয়া ও মৈত্রী নিয়ে আমরা বসে থাকি, আর তাদের সমস্যার কথা শুনে যাই। আমাদের শান্তির ভাগ দিই তাদের, আর বিনিময়ে আবর্জনাগুলো গ্রহণ করি।

আজান চাহ্ একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিতেন। তিনি আমাদের একটা ডাস্টবিনের মতো হতে বলতেন যার নিচে একটা ছিদ্র আছে। আমাদের সব আবর্জনা গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু রাখা যাবে না একটাও। তাই একজন যথার্থ বন্ধু অথবা পরামর্শদাতা হচ্ছে একটা তলাবিহীন ডাস্টবিনের মতো, যে অন্যদের সমস্যার কথা শুনে শুনে কখনোই পূর্ণ হয় না।

হয়তো এটাই ন্যায়সঙ্গত

হতাশায় পড়ে আমরা প্রায়ই ভাবি : 'এটা তো ন্যায্য হচ্ছে না! আমাকে কেন?' জীবনটা যদি আরেকটু ন্যায্য হতো, তাহলে হয়তো ব্যাপারগুলো আরেকটু সহজ হতো।

জেলখানায় ধ্যানের ক্লাসে এক মধ্যবয়স্ক কয়েদি আমার সাথে ধ্যানের পরে দেখা করতে চাইল। সে কয়েক মাস ধরে ধ্যান চর্চা করছিল, আর তার সাথে বেশ ভালো পরিচয় হয়ে গিয়েছিল আমার।
সে বলল, 'ব্রাক্ষ্ম আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম, যে অপরাধের জন্য আমি এই জেলখানায় বন্দী, তা কিন্তু আমি করি নি। আমি জানি, অনেক আসামীই এই কথা বলবে, আর তারা খুব সম্ভবত মিথ্যাই বলবে। কিন্তু আমি তোমাকে সত্যি কথাটাই বলছি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলব না, ব্রক্ষ্ম অন্তত তোমাকে নয়।'

আমি তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম। তখনকার অবস্থা ও তার আচরণ আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল যে, সে সত্যি বলছে। আমি ভাবতে শুরু করলাম ব্যাপারটা কেমন অন্যায়, আর কীভাবে তার এই ভয়ানক অবিচারকে সারিয়ে তোলা যায়। কিন্তু সে আমার চিন্তাতে বাধা দিল।
মুখে এক দুষ্টামির হাসি নিয়ে সে বলল, 'কিন্তু ব্রক্ষ্ম এমন অনেক অপরাধ আমি করেছি, যেগুলোতে আমি ধরা পড়ি নি। তাই আমার মনে হয়, এটা আমার ন্যায্য পাওনা।'

আমি দ্বিগুণ জোরে হেসে উঠলাম। এই ধূর্ত বুড়ো কর্মের নিয়মটা ভালোই বুঝেছে। এমনকি আমার চেনাজানা অনেক ভিক্ষুর চেয়েও ভালো বুঝেছে।
কতবার আমরা এমন 'অপরাধ' করি, ঘৃণ্য কোনো কাজ করে বসি; অথচ তার জন্য আমাদের দুঃখ পেতে হয় না? আমরা কি তখন বলি, 'এটা তো ন্যায্য পাওনা হচ্ছে না! কেন আমি ধরা পড়লাম না?' আর যখন আমরা দুঃখকষ্ট পাই, আপাতদৃষ্টিতে কোনো কারণ ছাড়াই তখন আমরা কাতর হয়ে বলি, 'এ তো ন্যায্য নয়! আমাকে কেন?'
বোধ হয় এটাই ন্যায্য। আমার গল্পের সেই কয়েদির মতো, জীবনে আমরা সম্ভবত আরও অনেক অপরাধ করেছি, যেগুলোতে ধরা পড়ি নি। এ কারণেই জীবনটা মনে হয় অবশেষে এই ন্যায্য পাওনাটা দিচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কঠিন সমস্যা ও মৈত্রীময় সমাধান

কর্ম নিয়ম

বেশির ভাগ পশ্চিমা লোক কর্ম নিয়মটাকে ভুলভাবে বোঝে। তারা এটাকে অদৃষ্টবাদের সাথে ভুল করে, যারা মনে করে কোনো ব্যক্তি তার ভুলে যাওয়া অতীত জন্মের কোনো অজানা অপরাধের জন্য নিশ্চিত শাস্তি পাবে। ব্যাপারটা যে সেরকম নয়, তা আমরা নিচের গল্প থেকে বুঝতে পারি।

দুজন মহিলা প্রত্যেকেই একটা করে কেক বানাচ্ছিল।
প্রথম মহিলার মালমশলা ছিল খুব খারাপ মানের। তার সাদা পুরনো ময়দা থেকে সবুজ ছত্রাকের টুকরোগুলো বেছে নিয়ে ফেলে দিতে হলো। কোলেস্টেরলে ভরা মাখন পঁচে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। সাদা চিনির দানাগুলো থেকে বাদামী দলাগুলো ফেলে দিতে হলো (কারণ, কেউ ওখানে কফির চামচ ডুবিয়েছিল)। আর তার ফলমূল বলতে ছিল পুরনো হয়ে যাওয়া কিসমিস, সেগুলো এমন শক্ত হয়ে গিয়েছিল যেন ক্ষয় হয়ে যাওয়া ইউরেনিয়ামের অবশিষ্ট অংশ। আর তার রান্নাঘরের সরঞ্জামগুলোও ছিল বিশ্বযুদ্ধের আগের আমলের স্টাইলের; তবে সেটা কোন বিশ্বযুদ্ধ, তা অবশ্য তর্কের বিষয়।

দ্বিতীয় মহিলাটির সব মালমশলা ছিল সবচেয়ে ভালোটা। তার ছিল প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো সম্পূর্ণ খাঁটি এবং গ্যারান্টিযুক্ত গমের ময়দা। মাখন হিসেবে ছিল কোলেস্টেরলমুক্ত মাজারিন। সাথে ছিল কাঁচা চিনি, আর নিজস্ব বাগানে জন্মানো রসালো ফল। তার রান্নাঘরটাও ছিল অত্যাধুনিক সব সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো।

কোন মহিলা সবচেয়ে ভালো কেক বানিয়েছিল? যার মালমশলা ভালো, সে প্রায়ই ভালো কেক প্রস্তুতকারী হয় না। কেক বানানোতে মালমশলার চেয়েও বেশি কিছু লাগে। মাঝে মাঝে এমন হয়, খারাপ মালমশলা হলেও কেক প্রস্তুতকারী সেগুলোর সাথে এত শ্রম, যত্ন ও ভালোবাসা ঢেলে দেয় যে, তার কেকগুলোই সবচেয়ে সুস্বাদু হয়। মালমশলা দিয়ে আমরা কী করি, সেটাই এর কারণ।

আমার কয়েকজন বন্ধু আছে যাদের জীবনের মালমশলাগুলো ছিল খুব শোচনীয়। তারা দারিদ্রের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল, শিশু হিসেবে নির্যাতিত হয়েছিল, স্কুলে তেমন চালাক চতুর ছিল না, হয়তো বিকলাঙ্গ এবং খেলাধুলাও করতে পারত না। কিন্তু কয়েকটা গুণ - যা তাদের মধ্যে ছিল - তারা সেগুলোকে এমনভাবে কাজে লাগিয়েছে যে, তারা সত্যিই তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো একটা কেক বানিয়েছে। আমি তাদের খুব প্রশংসা করি। আপনি কি এমন লোকদের চেনেন?

আমার অন্যান্য বন্ধুরাও আছে যাদের জীবনের জন্য চমৎকার মালমশলা ছিল। তাদের জন্ম হয়েছিল সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারে, স্কুলে তারা ছিল খুব বুদ্ধিমান,

খেলাধুলায় তুখোড়, চেহারাও সুন্দর, সবার কাছে জনপ্রিয়; কিন্তু তাদের তরুণ জীবন তারা নষ্ট করেছে নেশা বা মদে। আপনি কি এমন কাউকে চেনেন?

কর্মের অর্ধেকটা হচ্ছে সেই মালমশলাগুলো, যেগুলো দিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। আর বাকি অর্ধেকটা, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে আমরা কী করি এই জীবনে।

বেরোবার কোনো পথ না থাকলে চা খান

আমাদের দিনের মালমশলাগুলো নিয়ে আমরা সব সময়ই কিছু না কিছু করতে পারি, তা যদি হয় শুধু বসে থাকা, আর শেষ চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া, তাও আমরা করতে পারি। নিচের গল্পটা আমার স্কুল টিচার থাকাকালীন আমাকে বলেছিল এক সহকর্মী শিক্ষক, যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ আর্মিতে কাজ করেছিল।

সে তখন বার্মার জঙ্গলে তার দলের সাথে ঘুরে ঘুরে শত্রুর গতিবিধি অনুসন্ধান করছিল। তখন সে ছিল বয়সে তরুণ, বাড়ি থেকে অনেক দূরে, আর খুব ভীত। তার দলের স্কাউট তাদের ক্যাপ্টেনকে একটা সাংঘাতিক খবর দিল। তাদের ছোট্ট অনুসন্ধানী সেনাদল বিশাল সংখ্যক জাপানি সেনার মুখে পড়েছে। জাপানি সৈন্যদের সংখ্যার তুলনায় তাদের ছোট্ট দলটা কিছুই নয়, তদুপরি আবার চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়েছে। তরুণ ব্রিটিশ সৈন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করল।

সে আশা করেছিল, তাদের ক্যাপ্টেন তার লোকদের লড়াই করে এই ঘেরাও অবস্থা থেকে বেরোবার একটা পথ বানাতে বলবে, সেটাই বীরত্বের কাজ। তাতে অন্তত কেউ কেউ বেরিয়ে যেতে পারবে। যদি না হয়, তো ঠিক আছে। মরার সময় কয়েকজন শত্রুসেনাকে নিয়ে মরবে। সেটাই তো সৈন্যরা করে।
কিন্তু ক্যাপ্টেন এমন সৈন্য ছিল না। সে তার লোকদের চুপ করে বসে থাকতে বলল, আর এক কাপ করে চা বানাতে বলল। এত কিছু সত্তেও - তারা ব্রিটিশ সৈন্য কিনা!

তরুণ সৈন্যটি ভাবল, তার কমান্ডিং অফিসারের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শত্রু চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, পালাবার কোনো পথ নেই, মরতে বসেছে, এমন অবস্থায় কীভাবে কোনো লোক এক কাপ চায়ের কথা ভাবতে পারে? আর্মিতে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়, অর্ডার মানতে হয়। তারা সবাই তাদের শেষ চা বানাল এক কাপ করে। চা খেয়ে শেষ করার আগেই স্কাউট আবার ফিরে এলো, আর ক্যাপ্টেনের কানে কানে ফিস ফিস করল। ক্যাপ্টেন তার লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, ‘শত্রুরা সরে গেছে। বেরোনোর একটা পথ পাওয়া গেছে। তোমাদের জিনিসপত্র গুছাও তাড়াতাড়ি এবং নিঃশব্দে। এবার চলো, যাওয়া যাক!’ তারা সবাই নিরাপদে বেরিয়ে এলো। এ কারণেই সে বহু বছর পরে এই গল্পটা আমাকে বলতে পেরেছিল। সে বলেছিল যে তার জীবন তার ক্যাপ্টেনের প্রজ্ঞার কাছে ঋণী, কেবল সেই বার্মার যুদ্ধে নয়, তখন থেকে আরও অনেকবার। তার জীবনে অনেক বার এমন হয়েছে যেন সে চারদিক থেকে শত্রু দ্বারা বেষ্টিত, তাদের সংখ্যা অনেক, বেরোবার কোনো পথ নেই, মরণ সন্নিকটে। শত্রু বলতে সে বুঝিয়েছিল মারাত্মক কোনো অসুস্থতা, ঘোর বিপদ এবং নিদারুণ

শোক, আপাতদৃষ্টিতে যার মাঝখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ নেই। বার্মার অভিজ্ঞতা না হলে, সে এসব সমস্যার সাথে লড়াই করে বেরোবার চেষ্টা করত। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই, সমস্যাটা তখন আরও জটিল হয়ে উঠত। তার বদলে মৃত্যু বা মারাত্মক ঝামেলা এসে যখন তাকে ঘিরে ধরেছে, সে তখন বসে বসে এক কাপ চা বানিয়েছে।

এই পৃথিবী সব সময় বদলে যাচ্ছে। জীবন নিয়ত প্রবহমান। সে তার চা খেয়েছে, তার শক্তিগুলোকে সুসংহত করেছে, আর সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করেছে, যা সব সময়ই এসেছে। তখন সে কার্যকর কিছু একটা করেছে, যেমন, পালিয়েছে।

যারা চা পান করেন না, তারা এই প্রবাদটা মনে রাখুন : 'যখন করার কিছু নেই, তখন কিছুই করো না।'
এটা হয়তো খুব সরল মনে হতে পারে। কিন্তু এটা হয়তো আপনার জীবনকে বাঁচাতে পারে।

স্রোতের সাথে চলা

একজন জ্ঞানী ভিক্ষুকে আমি অনেক বছর ধরে চিনি। সে একবার তার এক পুরনো দোস্তকে নিয়ে কোনো বৈচিত্র্যময় জঙ্গলে ঘুরতে বেরিয়েছিল। পড়ন্ত বিকেলে তারা একটা নির্জন সাগরতীরে পৌঁছল। যদিও ভিক্ষুদের নিয়ম আছে, মজা বা উপভোগের জন্য সাঁতার কাটা যাবে না। কিন্তু নীল সাগর যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। জঙ্গলে এতক্ষণ ধরে হাঁটাহাঁটি করে এখন তার দরকার ছিল শরীরটাকে জুড়ানো। তাই সে কাপড়চোপড় খুলে সাঁতার কাটতে নেমে গেল। ভিক্ষু হওয়ার আগে, তরুণ বয়সে, সে ছিল একজন দক্ষ সাঁতারু। অনেক বছর হলো সে ভিক্ষু হয়েছে, সর্বশেষ সাঁতার কেটেছে সেই কোন আমলে। ঢেউয়ের মাঝে দুএক মিনিট সাঁতার কাটার পরে সে একটা চোরা স্রোতের কবলে পড়ল। সেই স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল সাগরের দিকে।

সে পরে আমাকে বলেছিল যে, এটা ছিল খুব বিপদজনক একটা সৈকত, কেননা এর স্রোতগুলো ছিল সাংঘাতিক।
প্রথমে ভিক্ষুটি স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার চেষ্টা করল। কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝতে পারল, স্রোতের শক্তির সাথে পেরে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব। ভিক্ষুর ট্রেনিং এখন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। সে রিল্যাক্সড হলো, আর স্রোতের সাথে ভেসে গেল। এমন পরিস্থিতিতে রিল্যাক্সড হয়ে সাগরে ভেসে যাওয়াটা ছিল রীতিমতো দুঃসাহসিক ব্যাপার, বিশেষ করে যখন সে দেখছিল যে সাগরের তীর দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বহু শত মিটার ভাসিয়ে নিয়ে তবেই জোয়ারের স্রোত মিলিয়ে গেল। কেবল তখনই সে জোয়ারের স্রোত থেকে দূরে সরে গিয়ে তীরের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল।

সে আমাকে বলেছিল যে, সাঁতার কেটে তীরে ফিরে আসতে তাকে শক্তির প্রতিটি বিন্দু খরচ করতে হয়েছিল। সে তীরে এসে পৌঁছাল পুরো বিধ্বস্ত হয়ে। সে নিশ্চিত ছিল যে, স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করলে নির্ঘাত পরাজিত হতো সে।

সে সাগরে গিয়ে পড়তই; কিন্তু লড়াই করে শক্তিহীন হওয়াতে আর তীরে ফিরে আসা সম্ভব হতো না তার। যদি সে যেতে না দিয়ে, স্রোতের সাথে ভেসে না যেত, তাহলে নিশ্চিতভাবেই ডুবে মরত।

এমন ঘটনা সেই প্রবাদটিকে মনে করিয়ে দেয়, ‘যেখানে কিছু করার থাকে না, সেখানে কিছুই করো না।’ এটা কোনো কাল্পনিক তত্ত্ব নয়, বরং বিপদের সময় জীবন বাঁচানোর মতো প্রজ্ঞার জন্ম দেয়। যখন স্রোত আপনার চেয়ে শক্তিশালী হয়, তখনই স্রোতের সাথে চলার সময়। যখন আপনি কাজ করতে সক্ষম, তখনই আপনার প্রচেষ্টা চালানোর সময়।

বাঘ ও সাপের মাঝে আটকে পড়া

একটা প্রাচীন বৌদ্ধ কাহিনী আছে যা জীবন-মরণের সংকট থেকে আমরা কীভাবে উদ্ধার পেতে পারি, তার শিক্ষা দেয়।
কোনো এক জঙ্গলে এক ব্যক্তিকে একটি বাঘ তাড়া করছিল। বাঘ মানুষের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে, আর তারা মানুষ খায়। বাঘটি যেহেতু ক্ষুধার্ত ছিল, তাই লোকটি বেশ বিপদে পড়ে গেল। বাঘটি তাকে প্রায় ধরে ফেলেছে, এ সময় সে দেখল পথের পাশে একটা কুয়ো। সাত-পাঁচ না ভেবে সে দিল কুয়াতে লাফ। কিন্তু লাফ দেয়ার আগ মুহূর্তে দেখল কত বড় ভুল করল সে। কুয়োটি ছিল শুকনো, আর তার তলায় কুন্ডলী পাকিয়ে ছিল বিশাল এক কালো সাপ।
নিজের অজান্তেই সে হাত দিয়ে কুয়োর দেয়াল ধরে পতন রোধের চেষ্টা করল। এ সময় তার হাতে ঠেকল একটা গাছের শেকড়। শেকড়টা ধরে সে কোনোমতে কুয়োর তলায় পড়ে যাওয়াটা রোধ করল। একটু পরে ধাতস্থ হয়ে নিচে তাকিয়ে দেখল, সাপটি তার ফণা তুলে তার পায়ে ছোবল দেয়ার চেষ্টা করছে; কিন্তু একটুর জন্য নাগাল পাচ্ছে না।
উপরে তাকিয়ে দেখল বাঘটি কুয়োর ভেতরে ঝুঁকে থাবা চালিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করছে; কিন্তু একটুর জন্য নাগাল পাচ্ছে না। এই চরম বিপদের মুহূর্তে সে দেখল একটা গর্ত থেকে একটা কালো ও একটা সাদা রঙের ইঁদুর বের হয়ে সে যে শেকড়টা ধরে আছে, সেটাকে কামড়ানো শুরু করেছে।

বাঘটি যখন কুয়োর ভেতর থাবা চালিয়ে লোকটিকে ধরার চেষ্টা করছিল, তখন তার শরীরটা ঘষা খাচ্ছিল কুয়োর পাড়ের একটা ছোট গাছের সাথে। ফলে গাছটি ঝাঁকুনি খাচ্ছিল একটু একটু। সেই গাছের একটা ডাল কুয়োর উপরে ঝুলে ছিল, যাতে ছিল একটা মৌচাক। ঝাঁকুনির ফলে বিন্দু বিন্দু মধু পড়ছিল কুয়োর মধ্যে। লোকটি জিহবা বের করে কয়েক ফোঁটা চেতে দেখল।

‘উম্ম! দারুণ স্বাদ তো!’ সে মনে মনে ভাবল এবং হাসল।

এই গল্পের এখানেই শেষ। এজন্যই এটা আমাদের জীবনেও সত্যি। আমাদের জীবনেরও কোনো সুস্পষ্ট পরিসমাপ্তি নেই। বরং এই সমাপ্তির প্রক্রিয়াটি অনন্তকাল ধরে প্রবহমান।

অধিকন্তু আমাদের জীবনটা যেন ক্ষুধার্ত বাঘ ও বিশাল কালো সাপের মাঝে আটকা পড়ে আছে। মৃত্যু এবং তার চেয়েও খারাপ কিছুর মধ্যে। যেখানে রাত ও দিন (ইঁদুর দুটি) আমাদের জীবনের আয়ুকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলছে প্রতিনিয়ত। এমন চরম সংকটেও সব সময় কিছু মধু ঝরে পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায়।

আমরা জ্ঞানী হলে আমাদের জিহবা বের করে সেই মধুর স্বাদ কিছুটা নিতে পারি। কেন নয়? করার যখন কিছু নেই, তখন কিছুই করবেন না। বরং জীবনের মধুর স্বাদ কিছুটা উপভোগ করুন।

গল্পটা বৌদ্ধ ঐতিহ্যমতে এখানেই শেষ। তবে আরও অর্থবহ করে তোলার জন্য আমি সাধারণত এর একটা সত্যিকারের পরিসমাপ্তি টেনে দিই। পরে যা ঘটে তা এ রকম : লোকটা যখন মধুর স্বাদ আস্বাদনে ব্যস্ত ইঁদুরগুলো দাঁত দিয়ে কেটে কেটে শেকড়টাকে আরও পাতলা করছে, সাপটি ফণা উচিয়ে লোকটির পায়ের আরও কাছাকাছি চলে আসছে, বাঘটি আরও ঝুঁকে পড়ছে, আরেকটু হলেই লোকটির নাগাল পেয়ে যাবে। কিন্তু বাঘটা একটু বেশিই ঝুঁকল, ফলে এটি কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। লোকটাকে নাগালে না পেয়ে সে সোজা সাপটির উপর পড়ে গিয়ে নিজেও মরল, সাপটিকেও মেরে ফেলল।

জ্বি হ্যাঁ, এমনটা ঘটতেই পারে! সাধারণত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাই ঘটে থাকে জীবনে। আমাদের জীবনটা এমনই। তাই মধুর ক্ষণগুলোকে কেন নষ্ট করা, এমনকি দিশেহারা কোনো বিপদের সময়েও? ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আমরা কখনোই নিশ্চিত নই, এর পরে কী আসছে!

জীবনের জন্য উপদেশ

উপরের গল্পে বাঘ ও সাপ যখন উভয়েই মরে গেল, এখন লোকটার কিছু একটা করার সময়। সে মধু উপভোগ করা থামিয়ে, চেষ্টা চালিয়ে কুয়োর উপরে উঠে এলো, আর নিরাপদে জঞ্জাল থেকে বেরিয়ে এলো। জীবনটা যে সব সময় শুধু কিছু না করে মধু উপভোগ করার, তাও নয়।

সিডনির একজন তরুণ আমাকে বলেছিল যে, সে একবার থাইল্যান্ডে গিয়ে আমার গুরু আজান চাহ-র সাথে দেখা করেছিল, আর জীবনের সেরা উপদেশটি লাভ করেছিল তার কাছ থেকে। বৌদ্ধধর্মে আগ্রহী অনেক পশ্চিমা তরুণ ১৯৮০ সালের দিকে আজান চাহ-র নাম শুনেছিল। এই তরুণটি থাইল্যান্ডে একটা লম্বা ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিল। উদ্দেশ্য একটাই, সেই মহান ভিক্ষুর সাথে দেখা করবে, এবং তাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে।

এটা ছিল দীর্ঘ সফর। সিডনি থেকে ব্যাংককে পৌঁছাতে তার আট ঘণ্টা লাগল। সেখান থেকে রাতের ট্রেনে আরও দশ ঘণ্টা লাগল উবন শহরে পৌঁছাতে। সেখানে পৌঁছে সে আজান চাহ-র বিহার ওয়াট পাহ্ পং-এ যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল। ক্লান্ত কিন্তু উজ্জীবিত, সে অবশেষে আজান চাহ-র কুটিরে পৌঁছল।

গুরু হিসেবে আজান চাহ্ ছিলেন বিখ্যাত। তিনি বরাবরের মতোই তার কুটিরে বসে ছিলেন। তার চারপাশে ঘিরে ছিল অনেক ভিক্ষু ও জেনারেল, গরিব কৃষক ও ধনী ব্যবসায়ী, গ্রামের ছেঁড়া কাপড় পরা মেয়ে ও ব্যাংককের সুন্দর পোশাকের মহিলা, সবাই পাশাপাশি বসা। আজান চাহ-র কুটিরে কোনো ভেদাভেদ নেই।

অস্ট্রেলিয়ান যুবকটা সেই বিরাট জনতার একধারে বসে পড়ল। দু ঘণ্টা কেটে গেল। আজান চাহ্ তাকে খেয়ালও করেন নি। তার সামনে আরও অনেক

লোক। হতাশ হয়ে সে উঠে চলে গেল সেখান থেকে।

বিহারের প্রধান গেটে যাওয়ার সময় সে দেখল ঘণ্টা বাজানোর মন্দিরে কিছু ভিক্ষু উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছে। গেটে তাকে নিতে আসবে যে ট্যাক্সিটা, সেটা আসতে আরও ঘণ্টাখানেক বাকি। তাই সেও হাতে একটা ঝাড়ু তুলে নিল এই ভেবে যে, অন্তত কিছু পুণ্যকর্ম করে যাই।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে, সে যখন ঝাড়ু দিতে ব্যস্ত অনুভব করল যে কেউ একজন তার কাঁধে হাত রাখল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে অবাক ও যারপরনাই খুশি হয়ে দেখল যে হাতের মালিক আজান চাহ্ তার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আজান চাহ্ এই পশ্চিমা তরুণটিকে দেখেছিলেন আগেই, কিন্তু তাকে সেটা বলার কোনো সুযোগ তখন ছিল না। এখন তিনি আরেকটা কাজে বিহারের বাইরে চলে যাচ্ছেন। তাই তিনি এত কষ্ট করে সিডনি থেকে আসা এই তরুণের সামনে একটু দাঁড়ালেন তাকে একটা উপহার দেওয়ার জন্য। তিনি থাই ভাষায় দ্রুত কিছু একটা বলে তার কাজে চলে গেলেন।

এক অনুবাদক ভিক্ষু তাকে বলে দিল, 'আজান চাহ্ বলেছেন যে, যদি তুমি ঝাড়ু দাও, তো তোমার যা কিছু আছে, তার সবকিছু নিয়েই ঝাড়ু দাও।' এরপর সেই অনুবাদক ভিক্ষুও গিয়ে আজান চাহ-র সাথে যোগ দিল।

তরুণটি অস্ট্রেলিয়া ফেরার দীর্ঘ যাত্রায় সেই ছোট্ট শিক্ষাটা নিয়ে ভাবল। সে নিশ্চিত বুঝতে পারল যে, আজান চাহ্ তাকে শুধু কীভাবে ঝাড়ু দিতে হয় তা শেখান নি; বরং এর থেকে ঢের বেশি শেখাতে চেয়েছেন। এর অর্থটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

'তুমি যা-ই করো না কেন, তোমার সবকিছু নিয়েই সেটি করো।'

সে অস্ট্রেলিয়া ফেরার কয়েক বছর পরে আমাকে বলেছিল যে, এই 'জীবনের জন্য উপদেশ' ছিল এমন শতবার দীর্ঘ সফরের মূল্যের সমান। এটাই এখন সে মেনে চলে, এবং এটা তাকে সুখ ও সফলতা এনে দিয়েছে। যখন সে কাজ করত, সে তার সবকিছু ঢেলে দিত তার কাজে। সে যখন বিশ্রাম নিত, তার সবকিছু নিয়েই সে বিশ্রাম নিত। যখন সে সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকত, সে তার সবকিছু সমাজের কাজে ঢেলে দিত। এটা ছিল সফলতার মন্ত্র।আর আরেকটা কথা, যখন সে কিছুই করত না, সে তার যা কিছু আছে, কোনো কিছুই সেখানে দিত না।

কোন সমস্যা?

ফরাসি দার্শনিক গণিতজ্ঞ ব্লেইস প্যাসকেল (১৬২৩-৬২) একবার বলেছিলেন :
'মানুষের যত ঝামেলা আসে কীভাবে শান্ত হয়ে বসে থাকতে হয় তা না জানা থেকে।'

আমি এর সাথে আরও যোগ করব : '... আর কখন শান্ত হয়ে বসে থাকতে হয় তা না জানা থেকে।'

১৯৬৭ সালে ইসরায়েল তখন মিসর, সিরিয়া ও জর্ডানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত।

সেই যুদ্ধ, যা পরবর্তীকালে 'ছয় দিনের যুদ্ধ' নামে পরিচিতি লাভ করে, তার মাঝামাঝি সময়ে এক সাংবাদিক প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলানকে জিজ্ঞেস করেছিল যে মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যাটা সম্পর্কে তিনি কী ভাবেন।

কোনো ইতস্তত ছাড়াই, এই বয়োবৃদ্ধ রাজনীতিক উত্তর দিলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে কোনো সমস্যা নেই।' সাংবাদিক তো হতভম্ভ 'মধ্যপ্রাচ্যে কোনো সমস্যা নেই মানে কী বলতে চান আপনি?' সে জানতে চাইল। 'আপনি কী জানেন না সেখানে এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছে? আপনি কী বুঝতে পারছেন না, এই যে আমরা কথা বলছি, ঠিক এ সময়ে সেখানে আকাশ থেকে বোমা পড়ছে, ট্যাঙ্কগুলো বোমা মেরে একটা আরেকটাকে উড়িয়ে দিচ্ছে, সৈন্যরা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে? ইতিমধ্যে অনেক লোক হতাহত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে কোনো সমস্যা নেই বলতে আপনি কী বুঝাতে চান?'

অভিজ্ঞ রাজনীতিক ধৈর্যসহকারে ব্যাখ্যা করলেন, 'স্যার, সমস্যা হচ্ছে এমন একটা কিছু, যার সমাধান আছে। মধ্যপ্রাচ্যের কোনো সমাধান নেই। অতএব এটা কোনো সমস্যাই হতে পারে না।'

আমাদের জীবনে আমরা কত সময় নষ্ট করি সেসব জিনিসের কথা ভেবে ভেবে, যেগুলোর আসলে সেই মুহূর্তে কোনো সমাধান নেই, তাই সেগুলো কোনো সমস্যাই নয়?

সিদ্ধান্ত নেওয়া

সমাধান আছে এমন সমস্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো আমরা কীভাবে নিই? সাধারণত আমরা আমাদের কঠিন সিদ্ধান্তগুলো অন্য কাউকে দিয়ে নেওয়ানোর চেষ্টা করি। যদি কোনো ঝামেলা হয়, তখন দোষারোপ করার জন্য একজনকে পাই। আমার বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে এমন ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে, যাতে তাদের সিদ্ধান্তগুলো আমিই নিয়ে দিই; কিন্তু আমি দেব না। আমি যা করি তা হলো, কীভাবে তারা বিজ্ঞতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারে তা দেখিয়ে দেব।

যখন আমরা কোনো চৌরাস্তার মোড়ে এসে দ্বিধায় ভুগি কোন দিকে যাব, তখন আমাদের গাড়িটা একপাশে থামানো উচিত, আর একটু বিশ্রাম নিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। শীঘ্রই, সাধারণত আমরা যখন এর আশা করি না তখন, একটা বাস আসে। বাসের সামনে বড় বড় করে লেখা থাকে এটি কোথায় যাচ্ছে। যদি সেই গন্তব্য আপনার উপযোগী হয়, তবে উঠে পড়ুন সেই বাসে, না-হলে অপেক্ষা করুন। পিছনে সব সময় আরও বাস থাকে।

অন্য কথায়, যখন আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয়, আর আমরা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দোটানায় পড়ে যাই, তখন আমাদের দরকার একপাশে গিয়ে একটু অপেক্ষা করা। শীঘ্রই, যখন আপনি এর আশা করছেন না তখন একটা সমাধান আসবে। প্রত্যেক সমাধানের একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য থাকে। যদি সেই গন্তব্য

আমাদের উপযোগী হয়, তাহলে আমরা সেটা নিই, না-হলে আরও অপেক্ষা করি। এর পেছনে সব সময়ই আরেকটা সমাধান থাকে।

এভাবেই আমি সিদ্ধান্ত নিই। আমি সব তথ্য-উপাত্ত জড়ো করি, আর সমাধানের অপেক্ষায় থাকি। ভালো কোনো সিদ্ধান্ত সব সময়ই আসবে, যদি আমি ধৈর্যশীল হই। এটা সাধারণত অপ্রত্যাশিতভাবে আসে, যখন আমি এটা নিয়ে ভাবছি না তখন।

অন্যদের দোষারোপ করা

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার সময় আপনি আগের গল্পে উক্ত নিয়মটা প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। কিন্তু এমন নয় যে এই পদ্ধতিটাই আপনাকে অনুসরণ করতে হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো আপনারই হাতে। তাই এটা যদি কাজে না দেয়, আমাকে দোষ দেবেন না যেন।

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আমাদের এক ভিক্ষুর সাথে দেখা করতে এলো। সেই ছাত্রীটির এর পরের দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষা ছিল। আর তাই সে চাচ্ছিল যেন ভিক্ষুটি তার জন্য মঙ্গলসূত্র পাঠ করে দেয়, যাতে তার সৌভাগ্য আসে। ভিক্ষুটি সদয় সম্মতি দিল এই ভেবে যে এতে হয়তো ছাত্রীটি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। এটি ছিল বিনামূল্যে। ছাত্রীটি কোনো কিছু দান করে নি।

আমরা আর সেই তরুণীটিকে দেখি নি। কিন্তু তার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে শুনলাম, সে নাকি বলে বেড়াচ্ছে যে আমাদের বিহারের ভিক্ষুরা কোনো কাজের নয়। তারা মঙ্গলসূত্রও ভালোমতো পাঠ করতে জানে না। সে তার পরীক্ষায় ফেল করেছিল। তার বন্ধুবান্ধবরা আমাদের বলেছে যে সে ফেল করেছে। কারণ, সে বলতে গেলে কোনো পড়াশোনাই করে নি। সে ছিল একজন পার্টি গার্ল অর্থাৎ খাও দাও ফূর্তি করো টাইপের মেয়ে। সে আশা করেছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তার জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পড়াশোনা, আর সেটা ভিক্ষুরা দেখবে।

জীবনে কোনো কিছু ভুল হয়ে গেলে অন্যকে দোষারোপ করে হয়তো সাময়িক স্বস্তি মেলে; কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় কদাচিৎ।
এক ব্যক্তির চুলকানি ছিল পাছায়, সে চুলকাল মাথা। তাই তার চুলকানি কখনোই গেল না। অন্যকে দোষারোপ করার ব্যাপারটাকে আজান চাহ্ এভাবেই বলেছেন। এটা যেন চুলকানি আপনার পাছায়, আপনি চুলকাচ্ছেন মাথায়।

সম্রাটের তিনটা প্রশ্ন

আমি পার্থের একটি শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা সভায় মূল বক্তা হিসেবে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। আমি একটু অবাক হলাম। পরে যখন সভাস্থলে পৌঁছলাম, এক মহিলা, যার নাম লেখা ব্যাজ দেখে বুঝা গেল, সে-ই এই সেমিনারের উদ্যোক্তা, সে আমাকে দেখে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলো। 'আমাকে মনে আছে আপনার?' সে জিজ্ঞেস করল।

উত্তর দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত রকম বিপদজনক প্রশ্নগুলোর মধ্যে এটি একটি। আমি সোজাসাপটা উত্তর দিতে মনস্থির করে বললাম, 'না।'

সে হেসে আমাকে বলল যে, সাত বছর আগে আমি একটা স্কুলে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সে ছিল সেই স্কুলের অধ্যক্ষ। তার স্কুলে আমি একটা গল্প বলেছিলাম যা তার জীবনের গতিপথকে বদলে দিয়েছিল। সে অধ্যক্ষের পদ থেকে ইস্তফা দিল। এর পরে সে নিরন্তর পরিশ্রম করে গেল ঝরে পড়া শিশুদের জন্য একটা কর্মসূচি তৈরি করার কাজে। সেই বাচ্চারা, যারা প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ঝরে পড়েছে, রাস্তার টোকাইদের দল, অপ্রাপ্তবয়স্ক যৌনকর্মী, নেশাখোর; তাদের জীবনের আরেকটা সুযোগ দেওয়ার জন্য, তাদের উপযোগী করে একটা কর্মসূচি হাতে নিল সে। সে আমাকে বলল যে, তার এই কর্মসূচির মূল দর্শনই হচ্ছে আমার বলা গল্পটা। গল্পটা ছিল লিও টলস্টয়ের ছোট গল্পের একটা বই থেকে ধার করা। আমি সেটা ছাত্র থাকার সময়ে পড়েছিলাম।

অনেক আগে, এক সম্রাট জীবনের একটা দর্শন খুঁজতে লাগলেন। রাজ্যশাসন আর নিজেকে শাসন, এই উভয় কাজেই তার দরকার ছিল প্রজ্ঞাময় দিকনির্দেশনা। সমসাময়িক ধর্ম ও দর্শন তাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। তাই তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তার দর্শন হাতড়ে বেড়ালেন। অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তার কেবল তিনটা মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দরকার। এগুলোর উত্তর পেলে তিনি তার প্রজ্ঞাময় দিকনির্দেশনা পেয়ে যাবেন। সেই তিনটি প্রশ্ন ছিল এ রকম :

১. কখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়?
২. কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি?
৩. কোন জিনিসটা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

মূল গল্পের প্রায় সবটুকু জুড়ে ছিল এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের দীর্ঘ কাহিনী। অবশেষে তিনি এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে সেই তিনটি উত্তর পেয়ে গেলেন। উত্তরগুলো কী ছিল বলে আপনার মনে হয়? দয়া করে প্রশ্নগুলো আরেকবার দেখুন। আবার পড়া শুরু করার আগে একটু বিরতি নিয়ে ভাবুন। প্রথমপ্রশ্নের উত্তর আমরা সবাই জানি; কিন্তু বেশির ভাগ সময় ভুলে যাই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টি অবশ্যই 'এখন'। একমাত্র এই সময়টাই আমাদের কাছে আছে। তাই আপনি যদি আপনার বাবা-মাকে বলতে চান, আপনি তাদের সত্যিই কতখানি ভালোবাসেন, তাদের বাবা-মা হিসেবে পেয়ে আপনি কতখানি কৃতজ্ঞ, এখুনি বলে ফেলুন সেটি। আগামীকাল নয়। পাঁচ মিনিট পরে নয়। এখনই। পাঁচ মিনিট হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।
যদি সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কাছে দুঃখ প্রকাশের কোনো কিছু থাকে, তো এত দিন কেন করেন নি, তার অজুহাতের তালিকা নিয়ে ভাবতে বসবেন না যেন। অজুহাত বাদ দিয়ে এক্ষুনি তা প্রকাশ করুন। সুযোগ আর নাও মিলতে পারে। এই মুহূর্তকে ধরে ফেলুন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা খুবই গভীর। খুব কম লোকই সঠিক উত্তরটা ধরতে পারে। যখন আমি ছাত্র অবস্থায় উত্তরটা পড়েছিলাম, এটি অনেক দিন ধরে আমার মাথায় ঘুরপাক খেয়েছিল। আমি কল্পনাও করি নি, এই প্রশ্নের উত্তরটা এত গভীর হবে। উত্তরটা হচ্ছে, আপনি যার সাথে আছেন সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

আমার মনে পড়ে, আমি কলেজের প্রফেসরদের অনেক প্রশ্ন করেছি, কিন্তু আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে নি কেউই। তারা বাইরে শোনার ভাব

দেখাচ্ছিল বটে; কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা চাচ্ছিল আমি যেন চলে যাই। নিজেকে তখন খুব পঁচা মনে হয়েছিল। আমার আরও মনে পড়ে, সাহস নিয়ে এক বিখ্যাত লেকচারারকে প্রশ্ন করতে গিয়েছিলাম, তাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার জন্য। রীতিমতো অবাক ও খুশি হয়ে দেখলাম যে, তিনি আমার প্রতি তার পুরো মনোযোগ ঢেলে দিয়েছেন। অন্য প্রফেসরেরা তার সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, আর আমি ছিলাম লম্বা ঝাঁকড়া চুলের সামান্য এক ছাত্র। অথচ তিনি আমাকেই গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে দিলেন। পার্থক্যটা ছিল বিশাল।

যোগাযোগ ও ভালোবাসা ভাগাভাগি করা যায় কেবল তখনই, যখন সেই মুহূর্তের জন্য আপনার সাথে থাকা ব্যক্তি, সে যে-ই হোক না কেন, সারা পৃথিবীতে আপনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠে। তারা এটা অনুভব করে। তারা এটা জানে। তারা এতে সাড়া দেয়।

বিবাহিত দম্পতিরা প্রায়ই অভিযোগ করে যে তাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনী তাদের কথা আর মনোযোগ দিয়ে শুনছে না। তারা যা বুঝাতে চায় তা হলো, তাদের সঙ্গীরা আর তাদের গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার অনুভূতিটা এনে দেয় না। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই সম্রাটের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা স্মরণ রাখা উচিত, আর সেটাকে কাজে লাগানো উচিত। আমরা যতই ক্লান্ত বা ব্যস্ত থাকি না কেন, যখন আমরা সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাথে থাকি, তখন তাদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত, যেন সেই মুহূর্তে তারাই আমাদের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। প্রত্যেকেই যদি এমন করত, তাহলে বিবাহবিচ্ছেদের উকিলদের তাদের উকিলগিরি বাদ দিয়ে অন্য পেশা দেখতে হতো।

ব্যবসাতে যখন আমরা কোনো সম্ভাব্য ক্রেতার সাথে থাকি, তখন যদি আমরা তাদের সাথে সেই সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের বিক্রি আরও বাড়বে, সেই সাথে বাড়বে আমাদের বেতনও। মূল গল্পে সম্রাট সেই সন্ন্যাসীর সাথে দেখা করতে যাওয়ার পথে, একটা ছোট্ট বালকের উপদেশ মনোযোগ দিয়ে শুনে আততায়ীর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। এমন পরাক্রমশালী সম্রাট যখন একজন সামান্য বালকের সাথে থাকেন, সেই বালক তখন তার জন্য জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আর সেটাই সম্রাটের জীবন বাঁচিয়েছিল। যখন দীর্ঘদিন পরে বন্ধুরা তাদের সমস্যাগুলো বলার জন্য আমার কাছে আসে, আমি সম্রাটের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা স্মরণ করি, আর তাদের পূর্ণ গুরুত্ব দিই। এটাই নিঃস্বার্থতা। দয়া ও মৈত্রী এতে শক্তি যোগায় এবং এতে কাজ হয়।

সেই শিক্ষাবিষয়ক সেমিনারের আয়োজক মহিলা, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সে যে শিশুদের সাহায্য করতে চাচ্ছিল তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল, আর চর্চা করেছিল সেই নীতি : 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, আপনি এখন যার সাথে আছেন।' সেই শিশুদের অনেকের জন্য সেটাই ছিল প্রথমবার, যখন তারা নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে, বিশেষ করে তাও একজন প্রভাবশালী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সামনে।

তাদের গুরুত্বের সাথে নিয়ে সে তখন পুরোপুরি তাদের কথা শুনেছিল। তাদের বিচার করছিল না। শিশুদের কথা শোনা হলো। এবার পুরো কর্মসূচিটা তাদের উপযোগী করে গড়ে তোলা হলো। শিশুরা নিজেদের সম্মানিত ভাবল, আর কর্মসূচিটি সফল হলো। সেই আলোচনা সভায় আমার বক্তৃতাই মূল বক্তৃতা ছিল না। আমার পরে এক শিশু উঠে দাঁড়াল বলার জন্য। সে আমাদের শোনাল তার পরিবারের ঝামেলার কথা, নেশা ও অপরাধজগতের কথা, কীভাবে এই কর্মসূচি

তার জীবনের আশা ফিরিয়ে এনেছে তার কথা। আর জানাল কীভাবে সে শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছে। শেষের দিকে আমার চোখ ভিজে গিয়েছিল। ছেলেটার বক্তৃতাই হয়েছিল মূল বক্তৃতা।

আপনার জীবনের বেশির ভাগ সময় আপনি নিজেকে নিয়েই থাকেন। অতএব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যার সাথে আপনি থাকেন, সেটা হচ্ছে আপনি নিজে। আপনার নিজেকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রচুর সময় আছে। সকালে ঘুম থেকে জেগে প্রথম কাকে নিয়ে আপনি সচেতন হন? আপনার নিজেকে! আপনি কি কখনো বলেন, 'শুভ সকাল আমি! ভালো একটা দিন কাটুক!'? আমি কিন্তু বলি। ঘুমাতে যাওয়ার সময় কে সেই সর্বশেষ ব্যক্তি যার বিষয়ে আপনি সচেতন থাকেন? সে তো আপনিই! আমি নিজেকে নিজে শুভরাত্রি জানাই। আমি আমার দিনের অনেক ব্যক্তিগত সময়ে নিজেকে গুরুত্ব দিই। এটা কাজে দেয়।

সম্রাটের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, 'কোন জিনিসটা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ' এর উত্তর হচ্ছে যত্ন নেওয়া। যত্ন নেওয়া মানে হচ্ছে, সতর্ক হওয়া আর যত্নশীল হওয়া। উত্তরটা বুঝিয়ে দেয় যে, আমাদের কাজের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আসছে কোথা থেকে, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যত্ন নেওয়ার মানেটা কয়েকটা গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে বলার আগে আমি সম্রাটের তিনটি প্রশ্নোত্তর একসাথে সংক্ষিপ্তাকারে লিখে নেব :

১. কখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়?- এখন।
২. কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি?- আপনি যার সাথে আছেন সেই ব্যক্তি।
৩. কোন জিনিসটি করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ - যত্ন নেওয়া।

যে গরুটি কেঁদেছিল

নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত কড়াকড়ি নয়, এমন একটা জেলখানায় আমি বেশ আগেভাগে পৌঁছে গেলাম ধ্যানের ক্লাস করানোর জন্য। একজন কয়েদি, যাকে আগে কখনো দেখিনি, সে আমার সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে ছিল মানুষরূপী দৈত্য, ঝোপঝাড়ের মতো লম্বা চুল দাড়ি আর বাহুতে উল্কি আকা। মুখে প্রচুর কাটাকুটির দাগ আমাকে বলে দিল, এই ব্যক্তি ভয়ংকর মারপিট করে এসেছে অনেকবার। তার চেহারাটা এমন ভয়ংকর ছিল যে, আমি অবাক হলাম কেন সে ধ্যান শিখতে এসেছে। সে তো এ লাইনের লোক নয়। অবশ্যই আমার এমন মনে করাটা ভুল ছিল।

সে আমাকে বলল যে, কয়েক দিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে, যাতে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার যোগাড়। কথার শুরুতেই তার আলস্টার এলাকার কথাবার্তা ভঙ্গি ধরা পড়ল আমার কাছে। পটভূমি হিসেবে জানাল, সে বড় হয়েছে বেলফাস্টের নির্মম রাস্তাগুলোর একটাতে। তার প্রথম ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে যখন তার বয়স সাত। স্কুলের মাস্তান ছোকরা তার কাছ থেকে দুপুরের খাবারের টাকা দাবি করেছিল। সে না বলে দিল। বয়সে বড় সেই বালকটি একটা লম্বা ছুরি বের করে দ্বিতীয়বারের মতো টাকা চাইল। সে ভাবল মাস্তানটি ধাপ্পা দিচ্ছে মাত্র। তাই সে আবারও না বলল। তৃতীয়বার আর মাস্তানটি জিজ্ঞেস করল না; শুধু ছুরিটা সেই সাত বছরের বালকের হাতে ঢুকিয়ে দিল, বের করে আনল আর হেঁটে চলে গেল।

সে আমাকে বলেছিল যে, সে হতভম্ব হয়ে স্কুলের মাঠ থেকে দৌড় দিল কাছেই তার বাবার বাড়িতে, হাত বেয়ে তখন রক্ত চুইয়ে পড়ছে । তার বেকার পিতা ক্ষতটার দিকে একবার তাকাল মাত্র, আর তাকে নিয়ে গেল রান্নাঘরে। ক্ষত ব্যান্ডেজ করে দিতে নয়। একটা ড্রয়ার খুলে বড় একটা ছুরি বের করল তার পিতা। সেটি তার ছেলের হাতে দিয়ে স্কুলে ফিরে যেতে এবং মাস্তানটিকে কোপাতে আদেশ দিল। এভাবেই সে বড় হয়েছিল। সে যদি এমন বিশালদেহী ও শক্তিশালী না হতো, অনেক আগেই মরে ভুত হয়ে যেত।

এই জেলখানাটা ছিল একটা জেলখানার খামার। এটা ছিল মূলত স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কয়েদি, যাদের মুক্তির সময় হয়ে এসেছে, তাদের জন্য। তারা এখানে থেকে খামারের কাজ শিখত, খামারের ব্যবসার কাজও শিখত। এখান থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি পার্থের আশেপাশের জেলখানাগুলোতে কম দামে সরবরাহ করা হতো, এতে করে জেলখানা পরিচালনার খরচ কমত।

অস্ট্রেলিয়ান খামারগুলো শুধু গম আর শাকসবজিই নয়; গরু, ভেড়া আর শুকরও পালত এবং জেলখানার খামারেও তা-ই হতো। কিন্তু অন্যান্য খামারগুলো থেকে এটি একটু ভিন্ন ছিল যে, এই খামারে নিজস্ব কসাইখানা ছিল।

জেলখানার খামারে প্রত্যেক কয়েদিকে যেকোনো একটা চাকরি করতে হতো। আমি অনেক কয়েদির কাছ থেকে শুনেছি, যে চাকরিগুলো সবচেয়ে সোজা হতো, সেগুলো হলো কসাইখানার চাকরি। এই চাকরিগুলো বিশেষ করে জনপ্রিয় ছিল নিষ্ঠুর অপরাধীদের মধ্যে। আর সবচেয়ে যে চাকরিটি সোজা হতো, যার জন্য আপনাকে লড়তে হতো, সেটা ছিল কসাইয়ের চাকরি। সেই বিশালদেহী আর ভয়ংকর আইরিশ লোকটিই ছিল কসাই।

সে আমাকে কসাইখানার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিল। কসাইখানার প্রবেশ পথটা চওড়া, দুপাশে সুদৃঢ় ইস্পাতের রেলিং। বিল্ডিংয়ের মধ্যে গিয়ে সেই প্রবেশ পথটা আস্তে আস্তে সংকীর্ণ হয়ে গেছে ফানেলের মতো। দুপাশের রেলিংগুলো এমনভাবে পথের উপর চেপে বসেছে যে, পথের শেষমাথায় একবারে কেবল একটা পশু যেতে পারে। পথের শেষ মাথায় একটা পাটাতনের উপর সে দাঁড়িয়ে থাকত, হাতে বৈদ্যুতিক বন্দুক। গরু, শুয়োর অথবা ভেড়ার পালকে কুকুর ও অন্যান্য রাখালদের দিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে সেই ইস্পাতের রেলিং ঘেরা পথে ঢোকানো হতো। সে বলেছিল যে তারা সব সময়ই নিজ নিজ স্বরে চিৎকার করত, পালানোর চেষ্টা করত। তারা মৃত্যুর গন্ধ পেত, মৃত্যুর শব্দ শুনত, মৃত্যুকে অনুভব করত। যখন কোনো পশু সেই পথ বেয়ে তার পাটাতনের পাশে আসত, এটি দেহ মোচড়াত, আর তীব্র স্বরে ডেকে উঠত। যদিও এই বৈদ্যুতিক বন্দুক দিয়ে একটা মাত্র গুলিতেই একটা বড়সড় ষাঁড় মারা সম্ভব; কিন্তু সব পশুই এখানে এসে অস্থির হয়ে উঠত, লক্ষ্য স্থির করার সময়টা পর্যন্ত দিত না। তাই তাকে দুবার গুলি করতে হতো, প্রথম গুলিটা স্থির হওয়ার জন্য, দ্বিতীয় গুলিটা মারার জন্য। প্রথমগুলিতে স্থির, দ্বিতীয় গুলিতে মৃত্যু। পশুর পর পশু। দিনের পর দিন।

আইরিশ লোকটা এবার আসল ঘটনায় আসল, আর উত্তেজিত হতে শুরু করল। ঘটনাটি ঘটেছিল মাত্র কয়েক দিন আগে, যা তাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। সে শপথ করতে শুরু করল। বার বার সে বলছিল, 'এটা ঈশ্বরের ... সত্যি'। সে ভেবেছিল, আমি তার কথা বিশ্বাস করব না।

সেদিন পার্থের আশেপাশের জেলখানাগুলোতে গরুর মাংস দেওয়ার কথা ছিল। তাই তারা গরু জবাই করছিল। এক গুলিতে গরুটাকে স্থির করে পরের গুলিতে মেরে ফেলা। অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক নিয়মে গরু জবাইয়ের কাজ চলছিল। একসময় একটা গরু আসল যেটার মতো সে আগে কখনো দেখে নি। গরুটা ছিল নিরব, অন্যান্যদের মতো কোনো দেহ মোচড়ানো নেই, হাম্বা হাম্বা নেই, ফোঁস ফোঁস নেই। এর মাথা নোয়ানো ছিল এমনভাবে যেন এটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে, স্বেচ্ছায়, ধীরে ধীরে তার পাটাতনের পাশে এসে দাঁড়াল। এটি দেহ মোচড়াল না, বা পালানোর চেষ্টাও করল না। সেইস্থানে এসে এবার গরুটি মাথা তুলে নিরবে তার ঘাতকের দিকে তাকাল, একদম স্থির হয়ে।

আইরিশ লোকটা এমন ব্যাপার তো দূরে থাক, এর কাছাকাছি কোনো ঘটনাও দেখে নি এর আগে। তার মনটা কেমন যেন অসার হয়ে গেল। সে না পারছিল বন্দুকটা তুলে ধরতে, না পারছিল গরুটার চোখগুলো থেকে নিজের চোখকে সরিয়ে নিতে। গরুটা সরাসরি তার ভেতরে তাকিয়েছিল। সে যেন সময়ের অতীত কোনো শূন্যতায় ডুবে গেল। কতক্ষণ এমন ছিল তা সে আমাকে বলতে পারে নি। কিন্তু যখন গরুটা তার চোখে চোখ রাখল, সে যা দেখল, তাতে সে আরও ভীষণ নাড়া খেল। সে দেখল যে গরুটার বাম চোখে, নিচের চোখের পাতার উপরে পানি জমতে শুরু করল। পানির পরিমাণ বাড়তে বাড়তে চোখের পাতা আর ধরে রাখতে পারল না। এটি ধীরে ধীরে গরুটার গাল বেয়ে উজ্জল এক অশ্রুরেখা সৃষ্টি করে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। তার হৃদয়ের
দীর্ঘদিনের বদ্ধ দরজাগুলো যেন খুলে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে।

অবিশ্বাসের সাথে সে গরুটার ডান চোখে তাকিয়ে দেখল, নিচের চোখের পাতার উপরে পানি জমতে জমতে এখান থেকেও দ্বিতীয় একটা অশ্রুধারা মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ধীরে ধীরে। লোকটি ভেঙে পড়ল। গরুটা কাঁদছিল।

সে আমাকে বলেছিল যে সে তার বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, আর চিৎকার করে জেলখানার পুলিশ অফিসারদের জানিয়ে দিয়েছিল যে তারা তাকে যা খুশি করতে পারে; কিন্তু এই গরুটাকে কেউ মারতে পারবে না। সে তার কথা শেষ করল এই বলে যে, সে এখন নিরামিষভোজী।

গল্পটা সত্যি ছিল। জেলখানার অন্যান্য কয়েদিরাও আমাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। যে গরুটি কেঁদেছিল, সে সবচেয়ে নিষ্ঠুর লোকটিকে শিখিয়েছিল যত্ন নেওয়া মানে কী।

ছোট্ট মেয়েটি ও তার বন্ধু

আমি দক্ষিন অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিন-পশ্চিমের একটা গ্রাম্য শহরে এক দল বয়স্ক লোকের কাছে যে গরুটি কেঁদেছিল তার গল্প বলেছিলাম। তাদের মধ্যে এক বুড়ো লোক আমাকে এমন একটা গল্প শোনাল। সেটি তার তরুণ বয়সের ঘটনা। গত শতাব্দীর প্রথমদিকের সময়কাল।

তার বন্ধুর কন্যার বয়স ছিল তখন চার কি পাঁচ বছর। এক সকালে সে তার মায়ের কাছে ছোট্ট পিরিচে করে দুধ চাইল। তার ব্যস্ত মা তো খুশি, তার মেয়ে দুধ খেতে চাচ্ছে। তাই সে খুব একটা ভাবল না, কেন সে দুধ চাচ্ছে পিরিচে করে, কোনো গ্লাসে নয়।

পরের দিনও একই সময়ে ছোট্ট মেয়েটি আবার এক পিরিচ দুধ চাইল। মাও খুশি মনে দিয়ে দিল। বাচ্চারা এমনিতেই তাদের খাবার নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। মা শুধু খুশি যে তার মেয়েটি স্বাস্থ্যকর কোনো কিছু খেতে চাচ্ছে। পরের কয়েক দিনও একই ব্যাপার ঘটল, একই সময়ে। মা আসলে কখনোই দেখে নি যে তার মেয়েটা পিরিচে করে দুধ খাচ্ছে, তাই সে ভেবে কুলকিনারা পেল না, বাচ্চাটা কী নিয়ে মেতেছে। সে চুপিচুপি মেয়েটাকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিল।

তখনকার দিনে প্রায় সব ঘরই বানানো হতো খুঁটির উপরে, মাটি থেকে উপরে। ছোট্ট মেয়েটি ঘরের বাইরে গেল, ঘরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, আর দুধের পিরিচটি নামিয়ে রেখে ঘরের নিচের অন্ধকার জায়গাটা লক্ষ করে নরম সুরে ডাকল। কয়েক মুহূর্ত পরে বিশাল এক কালো সাপ বেরিয়ে এলো। এটি পিরিচ থেকে দুধ খেতে শুরু করল, মেয়েটির হাসিমাখা মুখ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। তার মা কিছুই করতে পারল না। কারণ, বাচ্চাটি সাপটির খুব কাছাকাছি ছিল। বুকভরা আতঙ্ক নিয়ে তার মা দেখল যে সাপটি দুধ খেয়ে শেষ করে ঘরের নিচে চলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় তার স্বামী কাজ থেকে ঘরে ফিরলে ব্যাপারটা তাকে জানাল। তার স্বামী তাকে বলল, যদি মেয়েটি পরের দিনও এক পিরিচ দুধ চায়, সে যেন তা দেয়। এর পরের ব্যবস্থা সে করবে।

পরের দিন একই সময়ে ছোট্ট মেয়েটি তার মাকে এক পিরিচ দুধ দিতে বলল। সে দুধের পিরিচটি নিয়ে বরাবরের মতোই বাইরে গেল, বাড়ির পাশে নামিয়ে রাখল, আর তার বন্ধুকে ডাকল। বিশাল সেই কালো সাপটা অন্ধকার থেকে দেখা দেওয়া মাত্র বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গেল কাছেই। গুলির আঘাতে সাপটি একটি খুঁটির গায়ে আছড়ে পড়ল। তার মাথাটা দেহ থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মেয়েটির চোখের সামনে। তার বাবা ঝোপের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল, আর বন্দুকটা একপাশে রেখে দিল।

তখন থেকে ছোট্ট মেয়েটি কোনো কিছু খেতে অস্বীকৃতি জানাল। বৃদ্ধ লোকটির ভাষায়, 'সে ছটফটানি শুরু করল।' তার বাবা-মা কিছুতেই কোনো কিছু খাওয়াতে পারল না। অগত্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করাতে হলো তাকে। কিন্তু তারাও কোনো সাহায্য করতে পারল না। ছোট্ট মেয়েটি মারা গেল। সেই পিতা যখন তার মেয়ের চোখের সামনে তার বন্ধুকে গুলিতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল, সে যেন গুলি করেছিল তার আপন মেয়েটিকেও।

যে বয়স্ক লোকটি আমাকে এই গল্পটা বলেছিল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেই কালো সাপটি ছোট্ট মেয়েটিকে ক্ষতি করবে, এমনটা সে কখনো ভেবেছে কি না?

'সেরকম সম্ভাবনা আমি দেখি নি!' জবাব দিয়েছিল বুড়ো। আমিও তেমনই ভেবেছি, তবে একটু ভিন্ন সুরে।

সাপ, মেয়র এবং ভিক্ষু

আমি থাইল্যান্ডে ভিক্ষু হিসেবে আট বছরেরও বেশি সময় কাটিয়েছি। বেশির ভাগ সময় আমি ছিলাম জঙ্গালের মধ্যে থাকা বিহারগুলোতে, যেখানে বসবাস করতে হতো সাপদের মাঝে।

১৯৭৪ সালে আমি সেখানে প্রথম যাই। আমাকে বলা হয়েছিল যে থাইল্যান্ডে একশ জাতের সাপ আছে। তাদের মধ্যে ৯৯টি প্রজাতি বিষধর- তাদের কামড়ে আপনি সোজা মারা যাবেন। আর অন্য একটি সাপ কামড়ায় না, তবে পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মারে।

সেই সময়ে প্রায় প্রত্যেক দিন সাপ দেখতাম আমি। একবার আমার কুটিরে ছয় ফুট লম্বা এক সাপের উপর পা দিয়েছিলাম। আমরা উভয়েই চমকে উঠে লাফ দিয়েছিলাম, তবে সৌভাগ্যবশত দুজনে দুদিকে। এমনকি এক সকালে আমি এক সাপের উপরে প্রস্রাব করে দিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম ওটা একটা কাঠি। অবশ্যই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম আমি। (সম্ভবত সাপটি ভেবেছিল, তাকে পবিত্র পানি ছিটিয়ে আশীর্বাদ করা হচ্ছে।) একবার এক অনুষ্ঠানে সূত্রপাঠের সময় একটা সাপ আমাদের এক ভিক্ষুর পিঠ বেয়ে উঠতে লাগল। যখন এটি কাঁধের উপরে উঠে গেল, কেবল তখন ভিক্ষুটি ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। সাপটিও তার দিকে ফিরে তাকাল। আমি সূত্রপাঠ বন্ধ করে দেখলাম, কয়েকটা সেকেন্ড যেন ভিক্ষু ও সাপটা পরস্পর চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইল। এরপর ভিক্ষুটি আস্তে করে তার চীবর ঝাঁকাল। সাপটি নিরবে নেমে গেল, আর আমরা সূত্রপাঠ শুরু করলাম আবার।

বনভিক্ষু হিসেবে আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল যাতে আমরা সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী জাগিয়ে তুলি, বিশেষ করে সাপদের প্রতি। আমরা তাদের ভালোমন্দ খেয়াল রাখতাম, যত্ন নিতাম। এ কারণেই সেই দিনগুলোতে কোনো ভিক্ষুকেই সাপে কামড়ায় নি।

থাইল্যান্ডে থাকার সময় আমি দুটো বিরাট সাপ দেখেছিলাম। প্রথমটা ছিল কমপক্ষে সাত মিটার লম্বা একটা অজগর, আর দেহটা ছিল আমার উরুর মতো মোটা। এত বড় আকারের কোনো কিছু দেখলে আপনি অবিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যাবেন। কিন্তু এটা ছিল সত্যি। আমি এটাকে আরও কয়েক বছর পরে আরেকবার দেখেছিলাম। বিহারের আরও অনেক ভিক্ষুই সেটাকে দেখেছিল। আমাকে পরে জানানো হয়েছে যে এটি নাকি এখন মরে গেছে। অন্য যে বড় সাপটি দেখেছিলাম, সেটা ছিল শঙ্খচূড়। থাই গ্রীষ্মমন্ডলীয় জঙ্গালে থাকাকালীন যে তিনবার আমি অনুভব করেছিলাম যে, আবহাওয়ায় যেন বিদ্যুৎ বয়ে যাচ্ছে, আমার ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে গেছে, আর আমার ইন্দ্রিয়গুলো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, সেই সময়টা ছিল এমনই একটি সময়।

জঙ্গালের বুনো পথে মোড় ঘুরতেই চোখে পড়ল একটা কালো সাপ দেড় মিটার চওড়া রাস্তাটা রোধ করে আছে। এর মাথা বা লেজ কোনোটাই দেখা যাচ্ছিল না, দুটোই ছিল ঝোপের আড়ালে। আর এটা সামনে এগোচ্ছিল। এর নড়াচড়া দেখে আমি সাপটার দৈর্ঘ্যকে পথের প্রস্থ দিয়ে গুণলাম। সাত প্রস্থ গোণার পরে তবেই লেজের দেখা পেলাম। সাপটি ছিল লম্বায় ১০ মিটারেরও বেশি। আমি এটাকে দেখে গ্রামবাসীদের বললাম। তারা আমাকে বলল যে এটি ছিল শঙ্খচূড়, বড় জাতের।
আজান চাহ-র এক থাই শিষ্য, যে এখন নিজ গুণে বিখ্যাত এক আচার্য হয়ে উঠেছে, সে একবার অনেকজন ভিক্ষু সাথে নিয়ে থাইল্যান্ডের জঙ্গালে ধ্যান করছিল। কোনো একটা প্রাণী আসার শব্দ শুনে তারা চোখ খুলতে বাধ্য হলো। তারা দেখল একটা শঙ্খচূড় সাপ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। থাইল্যান্ডের

কোনো কোনো জায়গায় শঙ্খচূড়কে বলা হয় ‘এক পদক্ষেপের সাপ’। কারণ, এটা আপনাকে কামড়ানোর পরে আপনি কোনোমতে এক পা এগোতে পারবেন, এর পরে নিশ্চিত মৃত্যু! শঙ্খচূড় সোজা সিনিয়র ভিক্ষুটার কাছে এগিয়ে গেল, ভিক্ষুটার মাথার সমান করে তার মাথাটা উঁচু করল, আর ফণা বের করে শব্দ করতে লাগল, ‘হিস্ হিস! হিস্ হিস! ’

আপনি তখন কী করতেন? দৌড় দেওয়াটা হতো সময়ের অপচয় মাত্র। এই বড় সাপগুলো আপনার থেকে অনেক দ্রুত দৌড়াতে পারে। থাই ভিক্ষুটা করল কী, সে হাসল, আস্তে করে ডান হাতটা তুলল এবং শঙ্খচূড়ের মাথায় আলতো করে চাপড় দিয়ে থাই ভাষায় বলল, ‘আমাকে দেখতে আসার জন্য ধন্যবাদ।’ সমস্ত ভিক্ষুরা দেখল ঘটনাটা।

এই ভিক্ষুটা ছিল বিশেষ এক ভিক্ষু যার ছিল ব্যতিক্রমী মৈত্রীভাব। শঙ্খচূড় হিস্ হিস্ বন্ধ করল। ফণা গুটিয়ে নিল। মাথাটা মাটিতে নামিয়ে কাছের আরেক ভিক্ষুর কাছে গেল, ‘হিস্ হিস! হিস্ হিস! ’

দ্বিতীয় ভিক্ষুটি পরে বলেছিল যে কোনোমতেই সে শঙ্খচূড়ের মাথায় হাত বুলাতে যেত না। সে ভয়ে বরফের মতো জমে গিয়েছিল। নিরবে সে প্রার্থনা করছিল যেন শঙ্খচূড়টা তাড়াতাড়ি চলে যায়, আর অন্য কোনো ভিক্ষুর সাথে দেখা করে।

শঙ্খচূড়ের মাথায় চাপড় দেওয়া সেই ভিক্ষুটি অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের বিহারে কয়েক মাস ছিল। আমরা সে-সময় আমাদের মূল দেশনালয় নির্মাণ করেছিলাম। আরও কয়েকটা ভবন নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় স্থানীয় কাউন্সিল অফিসে জমা ছিল। স্থানীয় কাউন্সিলের মেয়র এখানে এসেছিল আমরা কী করছি তা দেখতে।

মেয়র নিঃসন্দেহে জেলার সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। সে এই এলাকায় বড় হয়েছে, আর সফল একজন কৃষক। সে আবার আমাদের প্রতিবেশীও। সে এসেছিল সুন্দর একটা স্যুট পরে, যা মেয়রের পক্ষেই মানানসই। জ্যাকেটের বোতাম ছিল খোলা। ফলে বড়সড় অস্ট্রেলিয়া মাপের বিশাল ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছিল। শার্টের বোতামগুলো খুব টানটান হয়ে গিয়েছিল, আর পেটটা তার সেরা প্যান্টের কিনারা ছাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। থাই ভিক্ষুটি এক ফোঁটা ইংরেজি জানত না। সে মেয়রটির ভুঁড়িটা দেখল। আমি তাকে থামানোর আগেই সে মেয়রের কাছে পৌঁছে গেল, আর ভুঁড়িটাকে চাপড় দিতে শুরু করল। আমি ভাবলাম, ‘সেরেছে! আপনি মেয়রের ভুঁড়িটাকে এভাবে চাপড়াতে পারেন না। আমাদের ভবনের প্রকল্পগুলো আর অনুমোদন পাবে না। আমরা শেষ! আমাদের বিহার নির্মাণের এখানেই ইতি!’

সেই থাই ভিক্ষুটি মৃদু হাসি নিয়ে যতই মেয়রের ভুঁড়িটিকে চাপড়ালো আর হাত বুলিয়ে দিল, ততই মেয়র হাসতে শুরু করল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এমন রাশভারি মেয়র শিশুর মতো খিল খিল করে হাসতে লাগল। সে সত্যিই এই অসাধারণ থাই ভিক্ষুর ভুঁড়ি চাপড়ানো ও হাত বুলানোর প্রত্যেকটি মুহূর্তকে উপভোগ করেছিল।

আমাদের সবগুলো ভবনের প্ল্যান অনুমোদন হয়ে গেল। মেয়র আমাদের সেরা বন্ধু ও সহায়তাকারীদের একজন হয়ে উঠল। যত্ন নেওয়ার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশটা হলো, এর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা কোত্থেকে আসছে তা দেখা। সেই থাই ভিক্ষুটার প্রতিটি কাজের উৎস ছিল এমন বিশুদ্ধ হৃদয় যে, সে শঙ্খচূড়ের মাথায় চাপড় দিতে পারে, মেয়রের ভুঁড়িতে হাত বুলাতে পারে, আর সবচেয়ে বড় কথা, তারা দুজনেই এটা পছন্দ করেছিল। আমি আপনাকে এমন কিছু করতে যাওয়ার পরামর্শ দেব না, অন্তত পক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি একজন সাধুসমেত্মর ন্যায় যত্ন নিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত।

খারাপ সাপ

এই বইয়ের সর্বশেষ সাপের গল্পটি বৌদ্ধ জাতক কাহিনী থেকে নেওয়া। এতে দেখা যায় যে, যত্ন নেওয়া মানে সব সময় নম্র, ভদ্র ও ইতিবাচক হওয়া বুঝায় না।

কোনো এক গ্রামের বাইরে জঙ্গলে একটি খারাপ সাপ বাস করত। সাপটি ছিল ক্রুর, হিংস্র ও নীচমনা। সে কেবল মজা করার জন্য লোকজনকে কামড়াত। যখন এই খারাপ সাপটি বুড়ো হলো। সে ভাবতে লাগল, মারা গেলে সাপগুলোর কী হয়? তার পুরো হিস্ হিসের জীবনে সে ধর্মকে তাচ্ছিল্যই করেছে। তার মতে ধর্ম হচ্ছে অর্থহীন প্রলাপমাত্র। আর যেসব সাপ এই অর্থহীন প্রলাপের ফাঁদে পড়ে সহজ সরল হয়ে রয়েছে, তাদের সে বোকা বলে উপহাস করেছে। কিন্তু এখন এই বুড়ো বয়সে এসে সে বেশ ধর্মকর্মে আগ্রহী হয়ে উঠল। তার গর্তের অদূরেই পাহাড়ের চূড়ায় বাস করত এক সাধু সাপ। সকল সাধু লোকজন পাহাড় পর্বতের চূড়ায় বাস করে। এমনকি সাধু সাপও। এটাই চিরাচরিত ঐতিহ্য। আপনি কখনো কোনো সাধু লোক জলাভূমিতে বাস করে বলে শুনবেন না। একদিন খারাপ সাপটা সাধু সাপের সাথে দেখা করবে বলে মনস্থির করল। সে গায়ে একটা রেইনকোট চাপাল, কালো সানগ্লাস পরল, আর টুপি দিয়ে মাথা ঢাকল যাতে তার বন্ধুরা তাকে চিনতে না পারে। এর পরে সে পাহাড় বেয়ে বেয়ে সাধু সাপের বিহারে উঠে গেল। সে পৌঁছল একটা ধর্মদেশনার মাঝামাঝি সময়ে। সাধু সাপটা একটা পাথরের উপর বসে ধর্মদেশনা দিচ্ছিল, আর শত শত সাপ তার দেশনা নিবিড় মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। খারাপ সাপটি সেই সমবেত সাপগুলোর একপ্রান্তে দরজার কাছাকাছি গিয়ে দেশনা শুনতে শুরু করল।

যতই সে দেশনা শুনল, ততই তা তার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো। যুক্তি থেকে বিশ্বাস স্থাপিত হলো, অনুপ্রেরণা এলো, আর শেষে সে পুরো ধর্মান্তরিত হলো। দেশনা শেষে সে সাধু সাপটার কাছে গেল। অশ্রুভরা চোখে সে তার জীবনের অনেক পাপকর্মের কথা স্বীকার করল আর প্রতিজ্ঞা করল, এখন থেকে সে পুরোপুরি বদলে যাবে। সে সাধু সাপের সামনে শপথ নিল, আর কোনো মানুষকে কামড়াবে না। সে দয়ালু হয়ে যাবে। সে হবে যত্নশীল। সে অন্য সাপদের শিক্ষা দেবে, কীভাবে ভালো হতে হয়। এমনকি যাবার সময় সে দানবাক্সে কিছু দানও করে গেল। (সেটা অবশ্যই যখন সবাই দেখছিল, তখন।) যদিও সাপ সাপের সাথে কথা বলতে পারে, মানুষের কাছে তা হিস্ হিস্ ছাড়া আর কিছুই নয়। খারাপ সাপ, অথবা বলা যায় প্রাক্তন খারাপ সাপ মানুষদের বলতে পারল না যে সে এখন শান্তিকামী। গ্রামবাসীরা এখনো তাকে এড়িয়ে চলে, যদিও তারা অবাক হয়ে ভাবে, সাপের বুকে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ব্যাজ কেন! এরপর একদিন এক গ্রামবাসী ওয়াকম্যানে গান শুনতে শুনতে বেখেয়ালে ঠিক খারাপ সাপের গা ঘেঁষে নাচতে নাচতে চলে গেল। অথচ খারাপ সাপটি তাকে কামড়াল না। সেটি শুধু ধার্মিক একটা হাসি দিল।

তখন থেকে গ্রামবাসীরা বুঝতে পারল যে খারাপ সাপটি আর বিপদজনক নয়। সে যখন তার গর্তের বাইরে কু-লাকার ধারণ করে গোল হয়ে ধ্যানে বসে থাকত। লোকজন নিশ্চিন্তে তার পাশ ঘেঁষে চলে যেত। এরপর গ্রামের কিছু দুষ্ট বালক তাকে উত্যক্ত করতে এলো। তারা নিরাপদ দূরত্বে থেকে বাক্যবাণ ছুঁড়ে দিল, 'এই যে, বুকে ভর দিয়ে চলা শুকনো কাঠি! তোমার দাঁত দেখাও দেখি, যদি থাকে। এই বড় পোকা, তুমি তো একটা কাপুরুষ, ননীর দলা! তোমার বংশে তুমি একটা কলঙ্ক!'

সে তাকে 'বুকে ভর দিয়ে চলা শুকনো কাঠি' ডাকাটা পছন্দ করল না, যদিও কথাতে কিছুটা সত্য আছে। 'বড় পোকা' বলাটাও তার পছন্দ হলো না। কিন্তু সে কীভাবে নিজেকে আত্মরক্ষা করবে? সে তো শপথ নিয়েছে কাউকে কামড়াবে না।

সাপটি নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে দেখে বালকেরা আরও সাহসী হয়ে উঠল, আর পাথর এবং মাটির ঢেলা নিক্ষেপ করল। একটা পাথর গায়ে লাগাতে পারলে তারা হেসে উঠত। সাপটি জানত, সে বালকগুলোর যে কাউকে দ্রুত ছোবল দিয়ে শেষ করে দিতে পারে, এমনকি আপনি 'বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল' কথাটা পড়ে শেষ করার আগেই। কিন্তু তার শপথ তাকে এমন করা থেকে বিরত রাখল। এতে করে বালকেরা আরও কাছে এসে এবার লাঠি দিয়ে তার পিঠে মারতে শুরু করল। সাপটি সেই মারের ব্যথা সহ্য করল; কিন্তু সে বুঝল যে এই বাস্তব জীবনে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে আপনাকে হীন ও ইতর হতে হবে। ধর্ম আসলেই কোনো কাজের নয়। তাই সে গায়ের ব্যথা সহ্য করেও পাহাড় বেয়ে উপরে উঠল সেই ভুয়া সাপের সাথে দেখা করার জন্য, আর তার শপথ থেকে মুক্তি লাভের জন্য।

সাধু সাপ তাকে সারা শরীরে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় আসতে দেখল আর জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে তোমার?'

'এটা তোমার দোষ।' খারাপ সাপ তিক্ত স্বরে অভিযোগ করল।

'সব আমার দোষ মানে? কী বলতে চাও তুমি?' প্রতিবাদ করল সাধু সাপ। 'তুমি আমাকে না কামড়াতে বলেছিলে। এখন দেখ আমার কী অবস্থা! ধর্ম হয়তো এই বিহারে চলতে পারে; কিন্তু বাস্তব জগতে...'

সাধু সাপ তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'ওরে মুর্খ সাপ! ওরে হাঁদা সাপ! ওরে বোকা সাপ! এটা সত্যি যে আমি তোমাকে না কামড়াতে বলেছিলাম। কিন্তু আমি তো কখনোই হিস্ হিস্ করতে না করি নি, করেছি কি?'

জীবনে মাঝেমধ্যে দয়ার খাতিরে সাধু সন্তদেরও 'হিস্ হিস' করতে হয়।
কিন্তু কারোরই কামড়ানোর প্রয়োজন নেই।

সপ্তম অধ্যায়

প্রজ্ঞা ও অন্তরের নিরবতা

মৈত্রীর ডানা

যদি দয়াকে একটা সুন্দর পায়রা হিসেবে কল্পনা করা হয়, তাহলে প্রজ্ঞা হচ্ছে তার ডানা। প্রজ্ঞাহীন দয়া কখনোই কাজে আসে না।

একজন বয় স্কাউট দিনের ভালো কাজটা করল একজন বৃদ্ধা মহিলাকে ব্যস্ত সড়ক পার করিয়ে দিয়ে। সমস্যাটা ছিল, বৃদ্ধা মহিলাটি রাস্তা পার হতে চায় নি। কিন্তু লজ্জায় সে তা মুখ ফুটে বলতে পারে নি।

দুর্ভাগ্যক্রমে উপরের গল্পটা আমাদের ভালোভাবে বলে দেয় যে পৃথিবীতে এখন দয়ার নামে এসব কী হচ্ছে। আমরা প্রায়ই ধরে নিই যে অন্যদের কী প্রয়োজন সেটা আমাদের জানা আছে। এক তরুণ, জন্ম থেকে বধির, সে তার নিয়মিত চেক আপের জন্য তার বাবা-মায়ের সাথে এক ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার খুব আগ্রহভরে কোনো এক মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত নতুন এক চিকিৎসা পদ্ধতির কথা তার বাবা মাকে জানাল। জন্ম থেকে বধির এমন লোকদের দশ শতাংশকে একটি সাধারণ, স্বল্পব্যয়ী অপারেশনের মাধ্যমে তাদের পূর্ণ শ্রবণক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া যায়। সে তরুণটির বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করল, তারা এটি চেষ্টা করে দেখবে কি না। তারা তাড়াতাড়ি সায় দিল এই প্রস্তাবে।

সেই তরুণটি ছিল শতকরা দশজনের একজন, যে তার শ্রবণক্ষমতা পুরোপুরি ফিরে পেল। কিন্তু সে তার বাবা-মা ও ডাক্তারের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গেল। চেক আপের সময় ডাক্তার ও তার বাবা-মা কী ব্যাপারে আলাপ করেছিল তা সে শোনে নি। সে শুনতে চায় কি না, তাও কেউ জিজ্ঞেস করে নি। এখন সে অভিযোগ করছে যে তাকে সব সময় অপ্রয়োজনীয় শব্দের যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে, যার কোনো মানে হয় না। গোড়া হতেই সে কখনো শুনতে চায় নি।

তার বাবা-মা, ডাক্তার ও আমি নিজে, এই গল্পটি পড়ার আগে, ধরে নিয়েছিলাম যে সবাই শুনতে চায়। আমরা যা জানতাম, ঠিকই জানতাম। এমন ধারণায় পূর্ণ যে দয়া ও মৈত্রী, তা বোকামি ও বিপদজনক। এটা জগতে অনে দুঃখকষ্টের সৃষ্টি করে।

সন্তানের যত্ন নেওয়া

বাবা-মাদের নিয়ে ঝামেলাটা হচ্ছে তারা সব সময় মনে করে তাদের সন্তানের প্রয়োজনটা তারাই সবচেয়ে ভালো জানে। কিন্তু প্রায়ই তারা এখানে ভুল করে। মাঝে মধ্যে তাদেরটা সঠিক হয় বটে, যেমনটা চাইনিজ কবি সু তুং পো (১০৩৬- ১১০১) প্রায় এক হাজার বছর আগে তার এক কবিতায় বলেছিলেন

:আমার সমত্মানের জন্মক্ষণে পরিবারে, যখন একটা শিশুর জন্ম হয়, তারা চায়, সে হবে বুদ্ধিমান।
আমি, এত বুদ্ধিমান হয়ে ধ্বংস করলাম আমার সারাটা জীবন। আমার কেবল একটাই আশা,
শিশুটি প্রমাণ করুক সে মুর্খ ও বোকা। এতে করে সে একটা নিরিবিলি জীবন পাবে, হবে একজন সরকারি মন্ত্রী।

প্রজ্ঞা কী?

আমি যখন ছাত্র ছিলাম, সেই সময়ে বেশির ভাগ গ্রীষ্মের ছুটিগুলো কাটাতাম স্কটল্যান্ডের পাহাড়ি এলাকায় হেঁটে বেড়িয়ে এবং ক্যাম্পিং করে। স্কটিশ পাহাড়গুলোর নির্জনতা, সৌন্দর্য ও প্রশান্তি আমাকে আনন্দিত করত।

এক স্মরণীয় বিকেলে আমি সাগর পাড় ঘেঁষে চলে যাওয়া এক ছোট্ট রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম, যা এঁকেবেঁকে বহু দূরে পাহাড়ের মাঝে হারিয়ে গেছে। উজ্জ্বল সূর্যালোক একটা স্পটলাইটের মতো আমার চারপাশের অসাধারণ সৌন্দর্যকে দৃশ্যমান করে তুলেছে। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ জুড়ে ছেয়ে আছে বসন্তের কোমল সতেজ সবুজ ঘাস। খাড়া পাহাড়ের ঢালগুলো যেন সাগর ফুঁড়ে উঠে যাওয়া গির্জার চূড়া, পড়ন্ত বিকেলে সাগর তখন নীল, এটি যেন সূর্যরশ্মিতে ঝিকিমিকি করে ওঠা তারার মেলা। ছোট ছোট সবুজ ও বাদামী পাথরের দ্বীপগুলো দিগন্তের পাড়ে হারিয়ে যাওয়া ঢেউয়ের সাথে খেলায় মেতেছে। সী-গাল এবং টার্ন নামের সামুদ্রিক পাখিগুলোও উড়ছে আর ডিগবাজি খাচ্ছে, সেটা যে তুমুল খুশিতে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এটি ছিল এক রোদেলা দিনে আমাদের এই পৃথিবীর সেরা দর্শনীয় জায়গাগুলোর একটাতে প্রকৃতির অপূর্ব শোভার এক অনুপম প্রদর্শনী। পিঠে আমার ভারী ব্যাকপ্যাক থাকা সত্তেও খুশিতে আমি যেন লাফাচ্ছিলাম।

প্রকৃতির ছোঁয়ায় আমি ছিলাম আনন্দে ভরপুর। আমার সামনে রাস্তার ধারে পার্ক করা ছিল একটা ছোট গাড়ি। আমি কল্পনা করলাম, এর ড্রাইভারও নিশ্চয়ই চারপাশের এমন মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে বিমোহিত, তাই গাড়ি থামিয়ে এর সৌন্দর্যসুধা পানে ব্যস্ত একটু কাছে গিয়ে আসল ব্যাপার দেখে আমি মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। গাড়িটার একজন মাত্র যাত্রী, সে একটা সংবাদপত্র পড়ছে।

সংবাদপত্রটা এত বড় যে এটি তাকে তার চারপাশের দৃশ্য থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সাগর, পাহাড়, দ্বীপ ও দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমির বদলে লোকটা কেবল দেখছিল যুদ্ধ, রাজনীতি, কেলেঙ্কারি ও খেলাধুলা। সেই সংবাদপত্রটা বড় হতে পারে; কিন্তু খুব পাতলা, মাত্র কয়েক মিলিমিটার পুরু। কালো শুষ্ক নিউজপ্রিন্টের ওপাশে ছড়িয়ে আছে রঙধনুর রঙে ঝলমল করা প্রকৃতির উল্লাস। আমি ভাবলাম, ব্যাগ থেকে কাঁচি বের করে তার কাগজে ছোট একটা ফুটো করে দিলে কেমন হয়, যাতে করে সে দেখতে পারে, অর্থনীত সেই নিবন্ধ, যেটা সে পড়ছিল, তার ওপাশে কী আছে। কিন্তু সে ছিল বড়সড় লোমশ স্কটসম্যান, আর আমি একজন রোগাপটকা হাড্ডিসার ছাত্র। তাকে জগৎ সম্পর্কে পড়তে দিয়ে আমি নেচে নেচে এগিয়ে গেলাম।
আমাদের বেশির ভাগ অংশই সংবাদপত্রের মতো এমন বিষয় নিয়ে ভর্তি থাকে : সম্পর্কে টানাপোড়েন, পরিবার এবং কাজের ক্ষেত্রে রাজনীতি, ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারি, আর পাশবিক আনন্দের খেলাধুলা। যদি আমরা আমাদের মনের এই সংবাদপত্রটাকে সময়ে সময়ে নামিয়ে রাখতে না জানি, আমরা যদি তা

নিয়েই মেতে থাকি, আমরা যদি সেটাই জানি, তাহলে আমরা কখনোই প্রকৃতির সেই অকৃত্রিম ও খাঁটি সুখ-শান্তি উপভোগ করতে পারব না। আমরা কখনোই প্রজ্ঞাকে চিনতে পারব না।

বিজ্ঞতার সাথে খাওয়া

আমার বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন বাইরে খাওয়া পছন্দ করে। কোনো কোনো সন্ধ্যায় তারা খুব দামী কোনো রেস্তোরায় যায়, যেখানে তারা অসাধারণ সব খাবারের জন্য প্রচুর টাকা ঢালতে প্রস্তুত। কিন্তু খাবারের স্বাদ উপভোগ না করে সঙ্গী-সাথীদের সাথে কথাবার্তায় মন দিয়ে তারা খাবারের মজাটাই নষ্ট করে।

দারুণ কোনো অর্কেস্ট্রা চলাকালে কে কথা বলবে?
আপনার বকবকানি এমন সুমধুর সঙ্গীত উপভোগের পথে একটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে, আর খুব সম্ভবত আপনাকে বাইরে বের করে দেবে। এমনকি কোনো দারুণ মুভি দেখার সময়ও আমরা চাই না কেউ আমাদের বিরক্ত করুক। তাহলে লোকেরা খাওয়ার সময় কেন বাজে আলাপে ব্যস্ত থাকে?
যদি রেস্তোরাটা সাধারণ মানের হয়, তাহলে নিরস খাবার থেকে মন সরিয়ে নেওয়ার জন্য কথাবার্তা শুরু করা একটা ভালো বিকল্প হতে পারে। কিন্তু যখন খাবারটা খুব সুস্বাদু হয় আর খুব দামী হয়, তখন আপনার সঙ্গীকে চুপচাপ থাকতে বলাটা আপনার পুরো টাকাটা উসুল করে নেওয়ার জন্য মঙ্গলদায়ক। নিরবে খাওয়ার সময়ও আমরা প্রায়ই খাওয়ার আনন্দদায়ক মুহূর্তটাকে উপভোগ করতে ব্যর্থ হই। খাবার চিবানোর সময়ে আমাদের মন পড়ে থাকে এর পরে কী খাবো, কোনটা খাবো তা নিয়ে। কেউ কেউ তো পরবর্তী দুই তিন গ্রাসের খাওয়ার প্ল্যান করে বসে থাকে, এক গ্রাস নিজের মুখে, আরেক গ্রাস হাতে ধরা, আরেক গ্রাস তখন প্লেটে রেডি, আর মন তখন ভাবনায় ব্যস্ত তৃতীয় গ্রাসের পরে কী খাবে তা নিয়ে।

আমাদের খাবারের স্বাদ উপভোগের জন্য আর জীবনের পূর্ণতাকে জানতে আমাদের একবারে একেক মুহূর্ত নিরবে উপভোগ করা উচিত। তাহলেই আমরা জীবন নামের এই ফাইভ স্টার হোটেলে টাকার যথাযথ মূল্যের সেবা পেতে পারি।

সমস্যার সমাধান করা

বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে প্রায়ই আমাকে রেডিওতে লাইভ টক শোগুলোতে কথা বলতে হয়। সম্প্রতি এক রেডিও স্টেশন থেকে তাদের রাতের অনুষ্ঠানে কথা বলতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমার অবশ্য আরেকটু খোঁজখবর নিয়ে আমন্ত্রণটা গ্রহণ করা উচিত ছিল। স্টুডিওতে ঢোকার পরে তবেই আমাকে বলা হলো, আজকের প্রোগ্রামটা হচ্ছে ‘প্রাপ্তবয়স্কদের বিষয়’ নিয়ে। আমাকে সরসরি আজ শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আমার সাথে থাকবে একজন বেশ নামকরা, পেশাদার যৌন বিশেষজ্ঞ!

বিপত্তি দেখা দিল আমার নামের উচ্চারণ নিয়ে। অবশেষে সমাধান এলো, আমাকে সম্বোধন করা হবে মিস্টার মংক, অর্থাৎ জনাব ভিক্ষু নামে। তো, অনুষ্ঠানে আমি খুব ভালোভাবে উতরে গেলাম। আমি ব্রহ্মচারী ভিক্ষু। নারী- পুরুষের অন্তরঙ্গ বিষয়গুলো খুব কমই জানি। কিন্তু প্রশ্নকারীদের সমস্যাগুলোর

পিছনের কারণগুলো খুব সহজেই বুঝতে পারছিলাম আমি। শীঘ্রই সমস্ত ফোন কলগুলো আমাকে উদ্দেশ্য করে করা হতে লাগল। আর আমি দু ঘণ্টার টকশোর বেশির ভাগ উত্তর দিতে দিতে বেশ হাঁপিয়ে উঠলাম। অথচ মোটা অঙ্কের চেকটা গেল পেশাদার যৌন বিশেষজ্ঞের ঘরে। ভিক্ষু হওয়ায় আমি তো আর টাকা-পয়সা গ্রহণ করতে পারি না। তাই সর্বসাকুল্যে পেলাম একটা চকোলেট বার।

বৌদ্ধ জ্ঞানের আলোয় সমস্যা আরেকবার সমাধান হয়ে গেল। আপনি তো আর চেক খেতে পারবেন না। তাই সুস্বাদু চকোলেট বার খান। সহজ সমাধান। হুম! অন্য একবার রেডিওতে এমন অনুষ্ঠানের সময়ে এক শ্রোতা আমাকে প্রশ্ন করল, 'আমি বিবাহিত। আরেক মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক আছে যা আমার স্ত্রী জানে না। এটা কি ঠিক?' আপনি এর উত্তরে কী বলবেন?

আমি জবাব দিলাম, 'যদি এটা ঠিক হতো, আপনি আমাকে এই প্রশ্ন করার জন্য ফোন করতেন না।'
অনেকেই এমন প্রশ্ন করে বসে। তারা জানে যে তারা যা করছে তা ঠিক নয়। কিন্তু তাদের আশা যে, কোনো 'বিশেষজ্ঞ' তাদের বলে দেবে কাজটা ঠিক। মনের গভীরে বেশির ভাগ লোকই জানে কোনটা সঠিক, কোনটা ভুল। তবে কেউ কেউ মন দিয়ে শোনে না।

মন দিয়ে না শোনা

এক সন্ধ্যায় আমাদের বুড্ডিস্ট সেন্টারের ফোন বেজে উঠল। রাগী গলায় একজন জিজ্ঞেস করল, 'আজান ব্রাহ্ম আছে?' ফোন ধরেছিল একজন শ্রদ্ধাবতী এশিয়ান মহিলা। সে জবাব দিল, 'দুঃখিত, তিনি এখন তার রুমে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ত্রিশ মিনিট পরে ফোন করুন, প্লিজ।'

'গররর! সে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে মারা যাবে।' গর্জে উঠল অন্যজন আর খুট করে ফোন কেটে দিল।

বিশ মিনিট পরে আমি রুম থেকে বের হলাম। প্রৌঢ়া এশিয়ান মহিলাটি তখনো ফ্যাকাসে মুখে চেয়ারে বসে কাঁপছিল। অন্যরা তার চারপাশে জড়ো হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করছিল কী হয়েছে, কিন্তু সে এমন ভয় পেয়েছিল যে কথাও বলতে পারছিল না। আমি একটু মিষ্টি স্বরে তাকে অনুরোধ করতেই সে বলার সাহস পেল, 'কেউ একজন আপনাকে খুন করতে আসছে!'

আমি অনেক দিন ধরে এক অস্ট্রেলিয়ান যুবককে পরামর্শ দিতাম। তার এইডস রোগ ধরা পড়েছিল। আমি তাকে ধ্যান করা শিখিয়েছিলাম। আরও শিখিয়েছিলাম কী করে বিজ্ঞতার সাথে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। এখন তার মৃত্যু আসন্ন। আমি গতকালই তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, আর তার সঙ্গীর কাছ থেকে যেকোনো সময় একটা ফোনের আশায় ছিলাম। তাই আমি তাড়াতাড়ি বুঝে নিলাম ফোনকলটা কীসের। আমি নই, সেই এইডসে আক্রান্ত তরুণটিই মারা যাবে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে।

আমি তার বাড়িতে ছুটলাম, আর মৃত্যুর আগেই তার সাথে দেখা করতে পারলাম। সৌভাগ্যবশত ব্যাপারটা আমি সেই আতঙ্কিত হওয়া এশিয়ান

মহিলাটিকেও বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, তা না-হলে ভয়ে সে মরেই যেত।

কতবার এমন হয় যে, যা বলা হয় আর আমরা যা শুনি, তা এক নয়?

যা প্রজ্ঞা নয়

কয়েক বছর আগে থাই ভিক্ষুদের নিয়ে কয়েকটি কেলেঙ্কারির কথা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে দেখা গিয়েছিল। নিয়ম অনুসারে, ভিক্ষুদের কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। আমি যে ভিক্ষুসংঘের অন্তর্ভুক্ত, তাতে ভিক্ষুরা কোনো মহিলাকে শারীরিক স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। কৌমার্যব্রত সম্পর্কে যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে। ভিক্ষুণীদেরও কোনো পুরুষকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। সংবাদ মাধ্যমে যে সমস্ত কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোতে বলা হয়েছিল যে কিছু কিছু ভিক্ষু তাদের নিয়ম রক্ষা করে নি। তারা ছিল দুষ্ট ভিক্ষু। সংবাদ মাধ্যমগুলো জানত যে, তাদের পাঠকরা দুষ্ট ভিক্ষুদের সম্বন্ধে আগ্রহী। বিরক্তিকর, নিয়ম পালনকারী ভিক্ষুদের সম্বন্ধে নয়।

এসব ঘটনার সময় আমি মনে করলাম, আমার নিজেরও এই বিষয়ে স্বীকারোক্তি দেওয়া উচিত। তাই এক শুক্রবার সন্ধ্যায় পার্থে আমাদের বিহারে প্রায় তিনশত লোকের সামনে, তাদের অনেকেই ছিল আমাদের দীর্ঘদিনের সমর্থক, তাদের সামনে এই সত্যটা তুলে ধরার সাহস সঞ্চয় করলাম।
আমি শুরু করলাম, 'আমার একটা স্বীকারোক্তি দেওয়া দরকার, যদিও কথাটা সহজ নয়। কয়েক বছর আগে...' আমি বলতে গিয়ে ইতস্তত করলাম।
'... কয়েক বছর আগে,' আমি কোনোমতে বলতে লাগলাম, 'আমি আমার জীবনের কয়েকটা সবচেয়ে সুখময় মুহূর্ত কাটিয়েছি...' আমাকে আবার একটু থামতে হলো, 'আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সুখময় মুহূতর্গুলো কাটিয়েছিলাম... অন্য এক লোকের স্ত্রীর ভালেবাসাময় আলিঙ্গনের মধ্যে।' আমি সেটা বলে ফেললাম। আমি স্বীকারোক্তি দিলাম।

'আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিলাম, আদর দিয়েছিলাম, চুমু দিয়েছিলাম।' আমি কথা বলা শেষ করে মাথা হেঁট করে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমি শুনতে পাচ্ছিলাম বিস্ময়ে শ্রোতাদের মুখ দিয়ে বাতাস টেনে নেয়ার শব্দ। হতবাক হয়ে যাওয়া মুখে হাত চাপা দেওয়ার অস্ফুট শব্দ। কয়েকটা ফিসফিস কথা শুনলাম, 'না! না! আজান ব্রাহ্ম হতে পারেন না।' আমি কল্পনা করলাম অনেক দীর্ঘদিনের সমর্থকও দরজার দিকে হাঁটা ধরেছে, আর কখনো ফিরবে না তারা। গৃহী বৌদ্ধরাও তো অন্যজনের স্ত্রীর সাথে যায় না। এ যে রীতিমতো ব্যভিচার! আমি মাথা তুলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলাম।

আমি কেউ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই ব্যাখ্যা করলাম, 'সেই মহিলা, হ্যাঁ সেই মহিলাটি ছিল আমার মা। আমি তখন শিশু ছিলাম।' আমার শ্রোতারা হাসিতে ফেটে পড়ল, আর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি হইহুল্লোড়ের মাঝে মাইক্রোফোনে চিৎকার করলাম, ‘এটা সত্যিই তো!

সে ছিল অন্যজনের স্ত্রী। আমার বাবার স্ত্রী। আমরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছিলাম, আদর দিয়েছিলাম, চুমু দিয়েছিলাম। সেগুলো ছিল আমার জীবনের কয়েকটা সুখী মুহূর্ত ’

শ্রোতাদের চোখের পানি মোছার পালা শেষ হলে, আর হাসির পর্ব সমাপ্ত হলে আমি দেখিয়ে দিলাম যে, তাদের প্রায় সবাই আমাকে বিচার করেছে, কিন্তু ভুলভাবে বিচার করেছে। যদিও তারা আমার নিজের মুখ থেকেই শুনেছে কথাগুলো। আর কথাগুলো ব্যাখ্যাতীতভাবে সুস্পষ্ট ছিল। তবুও তারা ভুল সিদ্ধান্তটাকেই গ্রহণ করেছিল। সৌভাগ্যবশত, অথবা বলা যায়, খুব প্ল্যান মাফিক বলেছি বলেই, আমি তাদের ভুলটা ধরিয়ে দিতে পেরেছি। আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি, ‘কতবার, কতবার আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় নি আর সরাসরি এমন সব উপসংহারে পৌঁছে গেছি, যা পরিস্থিতি দেখে খুব সত্যি বলে মনে হলেও আসলে কেবল ভুল, মারাত্মকভাবে ভুল একটা উপসংহার ছিল?’

‘এটাই সঠিক, বাকি সব ভুল।’ এভাবে সবকিছু বিচার করাটা প্রজ্ঞা নয়।

খোলা মুখের বিপদ

আমাদের রাজনীতিবিদদের খোলাখুলি হওয়া নিয়ে বেশ খ্যাতি আছে। বিশেষ করে তাদের নাক ও থুতনির মাঝখানের অংশটা খোলাই থাকে। এটা বহু শতাব্দী ধরেই একটা ঐতিহ্য হিসেবে চলে আসছে। বৌদ্ধ জাতক কাহিনী থেকে আমরা নিচে এমন একটা গল্পের নমুনা পাই।

বহু শতাব্দী আগে এক রাজা তার এক মন্ত্রীকে নিয়ে হাফিয়ে উঠেছিলেন। রাজদরবারে যখনই কোনো বিষয়ে আলোচনা শুরু হতো, এই মন্ত্রী সেখানেই তার বক্তৃতা শুরু করে দিত, যা মনে হতো এই জনমেও শেষ হবার নয়। তার কথার মাঝে কেউই কথা বলার সুযোগ পেত না, এমনকি স্বয়ং রাজাও নয়। অধিকন্তু মন্ত্রী যা বলত তা এমন নিরস ছিল যে পিংপং বলের ভেতরটা দেখাও এর থেকে অনেক মজার বলে মনে হতো।

এমন একটা বিফল আলোচনার পরে, রাজা তার রাজদরবার থেকে দূরে শান্তিতে থাকার জন্য একটা বাগানে চলে গেলেন। বাগানের একটা জায়গায় একদল ছোট ছেলেমেয়ে উৎসাহভরে একটা মধ্যবয়স্ক পঙ্গু লোকের চারপাশে জড়ো হয়েছিল। ছেলেমেয়েরা তাকে কয়েকটা পয়সা দিয়ে একটা পাতাবহুল গাছ দেখিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে মুরগী চাইল। লোকটি তার ব্যাগ থেকে গুলতি ও নুড়ি পাথর বের করে গাছটির দিকে গুলতি ছুঁড়তে শুরু করল। সে দ্রুত গুলতি ছুঁড়ে গাছের পাতাগুলো ছেঁটে দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে গাছটিকে দেখতে মুরগীর মতো করে ফেলল। ছেলেমেয়েরা তাকে আরও কয়েকটা পয়সা দিল। একটা বড় ঝোপ দেখিয়ে দিয়ে হাতি চাইল। লোকটি গুলতি ছুঁড়ে দ্রুত ঝোপটিকে হাতির আকৃতি দিয়ে দিল। ছেলেমেয়েরা খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল, আর রাজা একটা আইডিয়া পেয়ে গেলেন।

রাজা পঙ্গু লোকটার কাছে গিয়ে তাকে প্রস্তাব দিলেন, তিনি তাকে স্বপ্নেরও অতীত ধনী বানিয়ে দেবেন যদি সে একটা ছোট্ট বিরক্তিকর সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। রাজা লোকটার কানে কানে ফিসফিস করে বলে দিলেন কী করতে হবে। লোকটি রাজি হয়ে মাথা ঝাঁকাল। রাজার মুখে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রথমবারের মতো হাসি ফুটে উঠল।

পরের দিন সকালে স্বাভাবিক নিয়মেই রাজদরবারের কাজ আরম্ভ হলো। একপাশের দেয়ালে যে নতুন পর্দা ঝোলানো হয়েছে তা কেউ লক্ষ করল না। সরকার করের পরিমাণ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করতে চায়। রাজা যেই না আলোচ্য বিষয়টি বলে দিলেন, অমনি সেই মুখ-চালু মন্ত্রী তার একক বক্তব্য শুরু করল। বলার জন্য মুখ খুলতেই সে অনুভব করল ছোট ও নরম কী যেন একটা গলায় ঢুকে গেল, আর পাকস্থলীতে নেমে গেল। সে তার বক্তব্য চালিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পরে নরম ও ছোট্ট কী যেন আবার মুখে ঢুকে গেল। সে এটাকে গিলে ফেলে আবার তার বক্তব্য শুরু করল। বক্তব্যের মাঝে মাঝে সে এভাবে বার বার গিলতে বাধ্য হলো; কিন্তু তাতে তার বলা থামল না। আধ ঘণ্টা ঝাড়া বক্তৃতার সময়ে কয়েক সেকেন্ড পর পর কী যেন গিলতে গিলতে সে খুব, খুব বমি বমি ভাব অনুভব করল। কিন্তু এমন একগুঁয়ে ছিল সে, যে তবুও তার বক্তৃতা থামল না। কয়েক মিনিট পরে তার মুখ রোগগ্রস্ত সবুজ রঙের হয়ে উঠল। তার পেট বমির জন্য মোচড় দিয়ে উঠল এবং অবশেষে সে তার বক্তৃতা শেষ করতে বাধ্য হলো। এক হাতে পেট, আরেক হাতে মুখ চেপে ধরে সে ছুটল কাছাকাছি কোনো বাথরুমের খোঁজে।

আনন্দিত রাজা পর্দাটা টেনে দিয়ে পঙ্গু লোকটিকে বের করে আনলেন যে গুলতি ও এক ব্যাগ গোলাবারুদ নিয়ে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ছিল। রাজা সেই বিরাট ও প্রায় খালি ব্যাগটি দেখে অদম্য হাসিতে ফেটে পড়লেন। ব্যাগটা ছিল মুরগীর বিষ্ঠাতে পূর্ণ যা বেচারা মন্ত্রীর খোলা মুখ লক্ষ করে নিখুঁতভাবে গুলতির সাহায্যে ছুঁড়ে মারা হয়েছে পর্দার আড়াল থেকে।

সেই মন্ত্রী দরবারে কয়েক সপ্তাহ ধরে আসল না। তার অবর্তমানে অনেক অসমাপ্ত আলোচনা শেষ করা গেল। যখন সে ফিরল, তখন বলতে গেলে একটা শব্দও বলল না। আর যখন তাকে বলতে হতো, সে সব সময় তার ডান হাতটা মুখের সামনে ধরে রাখত।
সম্ভবত, এই যুগের সংসদগুলোতে এমন নিখুঁত গুলতি নিক্ষেপকারী থাকলে অনেক কাজ হয়ে যেত।

বাচাল কচ্ছপ

হয়তো আমাদের জীবনের শুরুতেই নিরব থাকতে শেখা উচিত। এটা পরবর্তীকালে অনেক ঝামেলা এড়াতে সাহায্য করতে পারে। যেসব ছেলেমেয়ে আমাদের বিহারে আসে, আমি তাদের নিরব থাকার গুরুত্বটা বুঝাতে গিয়ে নিচের গল্পটা বলি।

অনেক দিন আগের কথা। কোনো এক পাহাড়ের পাদদেশে এক হ্রদে বাস করত এক বাচাল কচ্ছপ। যখনই তার অন্য কোনো প্রাণীর সাথে পরিচয় হতো, সে তাদের সাথে এত বেশি কথা বলত, আর এত দীর্ঘ সময় ধরে এবং বিরতিহীনভাবে কথা বলত যে, তার শ্রোতারা বিরক্ত হতো, এর পরে অধৈর্য হয়ে যেত। তারা প্রায়ই অবাক হত, কী করে এই বাচাল কচ্ছপটা কোনো দম না নিয়েই এত দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলে! তারা ভাবত, সে নিশ্চয়ই কান দিয়ে নিঃশ্বাস

নেয়, কেননা সে কখনোই তার কানগুলোকে শোনার জন্য ব্যবহার করে না। সে এমন বাচাল ছিল যে তাকে আসতে দেখলেই খরগোশগুলো তাদের গর্তে ঢুকে যেত, পাখিরা গাছের মাথায় উড়ে যেত, মাছেরা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে যেত। তারা জানত যে বাচাল কচ্ছপটা তাদের সাথে কথা বলা শুরু করলে তারা সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে যাবে। বাচাল কচ্ছপটা আসলে কিছুটা একা ছিল।

প্রতিবছর গ্রীষ্মে এক জোড়া রাজহাঁস সেই হ্রদে উড়ে আসত। তারা বেশ দয়ালু ছিল। কারণ, তারা কচ্ছপটাকে তার খুশিমতো কথা বলতে দিত। অথবা তারা জানত যে তারা তো মাত্র কয়েকমাস থাকবে এখানে। বাচাল কচ্ছপটা রাজহাঁসদের সঙ্গ খুব পছন্দ করত। সে তাদের সাথে কথা বলত যতক্ষণ না আকাশের তারারা নিভে যেত, আর রাজহাঁসরা ধৈর্যসহকারে শুনত তার কথা।

যখন গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে এলো, দিনগুলো ঠান্ডা হতে শুরু করল, রাজহাঁসেরা বাড়ি ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। বাচাল কচ্ছপটা কাঁদতে শুরু করল, সে শীতকালকে ঘৃণা করত, আর ঘৃণা করত তার বন্ধুদের সঙ্গ হারানোটা।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হায়, আমি যদি তোমাদের সাথে যেতে পারতাম! মাঝে মাঝে যখন পাহাড়ের ঢাল বরফে ঢেকে যায়, এই হ্রদটাও বরফে ছেয়ে যায়, আমার তখন এমন ঠান্ডা ও একা লাগে। আমরা কচ্ছপরা তো আর উড়তে পারি না। আর যদি হাঁটি, তো কিছুটা পথ যাওয়ার পরেই আবার ফিরে আসার সময় হয়ে যাবে, গরমকাল এসে যাবে। কেননা কচ্ছপরা হাঁটে খুব আস্তে ধীরে।'

দরাজ দিলের অধিকারী রাজহাঁসরা কচ্ছপটির এমন বিষণ্ণতায় খুব মর্মাহত হলো। তারা তাকে একটা প্রস্তাব দিল। 'প্রিয় কচ্ছপ, তুমি কেঁদো না। আমরা তোমাকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারি। তোমাকে কেবল আমাদের একটা কথা রাখতে হবে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, আমি কথা দিচ্ছি।' বাচাল কচ্ছপটা উত্তেজিত হয়ে বলল, যদিও সে তখনো জানত না কী কথা দিতে হবে। ' আমরা কচ্ছপরা সব সময় আমাদের কথা রাখি। আসলে আমার মনে আছে, খরগোশদের আমি মাত্র কয়েক দিন আগে কচ্ছপদের বিভিন্ন ধরনের খোলস সম্বন্ধে বলে কথা দিয়েছিলাম যে এবার থেকে নিরব হওয়ার চেষ্টা করব...'

এক ঘণ্টা পরে যখন বাচাল কচ্ছপটা তার কথা শেষ করল, তখন রাজহাঁসরা আবার কথা বলার সুযোগ পেল এবং তারা বলল, 'কচ্ছপ, তোমাকে অবশ্যই শপথ করতে হবে যে, তুমি তোমার মুখ বন্ধ রাখবে।'

বাচাল কচ্ছপটা বলে উঠল, 'সহজ ব্যাপার! আসলে আমরা কচ্ছপরা আমাদের মুখ বন্ধ রাখার জন্য বিখ্যাত। আমরা বলতে গেলে কথাবার্তা বলিই না। আমি সেদিন এই কথাটাই একটা মাছকে বুঝাতে চাইছিলাম...'
আরও এক ঘণ্টা পরে যখন বাচাল কচ্ছপটা দম নেওয়ার জন্য থামল, রাজহাঁসরা তাকে একটা লম্বা কাঠির মাঝখানে কামড়ে ধরে থাকতে বলল। আর পই পই করে বলে দিল যেন মুখ বন্ধ রাখে। এরপর রাজহাঁস দুটো কাঠির দুই মাথা ঠোঁট দিয়ে কামড়ে উড়ার জন্য পাখা ঝাপটাল আর ... কিছুই ঘটল না। বাচাল

কচ্ছপটা যে খুব ভারী ছিল। যারা বেশি কথা বলে, তারা বেশি খায়। আর কচ্ছপটা এমন মোটা ছিল যে, মাঝেমধ্যে নিজের খোলেও আটতো না। তখন রাজহাঁসরা হাল্কা একটা কাঠি বেছে নিল। কাঠির মাঝখানটা কচ্ছপ কামড়ে ধরল, দুমাথা কামড়ে ধরল দুই রাজহাঁস। তারা এমনভাবে পাখা ঝাপটাল যে জীবনেও এভাবে পাখা ঝাপটায় নি। এভাবে তারা উপরে উঠে গেল। তাদের সাথে উঠল লাঠি। লাঠির সাথে সাথে উপরে উঠে গেল কচ্ছপটাও।
পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথ মবারের মতো কোনো কচ্ছপ আকাশে উড়ল। তারা উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে গেল। বাচাল কচ্ছপের হৃদটা ছোট থেকে ছোট দেখাতে লাগল। এমন কি, এত বিশাল পাহাড়টাকেও এত দূর থেকে খুব ছোট বলে মনে হলো। সে এমন দারুণ দৃশ্য দেখছিল, যা দেখা এর আগে কোনো কচ্ছপের ভাগ্যে জোটে নি। সে সবকিছু মনে রাখার চেষ্টা করছিল। কেননা, বাড়ি ফিরলে সবাইকে এই ভ্রমণের কথা শোনাতে হবে তো!

তারা উড়ে গেল পাহাড়ের পর পাহাড়, সমভূমির পর সমভূমি। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল যখন বিকেল প্রায় তিনটার দিকে একটা স্কুলের ছেলেমেয়েরা হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এলো। একজন ছোট্ট ছেলে কী মনে করে উপরে তাকাল।

সে কী দেখল বলে আপনাদের ধারণা? একটা উড়ন্ত কচ্ছপ!

সে চিৎকার করে তার বন্ধুদের ডাকল, 'হেই! ওই বোকা কচ্ছপটাকে দেখো তো, উড়ে যাচ্ছে!'

কচ্ছপটা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। 'কাকে তুমি বো... কা ... বলছ!' ধড়াম করে মাটিতে আঁচড়ে পড়ল বাচাল কচ্ছপ। সেটাই ছিল তার অন্তিম বাণী।

বাচাল কচ্ছপটার মৃত্যু হয়েছিল। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সে তার মুখ বন্ধ রাখতে পারে নি।
তাই আপনি যদি যথাসময়ে নিরব থাকতে না শেখেন, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ সময় আসলেও মুখ বন্ধ রাখতে পারবেন না। আপনি তখন হয়তো বাচাল কচ্ছপের মতো ছিটকে পড়ে দ্বিখন্ডিত হয়ে যাবেন।

স্বাধীন কথা

আমি অবাক হয়ে যাই যে, আমাদের এই আধুনিক বাজার-চালিত অর্থনীতিতে কথা এখনো স্বাধীন। এটি অবশ্যই একটি সময়ের ব্যাপার মাত্র যখন টাকা দিয়ে বাঁধা পড়া সরকার কথাকেও একটি পণ্য বলে ভাববে, আর কথার উপর ট্যাক্স বসাবে।

একটু ভেবে দেখলে, আইডিয়াটা মন্দ নয়। নিরবতা তখন আবার দামী হয়ে উঠবে। কিশোর-কিশোরীরা আর কোনো ফোন নিয়ে মেতে থাকবে না। সুপার মার্কেটের লম্বা লাইনগুলো দ্রুত সরে যাবে। বিয়ে টিকবে দীর্ঘদিন, কেননা নবদম্পতি তর্কাতর্কির খরচটা বহন করতে পারবে না। আর এটা বেশ স্বস্তিদায়ক যে আপনার পরিচিতদের কারো কারো থেকে যথেষ্ট ট্যাক্স উঠবে, যা দিয়ে কানে শোনার যন্ত্র বিনামূল্যে বিতরণ করা যাবে সেই সমস্ত বধিরদের কাছে, যারা

এত দিনের কথার আক্রমণে কানে শোনার ক্ষমতা হারিয়েছে। করের বোঝা তখন কঠোর পরিশ্রমীদের বদলে কঠোর বক্তাদের উপর সরে যাবে। এমন দারুণ কর আদায় প্রকল্পের সবচেয়ে মহান করদাতা হবে রাজনীতিবিদরা। তারা যত বেশি সংসদে বক বক করবে, আমাদের হাসপাতাল ও স্কুলগুলোর জন্য তত বেশি টাকা উঠবে। কী স্বস্তিদায়ক চিন্তা!

সবশেষে, যারা এমন কর আদায়ের পরিকল্পনাকে অবাস্তব বলে ভাবতে চায় তাদের বলছি, কে এই প্ল্যানের বিপক্ষে মনেপ্রাণে বিতর্ক করতে চাইবে?

অষ্টম অধ্যায়

মন ও বাস্তবতা

ওঝা

নিচের ঘটনাটি থাইল্যান্ডের একটি সত্যি ঘটনা। এতে বিস্ময়কর আজান চাহ-র অলৌকিক প্রজ্ঞা পরিস্ফুটিত হয়েছে।

কাছের গ্রামের হেডম্যান তার এক সহকারী নিয়ে দ্রুত পায়ে আজান চাহ-র কুটিরে আসল। গত সন্ধ্যায় নাকি গ্রামের এক মহিলার উপরে খুব মারাত্মক ও শয়তানী এক ভূত এসে ভর করেছে। তারা কোনো উপায় না দেখে মহিলাকে এই মহান ভিক্ষুর কাছে নিয়ে আসছে। কথা বলতে বলতেই দূর থেকে মহিলাটির চিৎকার শোনা গেল।

আজান চাহ্ তৎক্ষণাৎ দুজন শ্রামণকে আগুন জ্বেলে পানি গরম করার নির্দেশ দিলেন। অন্য দুজন শ্রামণকে তার কুটিরের কাছেই একটা বড. গর্ত খুঁড.তে বললেন। কোনো শ্রামণই জানল না এর কারণ।

চারজন গ্রাম্য লোক, উত্তরপূর্বাঞ্চলের শক্তসমর্থ কৃষক, তারা চারজন সে স্ত্রীলোকটিকে ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছিল। যতই তারা তাকে এই পৃথিবীর পবিত্রতম বিহারগুলোর একটিতে তাকে টেনে নিয়ে আসছিল, ততই সে অশ্লীলভাবে চিৎকার করে গালিগালাজ করছিল।

আজান চাহ্ তাকে দেখেই শ্রামণদের বজ্রকণ্ঠে আদেশ দিলেন, 'তাড়াতাড়ি গর্ত খোঁড, পানি গরম কর তাড়াতাড়ি ! আমাদের বড. একটা গর্ত আর অনেক ফুটন্ত গরম পানি লাগবে।'

ভিক্ষুরা ও গ্রামবাসীরা কেউই বুঝতে পারল না আজান চাহ্ কী করতে যাচ্ছেন। আজান চাহ-র কুটিরের নিচে আনার পরে মহিলার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে শুরু করল। তার বিশাল রক্তচক্ষু যেন উন্মত্ততার ঘোরে বিস্ফারিত। আর তার মুখের অভিব্যক্তিতে চরম পাগলামির চিহ্ন দেখা দিল যখন সে আজান চাহ্-কে অশ্লীল ও নিষ্ঠুরভাবে গালাগালি আরম্ভ করল। এমন উন্মত্ত, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোনো মহিলাকে সামাল দিতে আরও লোক এসে যোগ দিল।

'গর্তটা এখনো খোঁড়া হয় নি? জলদি। পানি গরম করা হয়েছে? তাড়াতাড়ি!' আজান চাহ-র গলা মহিলার চিৎকার ছাপিয়ে সবার কানে ঢুকল, 'তাকে গর্তে ছুঁড়ে দিতে হবে। সেখানে তার উপর গরম পানি ফেলে দিতে হবে। এর পরে তাকে মাটিচাপা দিয়ে কবর দিতে হবে। এই খারাপ ভুতের হাত থেকে বাঁচার

এটাই একমাত্র উপায়। আরও জলদি খোঁড, আরও ফুটন্ত পানি আনো!'

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি যে কেউই নিশ্চিত বলতে পারে না, আজান চাহ্ কখন কী করে বসেন। তিনি ছিলেন অনিশ্চয়তার ভিক্ষুরূপ। গ্রামবাসীরা নিশ্চিত ভেবেছিল যে তিনি এই ভুতে পাওয়া মহিলাকে গর্তে ঠেলে দিয়ে সারা গায়ে গরম পানি ঢেলে দেবেন এবং মাটিতে পুঁতে ফেলবেন। তারা তাকে সেটা করতে দিতও। মহিলাটিও নিশ্চিতই এমন ভেবেছিল। কারণ, সে আস্তে আস্তে শান্ত হতে শুরু করল। গর্ত খোঁড়া এবং পানি গরম করা সম্পূর্ণ না হতেই সে শান্তভাবে আজান চাহ্-র সামনে বসেছিল, আর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার আগে খুব সুন্দরভাবে আশীর্বাদ নিল। কী দারুণ!

আজান চাহ্ জানতেন যে, ভূতে পাওয়া হোক বা পাগল হোক, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন শক্তিশালী কিছু একটা আছে, যাকে বলা হয় আত্মরক্ষার শক্তি। দক্ষতার সাথে এবং খুব নাটকীয়তার সাথে মহিলাটির মধ্যকার সেই আত্মরক্ষার শক্তির সুইচ টিপে দিয়েছিলেন তিনি, আর ব্যথা ও মৃত্যুর ভয় দিয়ে সেই ভূতকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রজ্ঞা এমনই হয়, যা অন্তর্যামী, পরিকল্পনাবিহীন, পুনর্বার তাকে অনুকরণ করা মুশকিল!

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস

আমার কলেজজীবনের বন্ধুর ছোট্ট এক কন্যা আছে, সেটি তার প্রাইমারি স্কুলের প্রথম বছর। তার শিক্ষক পাঁচ বছর বয়সী বাচ্চাদের গোটা ক্লাসকে জিজ্ঞেস করল :
'পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিসটা কী?' 'আমার বাবা' এক ছোট্ট মেয়ে বলে উঠল।

'হাতি' এক ছেলে উত্তর দিল, যে সম্প্রতি চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল।
'পর্বত' আরেকজন বলল।
আমার বন্ধুর ছোট্ট মেয়ে উত্তর দিল, 'আমার চোখ হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়।'

পুরো ক্লাস তার জবাব শুনে চুপ হয়ে এর মানে বুঝার চেষ্টা করতে লাগল। 'কেন বল তো?' তার শিক্ষক হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করল।
ছোট্ট দার্শনিক বলতে শুরু করল, 'দেখুন! আমার চোখ তার বাবাকে দেখতে পারে, একটা হাতিকেও দেখতে পারে, এটি একটি পর্বতকেও দেখতে পারে, সেই সাথে আরও কত কী দেখতে পারে। এত সব কিছু যখন আমার চোখের ভেতরে এঁটে যাচ্ছে, তখন আমার চোখটা অবশ্যই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস!'

প্রজ্ঞা কোনো শেখার বিষয় নয়, কিন্তু যা কখনো শেখানো যায় না, সেটাকে পরিষ্কার দেখাটাই প্রজ্ঞা।

আমার বন্ধুর সেই ছোট্ট কন্যার প্রতি অনেক শ্রদ্ধা রেখেই আমি তার এই অন্তর্দৃষ্টিকে আরেকটু বাড়িয়ে নেব, আপনার চোখ নয়, বরং আপনার মনই হচ্ছে

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস।

যা আপনার চোখ দেখে, তার সবকিছুই আপনার মন দেখতে পায়। আপনার কল্পনার চোখে এটি আরও অনেক বেশি দেখতে পায়। এটা শব্দকেও জানে, যা আপনার চোখ কখনো দেখে না। এটা স্পর্শকে জানে যা বাস্তব এবং কাল্পনিক উভয়ই হতে পারে। আপনার পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বাইরের বিষয়গুলোও মন জানে।

যেহেতু যা যা জানার বিষয়, তার সবকিছুই আপনার মনে এঁটে যায়। তাই আপনার মন অবশ্যই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জিনিস। মন সবকিছুকে ধারণ করে।

মনের খোঁজে

অনেক বিজ্ঞানী ও তাদের সমর্থকেরা এরূপ মত দেন যে, মন হচ্ছে ব্রেন থেকে উৎপন্ন তাই আমার দেশনা পর্ব শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয় : 'মন কি আছে? যদি থাকে, তাহলে কোথায়? এটি কি শরীরের মধ্যে? নাকি তার বাইরে? নাকি এটি সর্বত্রব্যাপী? কোথায় থাকে মন?'

আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাদের হাতেকলমে বুঝিয়ে দিই। আমি শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করি, 'যদি আপনারা এখন সুখী হন, তাহলে আপনার ডান হাত তুলুন, প্লিজ। যদি আপনারা অসুখী হন, সামান্য মাত্র অসুখী হলেও প্লিজ বাম হাতটা তুলুন।' বেশির ভাগ লোক তাদের ডান হাতটা তোলে, কেউ কেউ সত্যিই তোলে, বাকিরা অহংকারবশত হাত তোলে।

আমি বলতে থাকি, 'এখন, যারা সুখী তারা প্লিজ সেই সুখকে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে দিন। আর যারা অসুখী প্লিজ সেই অসুখী ভাবকে বাম হাতের তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে দিন। আমাকে দেখিয়ে দিন কোথায় আছে তারা।'

আমার শ্রোতারা তাদের আঙুলগুলোকে উদ্দেশ্যহীনভাবে উপরে-নিচে নিতে শুরু করে। এরপর তারা চারপাশের লোকজনের দিকে তাকায় যারাও তাদের মতো একইভাবে বিভ্রান্ত। ব্যাপারটা বুঝে ফেললে তখন তারা হাসে। সুখ বাস্তব। অসুখী ভাবটাও সত্যি। এই জিনিসগুলো যে আছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি এমন বাস্তব জিনিসগুলোকে আপনার দেহের কোথাও দেখিয়ে দিতে পারবেন না। দেহের বাইরেও পারবেন না, কোথাও পারবেন না। কারণ, সুখ এবং অসুখী ভাব হচ্ছে মনের একচেটিয়া রাজত্বের আওতায়। তারা মনের আওতায় থাকে। যেমনটি বাগানের ফুল ও ঘাসগুলো থাকে সেই বাগানেরই আওতায়। ফুল ও ঘাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে বাগান আছে। ঠিক একইভাবে সুখ ও অসুখী ভাবের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে মন আছে। সুখ ও অসুখী ভাবকে যে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় না, এই আবিষ্কারই আমাদের দেখিয়ে দেয় যে আপনি মনকে ত্রিমাত্রিক জগতে খুঁজে পাবেন না। প্রকৃতপক্ষে স্মরণ করুন যে, মন হচ্ছে এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জিনিস। তাই মন এই ত্রিমাত্রিক জগতের মধ্যে হতে পারে না। বরং ত্রিমাত্রিক জগৎটাই মনের মধ্যে বিরাজমান। মন হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জিনিস। এটি পুরো মহাবিশ্বকে ধারণ করে।

বিজ্ঞান

ভিক্ষু হওয়ার আগে আমি একজন বিজ্ঞানী ছিলাম। আমি ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় জেন ধর্মমতের বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে গবেষণা করছিলাম। বিজ্ঞান ও ধর্ম আমি দেখেছি যে, তাদের উভয়ের মধ্যে অনেক জিনিস কমন আছে, যার মধ্যে কমন হচ্ছে মতবাদ। আমার ছাত্রজীবনের দিনগুলোর একটা হাস্যকর প্রবাদ আমার মনে পড়ে। একজন বিজ্ঞানী কতটুকু সময় ধরে তার ফিল্ডের অগ্রগতিকে আটকে দিয়েছে, তা থেকে তার খ্যাতিকে পরিমাপ করা যায়!!

অস্ট্রেলিয়ায় বিজ্ঞান ও ধর্মবিষয়ক এক সাম্প্রতিক বিতর্কের যেখানে আমি একজন বক্তা ছিলাম, সেখানে শ্রোতাদের একজন একটি ক্ষুরধার মন্তব্য ছুঁড়ে দিল। সেই গোঁড়া ক্যাথলিক মহিলা বলল, 'যখন আমি টেলিস্কোপ দিয়ে তারাদের সৌন্দর্য দেখি, তখন আমি সব সময় অনুভব করি যে আমার ধর্ম হুমকির মুখে।'

আমি জবাব দিলাম, 'ম্যাডাম, যখন কোনো বিজ্ঞানী টেলিস্কোপের অন্য প্রান্তে চোখ রেখে আপনাকে দেখে, তখন সে অনুভব করে বিজ্ঞান এখন হুমকির মুখে?

নিরবতার বিজ্ঞান

বোধ হয় তর্কাতর্কি পুরোপুরি বন্ধ করাটাই ভালো। একটা বিখ্যাত প্রাচ্য প্রবাদ আছে এ রকম : 'যে জানে, সে বলে না। যে বলে, সে জানে না।'
প্রবাদটা হয়তো খুব গভীর বলে মনে হতে পারে; কিন্তু ভালোমতো ভাবলে একসময় আপনি দেখবেন যে এই প্রবাদ অনুসারে, যে এটা বলেছে, সে নিজেই জানে না।

অন্ধবিশ্বাস

বুড়ো হলে আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে, শ্রবণশক্তি কমে যায়, চুল পড়ে যায়, নকল দাঁত বাঁধাই করতে হয়, পা দুর্বল হয়ে যায়, হাত কাঁপে থরথর করে। কিন্তু আমাদের শরীরের একটা অংশ মনে হয় প্রতিবছর আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর সেটা হচ্ছে আমাদের বাচাল মুখ। এজন্যই আমাদের বেশির ভাগ কথাপ্রিয় নাগরিক বুড়ো বয়সে রাজনীতিবিদ হিসেবে বেশ নাম করতে পারে।

অনেক শতাব্দী আগে এক রাজা তার মন্ত্রীদের নিয়ে মহাসমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন। তারা এত তর্কাতর্কি করত যে, কোনো সিদ্ধান্তই বলতে গেলে নেওয়ার সময় হতো না। মন্ত্রীরা সেই চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রত্যেকেই দাবি করত যে তারা একাই সঠিক। আর বাকিরা সবাই ভুল। সে যা-ই হোক, যখন এই বুদ্ধিমান রাজা একটি বিশেষ উৎসবের আয়োজন করলেন, তখন সবাই একদিনের জন্য এতে যোগ দিতে রাজি হলো। সেই বর্ণাঢ্য উৎসবটা বিশাল এক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেখানে নাচ ছিল, গান ছিল, দড়িবাজি ছিল, ভাঁড় ছিল, সঙ্গীত ছিল, আরও কত কী ছিল! অতঃপর সেই লোকে লোকারণ্য স্টেডিয়ামে, মন্ত্রীরা যেখানে সবচেয়ে ভালো আসনে বসা, সেখানে রাজা তার রাজকীয় হাতিটাকে নিয়ে স্টেডিয়ামের মাঝখানে চলে এলেন। হাতির পেছনে এলো সাতজন অন্ধ, যারা এই শহরে জন্মান্ধ বলে পরিচিত।

রাজা প্রথমঅন্ধের হাত ধরে তাকে হাতির শুঁড় কেমন তা অনুভব করতে সাহায্য করলেন আর বললেন, এটা একটা হাতি। এর পরে তিনি দ্বিতীয় অন্ধকে হাতির দাঁত কেমন তা অনুভব করতে সাহায্য করলেন। তৃতীয়জনকে হাতির কান, চতুর্থজনকে মাথা, পঞ্চমজনকে শরীর, ষষ্ঠজনকে পা, সপ্তমজনকে লেজ। প্রত্যেককে তিনি বলে দিলেন যে এটা একটা হাতি। এর পরে তিনি প্রথম অন্ধের কাছে গিয়ে তাকে বড় করে বলতে বললেন হাতি কেমন।

'আমার বিশেষ বিবেচনা ও বিশেষজ্ঞ মত অনুযায়ী' প্রথমঅন্ধ ব্যক্তি শুঁড়কে অনুভব করে বলল, ''আমি পরম নিশ্চয়তার সাথে এই ঘোষণা দিই যে 'হাতি' হচ্ছে এক প্রজাতির সাপ, জেনাস পাইথন এশিয়াটিকস।''

'কী বাজে বকছ!' দ্বিতীয় অন্ধ অবাক হয়ে বলে উঠল। সে হাতির দাঁত অনুভব করে বলল, ''একটা 'হাতি' এমন শক্ত যে তা সাপ হতেই পারে না। আসলে প্রকৃত সত্য হচ্ছে- আর আমি কখনোই ভুল বলি না- যে এটি একটি কৃষকের লাঙ্গল।''

'কী হাস্যকর কথাবার্তা বলছ!' ব্যঙ্গ করে বলল তৃতীয় অন্ধ। সে হাতির কান অনুভব করে বলল, 'হাতি হচ্ছে তালপাতার পাখা।'
'তোমরা হাবাগোবার দল!'

চতুর্থ অন্ধ হেসে উঠল। সে মাথাটা অনুভব করে বলল, 'আসলে হাতি হচ্ছে একটি বড় পানির টাংকি।'

'অসম্ভব! চরম অসম্ভব!' হৈচৈ করে উঠল পঞ্চম অন্ধ। সে হাতির শরীর অনুভব করে বলল, 'হাতি হচ্ছে একটি বিরাট পাথর।'
'গরুর গোবর!'

ষষ্ঠ অন্ধ চিৎকার করে উঠল। সে হাতির পা অনুভব করে বলল, 'হাতি হচ্ছে একটি গাছের গুঁড়ি।'

'ওরে চুনোপুঁটির দল!' অবজ্ঞায় মুখ বাঁকাল সপ্তম অন্ধ। হাতির লেজটা অনুভব করে সে বলল, 'আমি তোমাদের বলছি, হাতি আসলে কী। এটি এক ধরনের ঝাড়ু। আমি জানি। আমি এটা নিজেই অনুভব করছি!'

'জঘন্য! এটা একটা সাপ।' 'হতেই পারে না! এটা টাংকি।' 'কোনো গতি রাখলে না দেখছি! এটা একটা... ' এভাবে অন্ধরা এমন উত্তপ্ত বাকবিতন্ডা শুরু করল যে শুধু তাদের হৈচৈয়ের শব্দ শোনা গেল। কথার সাথে সাথে তাদের হাতও চলল। যদিও কার গায়ে লাগছে সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিত নয়; কিন্তু এমন গরম সময়ে সেটা অত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তারা তাদের নিজ নিজ মতবাদের জন্য লড়াই করছিল, তাদের সততা ও পরম সত্যের পক্ষে লড়াই করছিল। সেটা ছিল তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিগত সত্য।

রাজার সৈন্যরা যখন আহত অন্ধ যোদ্ধাদের পৃথক করে নিয়ে যাচ্ছিল, স্টেডিয়ামের লোকজন তখন লজ্জায় চুপ হয়ে যাওয়া মন্ত্রীদের উদ্দেশে ব্যঙ্গ করছিল।

তারা প্রত্যেকেই ভালো করে বুঝতে পেরেছিল এই ঘটনার আড়ালে রাজা কী শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

আমাদের প্রত্যেকেই পুরো সত্যের ভগ্নাংশ মাত্র জানতে পারি। যখন আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞান নিয়ে সেই সত্যকেই পরম সত্য হিসেবে আকড়ে ধরি, আমরা তখন হয়ে যাই সেই অন্ধদের মতো, যারা হাতির এক একটা অংশ অনুভব করেই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিল যে তাদের আংশিক অভিজ্ঞতাই হচ্ছে আসল সত্যি, বাকিগুলো ভুল।

অন্ধবিশ্বাসের বদলে আমরা আলোচনায় বসতে পারি। কল্পনা করুন তো, রেজাল্টটা কেমন হবে যখন সেই সাতজন অন্ধ তাদের পরস্পরের তথ্যকে ভুল বলে প্রত্যাখান না করে বরং তাদের অভিজ্ঞতাগুলো একসাথে একত্র করল। তারা এই সিদ্ধান্তে আসবে যে হাতি হচ্ছে বিশাল পাথরের মতো একটা কিছু যা চারটি গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই পাথরের পিছনে একটা ঝাড়ু, সামনের দিকে একটা বড় পানির টাংকি, টাংকির দুপাশে দুটো তালপাতার পাখা, তার নিচে দুদিকে দুটো লাঙল আর মাঝখানে লম্বা একটা অজগর সাপ।

যে কখনো হাতি দেখে নি, তার জন্য হাতির এমন বর্ণনা মোটামুটি খারাপ হবে না।

নবম অধ্যায়

মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক জীবন

সবচেয়ে সুন্দর শব্দ

একজন অশিক্ষিত বৃদ্ধ লোক তার জীবনে প্রথমবার শহরে বেড়াতে গিয়েছিল।

সে বড় হয়েছিল একটা প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামে, কঠোর পরিশ্রম করে তার ছেলেমেয়েদের বড় করেছে। আর এখন সে তার ছেলেমেয়েদের আধুনিক বাড়িতে প্রথমবারের মতো বেড়াতে আসাটা উপভোগ করছে।

একদিন, শহরের চারপাশ ঘুরে দেখার সময় বৃদ্ধলোকটির কানে একটি শব্দ এসে বিঁধল। এমন সাংঘাতিক শব্দ সে তার নিরিবিলি পাহাড়ি গ্রামে কখনো শোনে নি। তাই সে এর কারণ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সেই কর্কশ শব্দের উৎস খুঁজতে খুঁজতে সে একটি বাড়ির পিছনে একটি রুমে চলে এলো, যেখানে একটি ছোট ছেলে বেহালা বাজানো প্র্যাকটিস করছে।

'ক্রিরিরিচ! ক্রেং!' বেসুরো শব্দে বেহালা আর্তনাদ করে উঠল।

বৃদ্ধ লোকটি যখন শুনল যে এটার নাম বেহালা, সে সিদ্ধান্ত নিলো যে, আর কখনো এমন জঘন্য জিনিসের বাজনা শুনতে চাইবে না।

পরের দিন শহরের অন্য এক এলাকায় বৃদ্ধ লোকটি একটা শব্দ শুনল যা মনে হলো তার বুড়ো কানগুলোকে আদর করছে। সে তার পাহাড়ি উপত্যকায় এমন মনোমুগ্ধকর সুর কখনো শোনে নি। তাই সে এর উৎস খুঁজে বের করতে মনস্থ করল। উৎস খুঁজতে খুঁজতে সে একটা বাড়ির সামনে এক রুমে গিয়ে হাজির হলো যেখানে এক বুড়ি বেহালায় একাই সুর তুলছিল।

মুহূর্তেই বৃদ্ধ লোকটি তার ভুল বুঝতে পারল। আগের দিন সে যে জঘন্য শব্দ শুনেছিল তা বেহালার দোষে নয়, বালকটির দোষেও নয়। ব্যাপারটা হলো ছেলেটাকে তার বাদ্যযন্ত্র ভালোমতো বাজাতে শেখাটা আরও শিখতে হবে।

সাধারণ লোকের প্রজ্ঞা নিয়ে বৃদ্ধ লোকটি ভাবল, একই ব্যাপার ঘটে ধর্মের ক্ষেত্রেও। কোনো ধর্মীয় ব্যাপারে উৎসাহী ব্যক্তিকে আমরা যখন দেখি সে তার বিশ্বাস নিয়ে অনেক দুর্দশা ভোগ করছে, তখন ধর্মকে দোষ দেওয়া ভুল। ব্যাপারটা এই যে, সেই শিক্ষানবীশের তার ধর্ম সম্বন্ধে জানার এখনো অনেক বাকি আছে। যখন আমরা কোনো সাধুসন্তের সংস্পর্শে আসি যে তার ধর্মে দক্ষ, সেটা এমন দারুণ অভিজ্ঞতা হয়, যা আমাদের অনেক বছর ধরে অনুপ্রাণিত করে,

তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন।

কিন্তু এতেই এই গল্পের শেষ নয়।

তৃতীয় দিন, শহরের অন্য এক প্রান্তে বৃদ্ধটি অন্য একটি শব্দ শুনতে পেল যা সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতায় সেই ওস্তাদ বেহালাবাদক বুড়িকেও ছাপিয়ে গেল। আপনি কী মনে করেন, সেই শব্দটা কী ছিল?

এটা ছিল বসন্তে পাহাড. থেকে নেমে আসা জলপপ্রাতের চেয়েও সুন্দর, শরতে বনে বনে বয়ে যাওয়া উচ্ছল হাওয়া থেকেও সুন্দর, অথবা ভারী বষর্ণ শেষে পাহাড়ি পাখিদের গান থেকেও সুন্দর। এটা এমনকি কোনো এক শীতের নিশীথে পর্বতের গুহায় বিরাজমান নিরবতার চেয়েও সুন্দর। সেই শব্দটা কী ছিল যা বৃদ্ধের হৃদয়কে অভূতপূর্ব নাড়া দিয়েছিল?

এটা ছিল একটি বড. অর্কেস্ট্রা (বাদকদল) যারা একটি সুর বাজাচ্ছিল। বৃদ্ধের জন্য এটি দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর শব্দ ছিল। কারণ, প্রথমত, এই অর্কেস্ট্রার প্রত্যেকটি সদস্য ছিল আপন আপন বাদ্যযন্ত্র বাজানোতে ওস্তাদ। আর দ্বিতীয়ত, তারা আরও শিখেছিল কীভাবে একসাথে সমান তালে বাজাতে হয়।
বৃদ্ধটি ভাবল, 'ধর্মের ক্ষেত্রেও এমন হোক! প্রত্যেকেই আমরা যেন জীবনের পাঠশালায় আমাদের বিশ্বাসের কোমল হৃদয়ের শিক্ষা পাই। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের ধর্মের মধ্যে মৈত্রীর এক একজন ওস্তাদ হই। আমাদের ধর্মকে ভালোভাবে শিক্ষা করে এবার আসুন আরেকটু এগোই এবং শিখি, অর্কেস্ট্রার সদস্যদের মতো, কীভাবে অন্যান্য ধর্মের সাথে একত্রে একই সুরে বাজাতে হয়।
সেটাই হবে সবচেয়ে সুন্দর শব্দ।

নামে কী আছে?

আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী যখন কেউ বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়, সে একটা নতুন নাম গ্রহণ করে। আমার ভিক্ষু নাম 'ব্রহ্মবংশ' (Brahmavamso), যা বেশি লম্বা হওয়ায় আমি সংক্ষেপে বলি ব্রাহম্ (Brahm) এখন প্রত্যেকে আমাকে এই নামে ডাকে। শুধু আমার মা বাদে। সে এখনো আমাকে পিটার নামেই ডাকে। আর আমিও বলি, সেই নামে ডাকার অধিকার তার আছে।

একবার বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর এক মিলনমেলায় আমন্ত্রণের জন্য আমাকে ফোন করা হলো, আর আমার নামটার বানান জানতে চাওয়া হলো। আমি জানিয়ে দিলাম :
B - হচ্ছে বুড্ডিস্ট
R- হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান
A - হচ্ছে অ্যাংলিকান খ্রিস্টান

H - হচ্ছে হিন্দু
M - হচ্ছে মুসলিম।
আমি এতে এমন ভালো সাড়া পেলাম যে এখন সাধারণত আমি আমার নামটা এভাবেই বানান করি। আর নামের অর্থটাও সেটাই।

পিরামিড শক্তি

১৯৬৯ সালের গ্রীষ্মকাল। আমার আঠারতম জন্মদিনের পরে প্রথমবারের মতো গ্রীষ্মমন্ডলীয় জঙ্গলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উপভোগ করছিলাম আমি। আমি ভ্রমণ করছিলাম গুয়াতেমালার ইউকাটান উপদ্বীপে। গন্তব্য হচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মায়া সভ্যতার কিছু পিরামিড যা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তখনকার দিনে ভ্রমণ ছিল খুব কষ্টকর। গুয়াতেমালা শহর থেকে টিকাল নামের সেই মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের দূরত্ব কয়েক শ কিলোমিটার। এটুকু পেরোতেই লেগে গেল তিন-চার দিন। আমি রেইনফরেস্টের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা ছোট নদীর উজানে পাড়ি দিলাম তেল চিটচিটে মাছ ধরার নৌকায় করে। মালপত্র বোঝাই ট্রাকে করে আকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে নেমে গেলাম কোনোমতে। আর ছোট জঙ্গলের পথ পাড়ি দিলাম লক্কর-ঝক্কর রিকশাতে। এটা ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চল, দরিদ্র এবং সেখানে তখনো ছিল আদি অকৃত্রিমরূপে।

যখন আমি অবশেষে সেই পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দির ও পিরামিডের বিস্তির্ণ এলাকায় এসে হাজির হলাম, তখন আমার সাথে কোনো গাইড ছিল না। গাইড বইও ছিল না, যা আমাকে বলে দেবে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এসব বিশাল বিশাল পাথরের স্থাপনার মানে কী। আশেপাশে কেউই ছিল না। তাই আমি উঁচু পিরামিডগুলোর একটাতে উঠতে শুরু করলাম। চূড়ায় উঠে এই পিরামিডগুলোর মানে এবং আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য হঠাৎ করেই পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।

গত তিন দিন ধরে আমি গহীন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে ভ্রমণ করেছি। পথঘাট, নদীনালাগুলো ছিল যেন সবুজ বনের আড়ালে থাকা সুড়ঙ্গের মতো। নতুন কোনো পথ হলেই তার আকাশ তাড়াতাড়ি ঢেকে যেত ডালপালার আড়ালে। আমি আকাশ দেখি নি অনেক দিন। দূরের জিনিস তো দেখতেই পারি নি। আমি ছিলাম জঙ্গলের মধ্যে। পিরামিডের চূড়ায় এসে আমি জঙ্গলে ঢাকা সবুজের চাদরের উপরে উঠে গেলাম। আমার সামনে শুধু যে ম্যাপের মতো ছড়িয়ে থাকা বিশাল বনভূমি দৃষ্টিগোচর হলো তা নয়। বরং এখন আমি সবদিকে দেখতে পেলাম। আমার আর অসীমের মাঝে জঙ্গল আর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হলো যেন পৃথিবীর পিঠে উঠে দাঁড়িয়েছি আমি। আমি কল্পনা করলাম সেই তরুণ মায়ান ইন্ডিয়ানদের কথা যারা জঙ্গলে জন্মেছে, বড় হয়েছে জঙ্গলে, সারা জীবন কাটিয়েছে জঙ্গলে। আমি তাদের কল্পনা করলাম কোনো এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। তারা একজন বৃদ্ধ জ্ঞানী ও পবিত্র ব্যক্তির হাত ধরে প্রথমবারের মতো এই পিরামিডের চূড়ায় উঠেছে। যখন তারা গাছপালার সীমা ছাড়িয়ে উপরে উঠে এলো, তাদের জংলী পৃথিবী যেন উন্মোচিত হলো চোখের সামনে। তাদের দৃষ্টি তখন সীমানা ছাড়িয়ে দিগন্তের ওপারে প্রসারিত। তারা দেখত তাদের উপরে ও চারপাশে ঘিরে আছে এক মহান শূন্যতা। পিরামিডের সেই চূড়ায় দাঁড়িয়ে পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানের দরজায়, সেখানে অন্য কোনো ব্যক্তি নেই, কোনো বস্তু নেই, কোনো শব্দ নেই, চারদিকে শুধু অসীমতা! তাদের মন সেই অবাক করা দৃশ্যে অনুরণিত হতো। সত্য প্রস্ফুটিত হতো আর জ্ঞানের সুবাস ছড়াত। তারা তাদের পৃথিবীতে নিজেদের স্থানকে বুঝে নিত। তারা তখন দেখে নিত সেই অসীমতাকে, সেই মুক্তির শূন্যতাকে, যা সবকিছুকে ঘিরে আছে। তাদের জীবন তখন জীবনের মানে খুঁজে পেত।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে আধ্যাত্মিক পিরামিড। আমাদের নিজেদের সেই পিরামিডে ওঠার জন্য সময় ও শান্তি যোগানো দরকার। কিছু সময়ের জন্য হলেও যাতে আমরা আমাদের জীবনের জটিলতার জঞ্জালের উর্ধ্বে উঠে যেতে পারি।
তখন আমরা আমাদের চারপাশের জগতে নিজেদের অবস্থানটা দেখতে পাব। আমাদের জীবনের গতিপথও দেখতে পারব, আর চারপাশের অসীমকে বিনা বাধায় উপলব্ধি করতে পারব।

মূল্যবান পাথর

কয়েক বছর আগে আমেরিকার একটি বিখ্যাত বিজনেস স্কুলে এক প্রফেসর তার গ্রাজুয়েট ক্লাসে সামাজিক অর্থনীতির উপরে এক অসাধারণ লেকচার দিয়েছিলেন। কোনো কিছু না বলে তিনি তার টেবিলে একটি কাচের জগ রাখলেন। এরপর বের করলেন এক ব্যাগ বড. বড. পাথর। পাথরগুলোকে তিনি একটা একটা করে জগে ঢুকাতে লাগলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আর কোনো পাথর ঢুকানো গেল না। তিনি তার ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘জগটি কি পূর্ণ? ’

‘হ্যাঁ’ তারা জবাব দিল।

প্রফেসর হেসে টেবিলের তলা থেকে দ্বিতীয় ব্যাগটা বের করলেন, ব্যাগে ছিল নুড়ি. পাথর। তিনি ছোট ছোট নুড়ি.গুলোকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ঢুকাতে লাগলেন জগের মধ্যে। সেগুলো বড. বড. পাথরগুলোর মাঝখানের ফাঁক পূর্ণ করল। দ্বিতীয়বারের মতো তিনি তার ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘জগটি কি পূর্ণ? ’

‘না’ তারা উত্তর দিল। তারা এবার তার মতলব ধরতে পেরেছে।

অবশ্যই তাদের জবাব সঠিক ছিল। কারণ, প্রফেসর এবার বের করলেন এক ব্যাগ বালি। তিনি বড. পাথর ও নুড়ি.গুলোর মাঝের ফাঁকগুলো বালি দিয়ে ভরতে সক্ষম হলেন। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘জগটি কি পূর্ণ? ’

‘সম্ভবত নয়, স্যার। আপনাকে আমরা জানি তো!’ ছাত্ররা জবাব দিল। তাদের উত্তরে হেসে প্রফেসর এবার বের করে আনলেন একটি ছোট পানির জগ। তিনি সেই পানি ঢাললেন পাথর , নুড়ি. ও বালিতে ভরা জগের মধ্যে। যখন পানিতে পূর্ণ হলো পাথরের জগটা, তিনি পানির জগটা নামিয়ে রেখে ক্লাসের দিকে তাকালেন।

তিনি তার ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘তো, এ থেকে কী শিখলে তোমরা?’ একজন ছাত্র বলল, ‘এর মানে হচ্ছে যে আপনার কাজের তালিকায় যতই ব্যস্ততা থাক, আপনি সব সময়ই তাতে কিছু না কিছু যোগ করতে পারবেন!’ বিজনেস স্কুলে কাজের কথাই তো আসবে!

কিন্তু প্রফেসর জোর দিয়ে নাকচ করে দিলেন ছেলেটার কথা, ‘না। এটা তোমাদের দেখাচ্ছে যে যদি তোমরা বড. পাথরগুলো জগে ঢুকাতে চাও, তাহলে

সেগুলোকে আগেভাগেই ঢুকাতে হবে।’

এটা ছিল অগ্রাধিকারের শিক্ষা, কাজগুলোকে গুরুত্ব অনুসারে করার শিক্ষা। তো, আপনার জগের বড় পাথরগুলো কী কী? আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী জিনিস চান আপনি? দয়া করে নিশ্চিত হোন যে সবচেয়ে ‘মূল্যবান পাথরগুলো’ তালিকার প্রথমে রেখে দিয়েছেন। আর তা না-হলে সেগুলোকে আর আপনার দিনের কাজের তালিকায় যোগ করার সুযোগই পাবেন না কখনো।

তখনই আমি সুখী হবো

সম্ভবত আগেভাগেই আমাদের জগে যে সবচেয়ে মহামূল্যবান পাথরটি ভরা উচিত তা হচ্ছে অন্তরের সুখ। আমাদের ভেতরে যখন কোনো সুখ থাকে না, অন্যকে দেওয়ার মতো সুখও তখন আমাদের থাকে না। তাহলে কেন বেশির ভাগ লোক সুখটাকে সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেয়? একেবারে জীবনের শেষ সীমায় গিয়ে তবেই পেতে চায়? (অথবা একেবারে শেষ সীমা ছাড়িয়ে তবেই সুখ চায়, যেমনটি ঘটেছে নিচের গল্পে)

আমার বয়স যখন চৌদ্দ, তখন আমি লন্ডনের এক হাইস্কুলে ও-লেভেল (এসএসসি) পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করছিলাম। আমার বাবা-মা ও শিক্ষকেরা আমাকে সন্ধ্যাবেলা ও সাপ্তাহিক ছুটিগুলোতে খেলা বন্ধ করতে উপদেশ দিলেন। তার চেয়ে আমি যেন বাড়িতে থাকি আর পড়াশুনার পেছনে সময়টা দিই। তারা আমাকে ব্যাখ্যা করলেন ও-লেভেল পরীক্ষাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর তাতে যদি ভালো করি, তাহলে আমিই সুখী হবো।

আমি তাদের উপদেশ অনুসরণ করলাম, আর পরীক্ষাতেও খুব ভালো করলাম। কিন্তু এটা আমাকে অতটা সুখী বানাল না, কেননা এই সাফল্যের ফলে আমাকে এর চেয়েও কঠোরভাবে পড়াশুনা করতে হবে আরও দু বছরের জন্য, এ-লেভেল (এইচএসসি) পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য।

আমার বাবা-মা ও শিক্ষকেরা এবার আমাকে সন্ধ্যায় ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে মেয়েদের পিছনে ছুটতে মানা করলেন। তার চেয়ে আমি যেন সময়টা বাড়িতে পড়াশুনা করে কাটাই। তারা আমাকে বুঝিয়ে বললেন, এ- লেভেল পরীক্ষাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর এমন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাতে যদি আমি ভালো করি, তাহলে আমিই নাকি সুখী হবো।

আরেকবার আমি তাদের উপদেশ মাথা পেতে নিলাম, আর পরীক্ষায়ও খুব ভালো করলাম। আরেকবার আমি খুব সুখী হতে পারলাম না। কারণ, এখন আমাকে সবচেয়ে বেশি করে পড়াশোনা করতে হবে, আরও তিনটি দীর্ঘ বছর ধরে ইউনিভার্সিটিতে একটি ডিগ্রির জন্য।

আমার মা ও শিক্ষকেরা (বাবা তখন মারা গেছেন) আমাকে মদের দোকান ও কলেজের পার্টি থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিলেন। তার বদলে পড়াশোনায় আরও কঠোর শ্রম দিতে বললেন। তারা আমাকে বললেন একটা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমি যদি এতে ভালো করি, তাহলে আমি খুব সুখী হবো।

এই পর্যায়ে এসে আমার একটু একটু সন্দেহ হতে লাগল। আমি আমার সিনিয়র কয়েকজন বন্ধুকে দেখলাম যারা খুব কঠোর পরিশ্রম করেছে, আর ডিগ্রি জুটিয়েছে। এখন তারা আরও কঠোর পরিশ্রম করছে তাদের প্রথম চাকরিতে। তারা চূড়ান্ত পরিশ্রম করে চলেছে টাকা জমা করার জন্য, যাতে সেই টাকা দিয়ে তারা কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কিনতে পারে, যেমন ধরুন একটা গাড়ি। তারা আমাকে বলত, 'যখন একটা গাড়ি কেনার মতো যথেষ্ট টাকা হবে, তখন আমি সুখী হবো।'

যখন তাদের যথেষ্ট টাকা হয়েছে আর গাড়িও কিনে ফেলেছে, তাতেও তারা সুখী নয়। তখন তারা আরও পরিশ্রম করছে অন্য একটা কিছু কেনার জন্য, যাতে তারা সুখী হবে। অথবা তারা এক জীবনসঙ্গীকে খুঁজতে গিয়ে রোমান্সের ঝড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। তারা বলত, 'যখন আমি বিয়ে করে কোথাও থিতু হবো, তখনই আমি সুখী হবো।'

বিয়ে করেও তারা সুখী হয় নি। তাদের আরও পরিশ্রম করতে হয়েছে, এমনকি অতিরিক্ত কাজও করতে হয়েছে, যাতে তারা কোনো একটা অ্যাপার্টমেন্ট বা ছোট একটা বাড়ি কেনার জন্য যথেষ্ট টাকা জমাতে পারে। তারা বলত, 'যখন আমাদের নিজস্ব একটা বাড়ি হবে, তখন আমরা সুখী হবো।'

দুঃখের বিষয়, বাড়ির লোনের জন্য মাসে মাসে তাদের বেতন থেকে টাকা কেটে রাখা হত, যা তাদের সুখী করল না। তার চেয়েও বড় কথা, এখন তারা একটা পরিবার শুরু করতে যাচ্ছে। এখন তাদের বাচ্চা হবে। বাচ্চারা রাতে তাদের ঘুম থেকে জাগাবে। তাদের জমানো টাকার সবটুকু খরচ হয়ে যাবে বাচ্চাদের পিছনে। আর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বেড়ে যাবে লাফিয়ে লাফিয়ে, সীমা ছাড়িয়ে। এখন তারা যা চায় তা করার জন্য আরও অন্তত বিশ বছর লাগবে। তাই তারা আমাকে বলত, 'যখন ছেলেমেয়েরা বড় হবে, বাড়ি থেকে বেরোবে, কোথাও থিতু হবে, তখনই আমরা সুখী হবো।'

ছেলেমেয়েরা যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, বেশির ভাগ বাবা-মা তখন অবসরের অপেক্ষায় থাকে। তাই তারা তাদের সুখকে আরও পিছিয়ে দেয়, তার বদলে তারা বৃদ্ধ বয়সের জন্য টাকা জমা করতে গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে থাকে। তারা বলে, 'যখন আমি অবসরে যাব, তখনই আমি সুখী হবো।'

অবসরের পরে তো বটেই, এর আগে থেকেই তারা একটু একটু ধার্মিক হতে থাকে, আর চার্চে যাওয়া শুরু করে দেয়। আপনি কি খেয়াল করেছেন, কতজন বৃদ্ধ লোক চার্চের বেঞ্চিগুলো জুড়ে থাকে? আমি তাদের জিজ্ঞেস করতাম কেন তারা এখন চার্চে যাচ্ছে? তারা আমাকে বলত, 'কারণ, যখন আমি মরব তখনই আমি সুখী হবো!'

যারা এ কথা বিশ্বাস করে যে, 'যখন আমি এটা পাব, তখনই আমি সখুী হবো' তাদের সুখ কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্ন মাত্র। এটি যেন একটা রংধনুর মতো। মাত্র দুই তিন পা পেরোলেই ধরা ছোঁয়া যাবে এমন। অথচ সেটা থাকে সব সময়ই ধরাছোঁয়ার বাইরে। তারা তাদের জীবনে অথবা এর পরে কখনোই সুখ পাবে না।

মেক্সিকান জেলে

এক নিরিবিলি মেক্সিকান জেলেপাড়ায় ছুটি কাটাতে গিয়েছিল এক আমেরিকান। সে এক স্থানীয় জেলেকে দেখছিল যে তার সকালে ধরা মাছগুলো নৌকা থেকে তীরে নামিয়ে রাখছে। আমেরিকানটা ছিল আমেরিকার এক নামী দামী বিজনেস স্কুলের সফল একজন প্রফেসর। সে বেচারা মেক্সিকান জেলেকে বিনামূল্যে কিছু উপদেশ না দিয়ে পারল না।

আমেরিকানটা আলাপ শুরু করল, 'এই যে! এত সকাল সকাল মাছ ধরা শেষ করছ যে?'

'কারণ, আমি যথেষ্ট মাছ ধরেছি, সিনর।' জবাব দিল অমায়িক মেক্সিকান। 'এতে আমার পরিবারের খাওয়ার জন্য যথেষ্ট মাছ আছে। বাড়তি সামান্য মাছ আমি বিক্রি করে দেব। এখন আমি আমার স্ত্রীসহ একসাথে দুপুরের খাবার খাব। আর দুপুরে একটা ঘুম দিয়ে বিকেলে বাচ্চাদের সাথে খেলব। এরপর রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে একটু পানশালায় যাব। সেখানে বন্ধুদের সাথে সামান্য মদ পান করব আর গিটার বাজাব। এটাই আমার জন্য যথেষ্ট সিনর।'
প্রফেসর বলল, 'বন্ধু, আমার কথা শোন। তুমি যদি সাগরে বিকেল পর্যন্ত থাক, তাহলে সহজেই দ্বিগুণ মাছ ধরতে পারবে। সেই মাছগুলো বিক্রি করে টাকা জমাতে পারবে। ছয় মাস কি নয় মাসের মধ্যে তুমি সেই জমানো টাকায় এর চেয়ে বড় ও ভালো একটা বোট কিনতে পারবে। সাথে দুয়েকজন লোকও ভাড়া করতে পারবে। তখন তুমি চারগুণ বেশি মাছ ধরতে পারবে। এ থেকে কী পরিমাণ লাভ হবে, একটু ভাবো তো! এক কি দু বছরের মাথায় আরেকটা মাছ ধরার বোট কিনে ফেলার মতো টাকা হয়ে যাবে তোমার। সাথে আরও লোকজন ভাড়া করতে পারবে। তুমি যদি এই ব্যবসার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করো, তাহলে ছয় কি সাত বছরের মাথায় বিরাট একটা নৌকাবহরের মালিক হবে তুমি। একটু কল্পনা করে দেখো না!

তখন তুমি তোমার প্রধান কার্যালয়কে মেক্সিকো সিটি অথবা লস এনজেলসে নিয়ে যাবে। সেখানে তিন চার বছর পরেই তুমি স্টক মার্কেটে তোমার কোম্পানির শেয়ার ছাড়বে। সেই কোম্পানিতে তুমি হবে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)। তোমার থাকবে মোটা অঙ্কের বেতন, আর শেয়ারের সুবিধা। এবার শোন! আরও কয়েক বছর বাদে তুমি তোমার কোম্পানীর শেয়ারগুলো কিনে ফেলবে ঝটপট, যা তোমাকে কোটিপতি বানিয়ে দেবে! এক্কেবারে গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি! আমি আমেরিকার একটি বিজনেস স্কুলের বিখ্যাত প্রফেসর। এসব ব্যাপার আমি ভালোই জানি।'

মেক্সিকান জেলে মন দিয়ে শুনল আমেরিকান লোকটার কথা। যখন প্রফেসর তার কথা শেষ করল, তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু সিনর প্রফেসর, এত কোটি কোটি ডলার দিয়ে আমি কী করব?'

অবাক করার মতো ব্যাপার, আমেরিকান প্রফেসর তার ব্যবসার পরিকল্পনায় এই ব্যাপারটা মাথায় রাখে নি। সে তাড়াতাড়ি ভেবে নিল কোটি কোটি ডলার দিয়ে একজন মানুষ কী করবে।

‘এমিগো! (বন্ধু) এত টাকা হলে তুমি তখন অবসর নিতে পারবে। জ্বি হ্যাঁ, সারা জীবনের জন্য আর কাজ করতে হবে না। তুমি ছোট একটা মনের মতো বাড়ি কিনতে পারবে। ছবির মতো সাজানো গোছানো এমন এক জেলে পল্লীতে। সকালে মাছ ধরার জন্য ছোট একটা নৌকাও কিনতে পারবে তুমি। তোমার স্ত্রীর সাথে প্রতিদিন দুপুরের খাবার খেতে পারবে। নির্ভাবনায় দুপুরের ঘুমটা সেরে নিতে পারবে। বিকেলে বাচ্চাদের সাথে দারুণ সময় কাটাতে পারবে। আর সন্ধ্যায় খাওয়ার পরে বন্ধুদের সাথে গিটার বাজাতে পারবে আর মদ্য পান করতে পারবে। জ্বি হ্যাঁ, এত টাকা দিয়ে হে আমার বন্ধু, তুমি কাজ থেকে অবসর নিতে পারবে, আর নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারবে।’

‘কিন্তু সিনর প্রফেসর, আমি তো এখন এগুলোই করে থাকি।’

কেন আমরা বিশ্বাস করি যে সন্তুষ্টি খুঁজে পাওয়ার আগে আমাদের প্রথমে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে আর ধনী হতে হবে?
যখন আমার সব ইচ্ছে পূর্ণ হবে আমার ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা টাকা গ্রহণ, রাখা বা লেনদেন করতে পারে না, তা সে যে ধরনেরই হোক। আমরা এত গরিব যে সরকারের পরিসংখ্যান আমাদের কারণে তালগোল পাকিয়ে যায়। আমরা মিতব্যয়ী হয়ে চলি, গৃহী ভক্তদের কাছ থেকে যে সামান্য দান পাই, তাও আমরা মুখ ফুটে চাইতে পারি না। কালেভদ্রে অবশ্য বিশেষ কিছু দান দেওয়া হয় আমাদের।

আমি এক থাই লোককে তার ব্যক্তিগত সমস্যা বিষয়ে সাহায্য করেছিলাম। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সে বলল, ‘স্যার, আমি আপনাকে কিছু একটা দিতে চাই আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। পাঁচশ বাথের মধ্যে আমি আপনার জন্য কী কিনে দিতে পারি?’ এমন দান দেওয়ার সময় টাকার অঙ্কটা বলা স্বাভাবিক, এতে করে ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো যায়।

আমি তৎক্ষণাৎ ভেবে বের করতে পারলাম না আমি কী চাই। সেও বেশ তাড়ার মধ্যে ছিল। তাই আমি বললাম, পরের দিন সকালে আমি তাকে জানাব। সে রাজি হলো।

এই ঘটনার আগে আমি ছিলাম একজন ছোট্ট সুখী সন্ন্যাসী। এখন আমি ভাবতে শুরু করলাম আমি কী চাই। আমি একটা তালিকা তৈরি করলাম। তালিকাটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। পরে দেখা গেল, পাঁচশ বাথে কুলাচ্ছে না। তালিকা থেকে কিছু একটা যে বাদ দেব, তারও উপায় নেই। চাওয়াগুলো যেন হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে প্রয়োজনের রূপ ধরে অনড় হয়ে বসে আছে! তালিকাটা বাড়তেই থাকল। একসময় পাঁচ হাজার বাথেও কুলাল না।
কী হচ্ছে দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম তালিকাটা। পরের দিন আমি সেই লোকটিকে বললাম সে যেন পাঁচশ বাথ বৌদ্ধ বিহার উন্নয়নের কাজে অথবা অন্য কোনো ভালো কাজে দান করে দেয়। আমি ওগুলো চাই না। আমি সবচেয়ে যা চাই তা হলো গতকালের আগের দিন আমার যে সন্তুষ্টি ছিল তা আমি ফিরে পেতে চাই। যখন আমার কোনো টাকা ছিল না, কোনো কিছু পাওয়ারও উপায় ছিল না, তখনই আমার সব আশা পূর্ণ হয়েছিল।

চাওয়ার কোনো শেষ নেই। একশ কোটি বাথেও কুলায় না। কুলায় না একশ কোটি ডলারেও। কিন্তু চাওয়া থেকে মুক্তির একটা শেষ আছে। আপনি যখন

কিছুই চান না, তখনই এর শেষ। কেবল সন্তুষ্টির সময়ই আপনি বলতে পারেন, আপনার যথেষ্ট আছে।

দশম অধ্যায়

স্বাধীনতা ও নম্রতা

দুই ধরনের স্বাধীনতা

আমাদের পৃথিবীতে দু ধরনের স্বাধীনতা আছে : আকাঙক্ষার স্বাধীনতা এবং আকাঙক্ষা হতে স্বাধীনতা।

আমাদের আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতি কেবল প্রথমটাকে জানে : আকাঙক্ষার স্বাধীনতা। এই সংস্কৃতি তাই জাতীয় সংসদের সামনে সুউচ্চ বেদীতে এবং মানবাধিকারের আইনের মাধ্যমে এমন স্বাধীনতাকে পূজো করে। বলা যায় যে, বেশির ভাগ পশ্চিমা গণতন্ত্রের পিছনের মতবাদ হচ্ছে তাদের জনগণের আকাঙক্ষাগুলো বুঝতে পারার স্বাধীনতাকে রক্ষা করা, যতদূর সম্ভব। এটা বলা চলে যে এমন দেশের জনগণ খুব একটা স্বাধীন বলে অনুভব করে না।

দ্বিতীয় ধরনের স্বাধীনতা হচ্ছে আকাঙক্ষা হতে স্বাধীনতা, যা কেবল কয়েকটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উদযাপন করা হয়। এতে তারা শ্রদ্ধা জানায় সন্তুষ্টি ও শান্তিকে, যা আকাঙক্ষা থেকে মক্ত । এটা বলা চলে যে এমন সংযমী সমাজে লোকজন স্বাধীন বলে অনুভব করে, উদাহরণ হিসেবে আমার এই বিহারের কথা বলা যায়।

আপনি কোন ধরনের স্বাধীনতা পছন্দ করেন?

দুজন খুব উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভী থাই ভিক্ষুকে তাদের এক ভক্তের বাড়িতে সকালের নাস্তা খাওয়ার আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। তারা দুজন সেই বাড়িতে ড্রয়িং রুমে বসে অপেক্ষা করছিল। সেই রুমে ছিল একটি একুয়ারিয়াম, যেখানে অনেক ধরনের মাছ ছিল। সেটা দেখে কনিষ্ঠ ভিক্ষু অভিযোগ করল যে, একুয়ারিয়ামে মাছ রাখা বৌদ্ধ মতবাদের মৈত্রীর বিরোধী। এটা যেন তাদের কারাগারে রেখে দেওয়া। সেই মাছটা এমন কী করেছে, যার জন্য তাকে এই গ্লাসের দেয়ালবেষ্টিত জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে? তারা থাকবে নদীতে, খালে, বিলে যেখানে তারা সাঁতার কাটবে মুক্ত হয়ে, যেখানে খুশি সেখানে যাবে। দ্বিতীয় ভিক্ষুটা কিন্তু এতে একমত হলো না। এটা সত্যি, সে মানল যে এই মাছগুলো তাদের আকাঙক্ষা অনুযায়ী কাজ করবে এমন স্বাধীন নয়। কিন্তু এমন মাছের টাংকিতে থাকাটা তাদের অনেক বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছে। তাদের স্বাধীনতার একটা তালিকা তৈরি করল সে।

১. তুমি কী কোনো জেলেকে কারো বাড়ির একুয়ারিয়ামে বড়শির টোপ ফেলতে দেখেছ? না। তাই টাংকিতে থাকার প্রথম স্বাধীনতা হলো জেলেদের হাতে পড়ার বিপদ থেকে মুক্তি। কল্পনা করো খালে বিলে থাকা একটা মাছ হলে কী অবস্থা হবে। যখন তারা টসটসে কোনো পোকা অথবা রসালো এবং মোটা একটা মাছিকে দেখতে পায়, তারা কখনোই নিশ্চিত হতে পারে না যে সেটা খাওয়া নিরাপদ হবে কি হবে না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তারা অনেকবার তাদের অনেক বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনকে এমন সুস্বাদু পোকা প্রাণভরে খেতে দেখেছে, আর পরক্ষণেই তারা সারা জীবনের জন্য পানির উপরে

অদৃশ্য হয়ে গেছে। উন্মুক্ত পানির মাছের জন্য খাওয়াটা বিপদে পরিপূর্ণ আর প্রায়ই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এর পরিসমাপ্তি ঘটে। খাওয়াটাও হয় ভীষণ উদ্বেগপূর্ণ প্রত্যেকবার খাবারের বেলায় এমন উদ্বেগজনিত কারণে সকল মাছ নিশ্চিতভাবেই দীর্ঘস্থায়ী বদহজমে ভুগে থাকে।
যারা বেশি সন্দেহবাতিকগ্রস্থ তারা তো নির্ঘাত উপোস থেকেই মরে যাবে। বুনো মাছগুলো সম্ভবত মানসিক রোগী। কিন্তু টাংকির মাছগুলো এমন বিপদ থেকে মুক্ত ও স্বাধীন।

২. বুনো মাছগুলোকে অন্যান্য বড. বড. মাছখেকো মাছ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হয়। বর্তমানে কয়েকটি শুকিয়ে যাচ্ছে এমন নদীতে তো রাতের বেলা কোনো অন্ধকার খাঁড়িতে যাওয়াই নিরাপদ নয়! অথচ কোনো মালিকই কিন্তু তাদের টাংকিতে এমন মাছ রাখবে না যারা একে অপরকে ধরে ধরে খায়। তাই টাংকির মাছগুলো এমন মাংসাশী মাছের বিপদ থেকে স্বাধীন।

৩. প্রকৃতির করাল চক্রে পড়ে. বুনো মাছগুলোকে মাঝেমধ্যে পেটে কোনো দানাপানি ছাড়াই থাকতে হয়। কিন্তু টাংকির মাছের জন্য এটা যেন অনেকটা কোনো হোটেলের পাশে থাকার মতো। দিনে দুবার তাদের দরজায় পৌঁছে দেওয়া হয় সুষম খাবার যা বাসায় বসে পিৎজা ডেলিভারি পাওয়া থেকেও অনেক সুবিধাজনক, কেননা তাদের তো কোনো টাকা- পয়সা দিতে হয় না। তাই টাংকির মাছগুলো বিপদ থেকে স্বাধীন।

৪. ঋতু পরিবর্তনের ফলে নদীনালা, খালবিলগুলোর তাপমাত্রাও চরমভাবে উঠানামা করে। শীতকালে এমন ঠান্ডা পড়ে. যে কোথাও হয়তো বরফে ঢেকে যায় এসব নদীনালা। গরমকালে সেগুলো হয়তো মাছদের জন্যও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সেগুলো এমনকি শুকিয়েও যায়। কিন্তু টাংকির মাছগুলোর জন্য আছে এসির আবহাওয়া। সেখানে পানির তাপমাত্রা থাকে সমান এবং আরামদায়ক, সারা দিন ও সারা বছর জুড়ে। তাই গরম ও ঠান্ডার বিপদ থেকে টাংকির মাছেরা স্বাধীন।

৫. বন্য পরিবেশে, মাছদের কোনো রোগবালাই হলে তাদের চিকিৎসার কেউ থাকে না। কিন্তু টাংকির মাছদের আছে বিনামূল্যে চিকিৎসাসুবিধা। তাদের কোনো অসুখ-বিসুখ দেখা দিলেই গৃহকর্তা ফোন করে একজন মাছের ডাক্তার ডেকে আনবে। তাদের এমনকি কোনো ক্লিনিকেও যেতে হয় না। তাই টাংকির মাছেরা স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির বিপদ থেকে মুক্ত।

দুজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সেই দ্বিতীয় ভিক্ষুটা এবার তার যুক্তিগুলোর একটা সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরল। সে বলল, একুয়ারিয়ামের মাছ হওয়ার অনেক সুবিধা। এটা সত্যি যে তারা তাদের আকাঙক্ষা অনুযায়ী স্বাধীন নয়, এখানে-ওখানে ইচ্ছেমতো সাঁতার কাটতে পারে না। কিন্তু তারা অনেক বিপদ-আপদ ও ঝামেলা থেকে স্বাধীন। জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুটি আরও বলল যে, মানুষের মধ্যে যারা ধার্মিক জীবন যাপন করে, তাদের অবস্থাও এ রকম। সত্যি কথা যে তারা তাদের আকাঙক্ষা অনুযায়ী স্বাধীন নয়, এখানে-ওখানে নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে পারে না। কিন্তু তারা অনেক বিপদ-আপদ ও ঝামেলা থেকে স্বাধীন।
আপনি কোন ধরনের স্বাধীনতা পছন্দ করেন?

আমার একজন বন্ধু ভিক্ষু কয়েক সপ্তাহ ধরে ধ্যান প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল পার্থের নিকটে অবস্থিত একটি নতুন সর্বোচ্চ নিরাপত্তার জেলখানায়। কয়েদিদের ছোট দলটি ভিক্ষুটিকে ভালো করে চিনত ও শ্রদ্ধা করত। একবার ধ্যানের পালা শেষ হলে তারা তাকে বৌদ্ধ বিহারের রুটিন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল।

সে বলতে শুরু করল, 'আমাদের প্রত্যেক দিন সকাল চারটায় উঠতে হয় ঘুম থেকে। মাঝে মাঝে খুব ঠান্ডা লাগে। কারণ, আমাদের ছোট ছোট রুম, সেখানে কোনো রুম হিটার নেই। আমরা দিনে কেবল একবারই খাই, খাবার দাবার যা কিছু পাই, সব একসাথে একটা পাত্রে মিশিয়ে খাই ওই একবারই। বিকেলে ও রাতে আমরা কিছুই খেতে পারি না। অবশ্যই সেখানে কোনো সেক্স নেই, মদের ব্যাপার নেই, আমাদের কোনো টেলিভিশন নেই, রেডিও নেই। গান শোনার কিছু নেই। আমরা কখনোই ফিল্ম দেখি না। আর আমরা খেলাধুলাও করতে পারি না। আমরা কথা বলি কম কম, কঠোর পরিশ্রম করি, আর অবসর সময়টা ধ্যানে বসে নিঃশ্বাসের দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকি। আমরা মেঝেতে ঘুমাই।'

জেলের বন্দীরা আমাদের এমন কঠোর অনাড়ম্বর সন্ন্যাসজীবনের বর্ণনা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। এর তুলনায় তাদের এই উচ্চ নিরাপত্তার জেলখানাটা পাঁচতারা হোটেলের মতো মনে হলো। প্রকৃতপক্ষে তাদের একজন কয়েদী তার এই ভিক্ষু বন্ধুর এমন দুর্দশা শুনে এমন করুণার্দ্র হয়ে উঠল যে, সে ভুলে গেল যে সে কোথায় আছে, আর বলে বসল : 'তোমার বিহারে থাকাটা তো খুবই ভয়ঙ্কর! তুমি এখানে এসে আমাদের সাথে থাকো না কেন?'

ভিক্ষুটি আমাকে পরে বলেছিল যে, এই কথা শুনে রুমের সবাই তো হেসে খুন। সে যখন কাহিনীটা আমাকে বলেছিল আমিও এমন হেসেছিলাম। পরে আমি একটু গভীরভাবে ভাবতে শুরু করলাম। এটা সত্যি যে সমাজের দুষ্কৃতকারীদের জন্য বানানো সেই কঠিন জেলখানাগুলো থেকে আমার এই বিহারটা অনেক অনেক গুণ সাদামাটা, তবুও অনেকেই স্বেচ্ছায় এখানে থাকতে আসে, আর এখানে তারা সুখী। অথচ এমন সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন জেলখানা থেকে অনেকেই পালাতে চায়। তারা সেখানে অসুখী। কেন?

কারণ, আমার বিহারে সতীর্থরা এখানে আসতে চায়, আর জেলখানায় সেখানে সতীর্থরা যেতে চায় না। পার্থক্যটা এখানেই।

আপনি যেখানে থাকতে চান না, সেখানে শত সুযোগ-সুবিধাই থাকুক না কেন, আপনার জন্য তা কারাগার। 'কারাগার' হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যেখানে আপনি থাকতে চান না। এটাই কারাগার শব্দের আসল অর্থ যদি আপনি এমন একটা চাকরি করেন, যেখানে আপনি থাকতে চান না, তাহলে আপনি তখন কারাগারে আছেন। যদি আপনি এমন কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন, যা আপনি চান না, আপনি তখন কারাগারে আছেন। যদি আপনি অসুস্থ ও পীড়িত দেহে থাকেন যা আপনি চান না, সেটাও তখন আপনার জন্য একটা কারাগার।

কারাগার হচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতি যা আপনি চান না।

তো, আপনি কীভাবে জীবনের এই কারাগারগুলো থেকে পালাবেন? সহজ। শুধু বর্তমান অবস্থার প্রতি আপনার উপলব্ধিকে বদলে দিন 'সেখানে থাকতে চাই'

এমন মনোভাব দিয়ে। এমন স্যান কোয়েন্টিন অথবা তার চেয়ে একটু ভালো হচ্ছে আমার বিহারটা, যখন আপনি সেখানে থাকতে চাইবেন, সেটা আর আপনার জন্য কারাগার বলে মনে হবে না। আপনার চাকরি, ব্যক্তিগত সম্পর্ক অথবা অসুস্থ দেহের প্রতি যে মনোভাব, তা বদলে নিয়ে আর এরূপ অবস্থা না চাওয়ার বদলে, বরং এরূপ অবস্থাকেই মেনে নিলে তখন এটাকে আর কারাগার বলে মনে হবে না। যখন আপনি এখানে থেকে খুশি, তখন আপনি স্বাধীন।
স্বাধীনতা হচ্ছে আপনি যেখানে আছেন সেখানেই সন্তুষ্ট থাকা। কারাগার হচ্ছে অন্য কোথাও যেতে চাওয়া। স্বাধীন জগৎ হচ্ছে যারা সন্তুষ্ট, তাদের দ্বারা দেখা জগৎ। সত্যিকারের স্বাধীনতা হচ্ছে আকাঙক্ষা হতে স্বাধীনতা, কখনোই আকাঙক্ষার স্বাধীনতা নয়।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাথে রাতের ভোজ

আমার বিহারের কঠিন ও কঠোর জীবনের কথা বিবেচনা করে আমি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের স্থানীয় গ্রুপের সাথে ভালো একটা সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে খুব সতর্ক তাই বিশ্ব মানবাধিকার সনদের পঞ্চাশতম পূর্তি উপলক্ষে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আয়োজিত একটি ডিনারের আমন্ত্রণে আমি তাদের নিচের চিঠিটা লিখলাম।

প্রিয় জুলিয়া, প্রচার সম্পাদক,
৩০ মে, শনিবারের বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের পঞ্চাশতম পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত রাতের ভোজসভায় আমন্ত্রণের জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

এমন অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রন পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

তবে কথা হলো, আমি থেরবাদী মতাদর্শের এক বৌদ্ধ ভিক্ষু, যে মতাদর্শে খুব কঠিন নিয়ম মেনে চলতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই নিয়ম আমাকে দুপুর হতে পরের দিন ভোর হওয়া পর্যন্ত সময়টাতে খেতে নিষেধ করে। হায়! এজন্যই ডিনারে আমি নেই! মদের বিষয়েও না - না। আর এটা সব ধরনের মদের বেলায় প্রযোজ্য। তোমার আমন্ত্রন গ্রহণ করলে আমাকে খালি একটা প্লেট ও খালি একটা গ্লাস নিয়ে বসে থাকতে হবে, যেখানে চারপাশের সবাই তৃপ্তির সাথে খানাপিনায় ব্যস্ত থাকবে। আমি নিশ্চিত, এমন খানাপিনা নিশ্চয়ই মুখরোচক হবে। সবাই খাবে আর আমি চেয়ে চেয়ে দেখব, তা হবে আমার উপর এক ধরনের নির্যাতন, যা তোমরা, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশাল নিশ্চয়ই সহ্য করবে না। তা ছাড়া, বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে আমি টাকা-পয়সা গ্রহণও করতে পারি না, রাখতেও পারি না। আমি দারিদ্র্যসীমার এত নিচে বাস করি যে, অনেক সরকারি পরিসংখ্যান আমি লেজে-গোবরে করে ফেলি! তাই সেই ডিনারের পয়সা দেওয়ার আমার কোনো উপায় নেই, আর তা আমি খেতেও পারব না কোনোমতে।
আমি আরও বলতে যাচ্ছিলাম, এমন অনুষ্ঠানে পোশাক পরিচ্ছদের যে একটা নিয়ম আছে, ড্রেস কোড আছে, তাতেও আমার মতো একজন ভিক্ষুর সমস্যায় পড়ে যেতে হবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমি অনেক বলে ফেলেছি। তাই বিনীতভাবে এই বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে, আমি ডিনারে উপস্থিত থাকতে পারব না।

দারিদ্রের মাঝে সুখে থাকা, তোমারই,

ব্রাহ্ম

একজন ভিক্ষুর পোশাকের নিয়ম

আমার মতাদর্শের ভিক্ষুরা বাদামী চীবর পরে। আর আমাদের এটা বাদে আর কিছু নেই। কয়েক বছর আগে, আমাকে কয়েক দিনের জন্য একটি অস্ট্রেলিয়ান হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমি আমার প্যান্ট এনেছি কি না। আমি বললাম যে ভিক্ষুরা প্যান্ট পরে না। তারা হয় এই চীবর পরবে, আর না-হলে কিছুই পরবে না! তাই তারা আমাকে চীবর পরতে দিল।
সমস্যা হচ্ছে যে ভিক্ষুদের পোশাকটি আসলেই একটা ড্রেসের মতো দেখায়।

এক রবিবার বিকেলে পার্থ শহরের উপকণ্ঠে আমি আমাদের বিল্ডিংয়ের নির্মাণকাজের মালপত্রগুলো তুলছিলাম আমাদের বিহারের গাড়িতে। কাছের এক বাড়ি থেকে তের বছর বয়সের এক অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে আমার সাথে কথা বলতে এলো। সে এর আগে কখনোই কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখে নি। আমার সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সে আমার পুরো আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল পরম অবজ্ঞার সাথে। তারপর সে বিরক্তিভরা কণ্ঠে আমাকে বিদ্রুপ করা শুরু করল : ‘তুমি তো মেয়েদের পোশাক পরেছ! কী জঘন্য! ওয়াক!’

সে এমনভাবে কথাগুলো বলল যে আমি না হেসে পারলাম না। আমার গুরু আজান চাহ্-র কথা মনে পড়ল। তিনি তার শিষ্যদের উপদেশ দিতেন কী করে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের প্রতি সাড়া দিতে হয়। ‘যদি কেউ তোমাকে কুকুর বলে, তাতে রাগ করো না। তার বদলে তোমার পিছনে নিচের দিকে তাকাও। যদি সেখানে কোনো লেজ দেখতে না পাও, তার মানে হচ্ছে তুমি কুকুর নও। সমস্যা খতম।’ মাঝে মাঝে আমি জনসমক্ষে চীবর পরার জন্য প্রশংসাও পাই।

একবার যদিও এটা আমাকে বেশ কাঁপিয়ে দিয়েছিল।
আমার তখন শহরে কাজ ছিল। আমার ড্রাইভার (ভিক্ষুদের গাড়ি চালানো নিষেধ) আমাদের বিহারের গাড়িটাকে একটা বহুতল গাড়ি পার্কিংয়ে এ রাখল। সে ঘোষণা করল যে তাকে এখুনি টয়লেটে যেতে হবে। কিন্তু গাড়ি পার্কিংয়ের টয়লেটগুলো নোংরা মনে করাতে সে নিকটস্থ সিনেমা হলের টয়লেট ব্যবহার করতে চায়। অতএব, সে যখন ভেতরে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ব্যস্ত আমি তখন সিনেমা হলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি ব্যস্ত সড়কের উপর আমার ভিক্ষু ড্রেস পরে।

এক তরুণ আমার কাছে এসে মিষ্টি করে হাসল, আর বলল আমার সময় আছে কি না। আমার মতো ভিক্ষুরা খুব সহজ সরল হয়। আমি জীবনের বেশির ভাগ সময় বৌদ্ধ বিহারে কাটিয়েছি। তা ছাড়া ভিক্ষুরা কোনো ঘড়ি পরে না। তাই আমাকে নম্রভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হলো যে আমার সময় জানা নেই।
সে ভ্রূকুটি করে হাঁটতে শুরু করল।

কয়েক কদম যাওয়ার পরেই হঠাৎ আমার উপলব্ধি হলো তরুণটি কী বুঝাতে চেয়েছে : ‘তোমার কি সময় আছে?’ এটা সম্ভবত যেকোনো বইয়ের সবচেয়ে

পুরনো ডেটিংয়ে আমন্ত্রণের কথা। আমি পরে জেনেছিলাম যে, আমি যে জায়গাতে দাঁড়িয়েছিলাম, তা হচ্ছে পার্থে সমকামী পুরুষদের দেখা করার জনপ্রিয় জায়গাগুলোর একটি!

সেই সমকামী তরুণটি ফিরে এসে আরেকবার আমাকে নিরীক্ষণ করে বলল, তার শ্রেষ্ঠ মেরিলিন মনরোর কণ্ঠে : 'ওহ, তোমাকে কিন্তু এমন পোশাকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে!'

আমি স্বীকার করছি যে ওই সময় আমি ঘামতে শুরু করেছিলাম। তখনই সিনেমা হলের ভেতর থেকে আমার ড্রাইভার এসে আমাকে উদ্ধার করল। তখন থেকে আমরা গাড়ি পার্কিংয়ের টয়লেটগুলো ব্যবহার করি।

নিজেকে হাসা

নবীন স্কুলশিক্ষক হিসেবে আমার পাওয়া সেরা উপদেশগুলোর একটি হচ্ছে যখন আপনি একটি ভুল করবেন আর পুরো ক্লাস আপনাকে হাসা শুরু করবে, তখন আপনিও হাসুন। এতে করে আপনার ছাত্ররা আর কখনোই আপনাকে হাসছে না, হাসছে আপনার সাথে সাথে।

অনেক বছর পরে, পার্থে একজন শিক্ষক ভিক্ষু হিসেবে আমাকে হাইস্কুলগুলোতে ডাকা হতো বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। পশ্চিমা স্কুলপড়ুয়া কিশোর-কিশোরীরা আমাকে লজ্জা দিয়ে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করত। একবার বৌদ্ধ সংস্কৃতির উপরে একটা ক্লাস শেষে আমি প্রশ্ন আহবান করলাম তাদের কাছ থেকে। একজন চৌদ্দ বছরের কিশোরী তার হাত তুলল এবং জিজ্ঞেস করল : 'মেয়েরা কী তাহলে তোমার মধ্যে যৌন কামনা জাগিয়ে তোলে?'

সৌভাগ্যবশত, ক্লাসের অন্যান্য মেয়েরা আমাকে উদ্ধারে এগিয়ে এলো, আর এভাবে তাদের সবাইকে লজ্জা দেওয়ার জন্য বকা দিল। আমি হাসলাম আর পরবর্তী দেশনার বিষয়বস্তু হিসেবে মনে মনে ব্যাপারটা নোট করে নিলাম।

অন্য একসময় আমি একটা মেইন রোড ধরে হাঁটছিলাম। এই কয়েকজন স্কুলছাত্রী এগিয়ে এলো আমার দিকে।
তারা খুব বন্ধুভাবাপন্ন স্বরে আমাকে বলল, 'হাই! আমাদের মনে আছে তোমার? কয়েক দিন আগে তুমি আমাদের স্কুলে একটা বক্তৃতা দিতে এসেছিলে।'

'আমি আনন্দিত ও গর্বিত যে তোমরা আমাকে মনে রেখেছ।' আমি উত্তর দিলাম।
তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'আমরা তোমাকে কখনোই ভুলব না। কী করে আমরা এমন সন্ন্যাসীকে ভুলি যার নাম 'ব্রা'!

যে কুকুরটি শেষ হাসি হেসেছিল

উত্তরপূর্ব থাইল্যান্ডে ভিক্ষু হিসেবে আমার প্রথম বছরটা ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষ বছর। আজান চাহ্-র বিহারের কাছেই আঞ্চলিক শহর উবনের নিকটে একটা আমেরিকান বিমানঘাঁটি ছিল। আজান চাহ্ তখন কী করে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সাথে ডিল করতে হয় তা বলতে গিয়ে আমাদের নিচের সত্যি কাহিনীটি শোনাতেন।
এক আমেরিকান যোদ্ধা বিমান ঘাঁটি থেকে রিকশায় করে শহরে যাচ্ছিল। শহরের সীমানায় রাস্তার পাশে একটা মদের দোকানের সামনে রিকশাওয়ালার কয়েকজন বন্ধু বসেছিল অর্ধমাতাল অবস্থায়। তারা থাই ভাষায় চিৎকার করল, 'এই যে! তুমি এই নোংরা কুকুরটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' এই বলে তারা আমেরিকান সৈন্যটাকে দেখিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল।

রিকশাওয়ালাটিও কিছুটা মজা করার আশায় চিৎকার করে জবাব দিল, 'আমি এই নোংরা কুকুরটিকে চাঁদের নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছি যাতে সে একটা গোসল দিয়ে পরিষ্কার হতে পারে!'

রিকশাওয়ালা ও তার মাতাল বন্ধুরা হাসল, সৈন্যটি অভিব্যক্তিহীন। গন্তব্যে পৌঁছে রিকশাওয়ালা ভাড়া নেওয়ার জন্য হাত পাতল। কিন্তু আমেরিকান সৈন্যটি নিরবে চলে যেতে লাগল।

রিকশাওয়ালা উত্তেজিত হয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে উঠল, 'হেই! স্যার! আপনি আমাকে ডলার দিন!'
বিশালদেহী আমেরিকান তখন শান্তভাবে ঘুরে দাঁড়াল, আর থাই ভাষায় সাবলীলভাবে বলল, 'কুকুরদের কোনো টাকা থাকে না।'

বিদ্রুপ এবং অর্হত্ত্ব

অভিজ্ঞ ধ্যান শিক্ষকদের প্রায়ই এমন সব শিষ্যদের মোকাবেলা করতে হয় যারা মনে করে তারা অর্হৎ হয়ে গেছে। তাদের এমন দাবি সত্যি কি না তা যাচাই করার জন্য একটা পদ্ধতি হচ্ছে শিষ্যটাকে এমন বিদ্রুপ করা যাতে করে সে রেগে যায়। সব বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী জানে যে, বুদ্ধ স্পষ্ট বলে গেছেন, যে রেগে যায় সে নিশ্চিতই অর্হৎ নয়।

একজন তরুণ জাপানী ভিক্ষু, যে এই জীবনেই নির্বাণ লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে একটা বিখ্যাত বিহারের কাছেই অবস্থিত হ্রদের মধ্যস্থিত একটি দ্বীপে নির্জনে ধ্যান-সাধনা করছিল। সে জীবনের প্রথমভাগেই নির্বাণ পেতে চায়, যাতে করে পরবর্তীকালে অন্যান্য কাজে মনোযোগ দিতে পারে।

বিহারের তত্ত্বাধায়ক তাকে রসদপত্র দেওয়ার জন্য সপ্তাহে একবার যেত। একবার তরুণ ভিক্ষুটি একটি নোট লিখে দিল যে, তার কিছু দামী কাগজ, একটা পালক ও কিছু ভালো মানের কালি লাগবে। সে শীঘ্রই তার নির্জনবাসের তিন বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছে। আর সে তার গুরুকে জানিয়ে দিতে চায় কতদূর এগিয়েছে সে তার সাধনায়।

পরের সপ্তাহে কাগজ, পালক ও কালি এসে গেল। পরের কয়েকটা দিন অনেক ধ্যান ও গভীর চিন্তাভাবনা শেষে দামী কাগজের উপর সুন্দর ডিজাইনের হাতের লেখায় সে নিচের ছোট্ট কবিতাটি লিখল :
‘বিবেকবান তরুণ ভিক্ষু,
তিন বছর ধরে একাকী ধ্যানরত; তাকে আর টলাতে পারবে না, চারি মহাবায়ুও।’

সে ভাবল, এই কথাগুলো পড়লে এবং এমন যত্ন নিয়ে লেখা স্টাইল দেখলে নিশ্চিতই তার বিজ্ঞ বুড়ো অধ্যক্ষ বুঝতে পারবে যে তার শিষ্য এখন অর্হৎ। সে আলতো করে কাগজটা গুটিয়ে নিল। ফিতে নিয়ে যত্ন করে এটাকে বাঁধল, আর এটাকে তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে অধ্যক্ষের কাছে পাঠানোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

এর পরবর্তী দিনগুলোতে সে কল্পনা করতে লাগল, এমন নিখুঁতভাবে লেখা বুদ্ধিদীপ্ত কবিতা পড়ে তার অধ্যক্ষ কীরূপ আনন্দ পাবে। সে কল্পনার চোখে দেখতে পেল, এটিকে একটি দামী ফ্রেমে বাঁধাই করে বিহারের প্রধান কক্ষে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, এবার তারা তাকে কোনো বিখ্যাত শহরের কোনো এক বিহারের অধ্যক্ষ বানাতে চাইবে। পরের বার তত্ত্বাবধায়ক যখন তার সাপ্তাহিক রসদ পৌঁছে দিতে আসল, তরুণ ভিক্ষুটি তখন তার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল। তত্ত্বাবধায়ক তার হাতে তুলে দিল আরেকটা রোল করা কাগজ, সে যে কাগজটা পাঠিয়েছে তার মতোই; কিন্তু অন্য রঙের ফিতা দিয়ে বাঁধা। ‘অধ্যক্ষের কাছ থেকে’ তত্ত্বাবধায়ক তীক্ষ্ণ সুরে বলল।

ভিক্ষুটি উত্তেজিত হয়ে ফিতেটি ছিঁড়ে কাগজটি বিছিয়ে নিল। তার চোখগুলো কাগজটি পড়তে পড়তে চাঁদের মতো গোল হয়ে উঠল, আর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এটা তার নিজেরই পাঠানো কাগজ, যেখানে তার এত সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা লাইনের পাশে অধ্যক্ষ লাল কালিতে অবহেলাভরে লিখে দিয়েছেন, ‘পাদ!’ দ্বিতীয় লাইনের পাশেও আরেকটা জঘন্য লাল কালির ‘পাদ!’ তৃতীয় লাইনেও আছে এমন ‘পাদ!’ এমনটা আছে চতুর্থ লাইনের পাশেও।
যথেষ্ট হয়েছে! এই জরাজীর্ণ বুড়ো অধ্যক্ষ এমন বোকা যে তার নাকের ডগায় লেখা থাকা নির্বাণকেও চিনল না। আর সে এমন অমার্জিত ও অসভ্য যে, এত সুন্দর একটা শিল্পকে অশ্লীল আকিবুকি করে নষ্ট করে দিল। অধ্যক্ষ উচ্ছৃঙ্খল ছেলের মতো আচরণ করছে, ভিক্ষুর মতো নয়। এটা শিল্পের অপমান! ঐতিহ্যের অপমান! সত্যের অপমান!

তরুণ ভিক্ষুর চোখ রাগে ছোট হয়ে এলো। তার মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। সে ফোঁস ফোঁস করে তত্ত্বাবধায়ককে বলল, ‘আমাকে অধ্যক্ষের কাছে নিয়ে যাও! এক্ষুনি!’

তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম তরুণ ভিক্ষুটি তার দ্বীপাশ্রমের বাইরে পা দিল। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে অধ্যক্ষের রুমে ঝড়ো হাওয়ার বেগে প্রবেশ করল, কাগজটা টেবিলের উপর বিছাল এবং এর ব্যাখ্যা দাবি করল।

অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ ধীরে সুস্থে কাগজটা তুলে নিল, গলা খাঁকারি দিল এবং কবিতাটা পড়ল :
বিবেকবান তরুণ ভিক্ষু,
তিন বছর ধরে একাকী ধ্যানরত, তাকে আর টলাতে পারবে না, চারি মহাবায়ুও।

এরপর সে কাগজটা নামিয়ে রাখল, আর তরুণ ভিক্ষুটির দিকে চেয়ে বলল, 'হম! তো, তরুণ ভিক্ষু! চারি মহাবায়ুও তোমাকে নড়াতে পারে না। অথচ চারটা ছোট্ট 'পাদ' তোমাকে হ্রদের এপারে উড়িয়ে নিয়ে এলো!'

যখন আমি অর্হৎ হলাম

থাইল্যান্ডে আমার ভিক্ষু হওয়ার চতুর্থ বছরে উত্তরপূর্বাঞ্চলে একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলের বনবিহারে দীর্ঘদিন ধরে কঠোর সাধনা করছিলাম আমি। এক রাতে দীর্ঘক্ষণ চংক্রমণের সময়ে আমার মন অস্বাভাবিক পরিষ্কার হয়ে উঠল। গভীর অন্তর্দৃষ্টি আসল যেন পাহাড়ি ঝরনাধারার মতো। যে নিগূঢ় রহস্যগুলোর আগে কোনো কুল কিনারা পাই নি, সেগুলোই আজ খুব সহজে বুঝতে পারছিলাম আমি। এর পরে একটা কিছু আসল। এটা আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। এটাই সেটা। অর্হত্ত্ব।

এমন সুখ আগে কখনো পাই নি। এত সুখ! এত শান্তি আমি গভীর রাত পর্যন্ত ধ্যান করলাম, ঘুমালাম খুব কম, ৩টার ঘণ্টা বাজার অনেক আগেই বিহারের হলরুমে গিয়ে ধ্যান শুরু করলাম আবার। সাধারণত রাত ৩টায় থাইল্যান্ডের এমন গরম ও ভ্যাপসা জঙ্গলে আমাকে অলসতা ও ঘুমের সাথে লড়তে হতো। কিন্তু এই সকালটা তেমন নয়। আমার দেহটা বিনা চেষ্টাতেই খাড়া। স্মৃতি ডাক্তারদের ক্ষুরের মতো ধারাল। মনোযোগ সহজেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। অর্হৎ হওয়া এমন চমৎকার। তবে দুঃখের বিষয় এটা বেশিক্ষণ থাকে নি।

তখনকার দিনে উত্তরপূর্ব থাইল্যান্ডে খাবার-দাবার ছিল জঘন্য। উদাহরণস্বরূপ একবার দিনে যে একবেলা খেতাম, তাতে পেলাম আঠালো ভাতের একটা দলা, আর তার উপরে অর্ধ সেদ্ধ মাঝারি সাইজের একটা ব্যাঙ। কোনো শাকসবজি নেই, ফলমূল নেই, শুধু ব্যাঙ-ভাত। তাই দিয়ে সারা দিন কাটাতে হবে। আমি পায়ের মাংসগুলো দিয়ে শুরু করলাম । এর পরে ব্যাঙের ভেতরের অংশগুলো। আমার পাশেই এক ভিক্ষু ব্যাঙের নাড়িভুড়িগুলো দিয়ে খাওয়া শুরু করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত ব্যাঙের মুত্রথলিতে চাপ পড়ল। মুত্রথলিতে তখনো মূত্র ছিল। এতে করে ব্যাঙটা তার ভাতের উপর প্রস্রাব করে দিল। ফলে খাওয়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলো সে।

সাধারণত আমাদের প্রতিদিনের প্রধান তরকারি ছিল পঁচামাছের ঝোল। ছোট ছোট মাছগুলো বর্ষাকালে ধরা হয়। আর মাটির পাত্রে সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং সেখান থেকে সারা বছর ধরে ব্যবহার করা হয়। আমাদের বিহারের রান্নাঘর পরিষ্কার করার সময় আমি এ রকম একটা মাটির পাত্র পেয়েছিলাম। এটি শুককীটে কিলবিল করছিল। তাই আমি এটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেলাম।

সেই গ্রামের হেডম্যান, যে ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ও রুচিসম্পন্ন সে আমাকে এটা ফেলে দিতে মানা করল।
'কিন্তু এটা তো শুককীটে পরিপূর্ণ' আমি বললাম।

'সেটা আরও বেশি মজাদার!' সে জবাব দিল। আর আমার কাছ থেকে পাত্রটা নিয়ে নিল। পরের দিন আমরা সেই পঁচা মাছের ঝোল খেলাম আমাদের দৈনিক একবেলা খাবারে।

আমার অর্হত্ত্বের পরের দিন অবাক হয়ে দেখলাম আঠালো ভাতের সাথে দুই সসপ্যান ঝোল। একটাতে ছিল সেই দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা মাছের ঝোল, আরেকটাতে শুকরের মাংসের ঝোল। আমি ভাবলাম, আজকে আমার অর্হত্ত্বের উদযাপন উপলক্ষে ভালো একটা খানা খাব।

আমার আগে অধ্যক্ষ সেই খাবারগুলো পছন্দ করলেন। তিনি বড় চামচে করে তিন চামচ সেই সুস্বাদু শুকরের মাংসের ঝোল নিলেন - পেটুক। তবে এর পরেও আমার জন্য প্রচুর থাকল। কিন্তু সসপ্যানটা আমার কাছে দেওয়ার আগে তিনি আমার সেই জিভে জল এনে দেওয়া শুকরের মাংসের ঝোলকে ঢেলে দিলেন পঁচা মাছের ঝোলের মধ্যে। এর পরে তিনি সেই ঝোলটা নেড়েচেড়ে মিশিয়ে দিয়ে বললেন, 'সবই তো একই!'

আমি হতবাক। রাগে ফুঁসছি। ভীষণ রেগে গেছি। যদি তিনি সত্যিই ভাবতেন, 'সবই তো একই' তাহলে কেন বড় বড় তিন চামচ শুকরের মাংসের ঝোল নিতে গেলেন মিশিয়ে দেওয়ার আগে? ভন্ড তারচেয়ে বড় কথা, তিনি তো এখানকারই ছেলে। বড় হয়েছেন এমন দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা মাছের ঝোল খেয়ে। তার তো সেটাকেই পছন্দ করা উচিত। নকল! শুয়োর! প্রতারক!

এর পরে উপলব্ধি আমাকে আঘাত করল। অর্হৎদের খাবার দাবারের উপরে কোনো বাছবিচার থাকে না। তারা ক্রুদ্ধও হয় না, আর তাদের অধ্যক্ষকে শুয়োর বলেও ডাকে না, যদিও তা চাপা স্বরে। আমি সত্যিই খুব রেগে গিয়েছিলাম। আর তার মানে হচ্ছে ... ওহ্ না! ... আমি অর্হৎ হই নি।
তৎক্ষণাৎ আমার রাগের আগুন চাপা পড়ে গেল বিষণ্ণতার ভারে। হতাশার ভারী কালো মেঘে ছেয়ে গেল আমার হৃদয়ের আকাশ, যা আমার অর্হত্ত্বের সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে দিল। মনমরা হয়ে আমি দুই চামচ দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা মাছের ঝোল ও শুয়োরের ঝোলের মিশ্রণ ঢাললাম ভাতের উপর। কী খাচ্ছি, তাতে এখন আমার আর কিচ্ছু আসে যায় না। আমি এমন নিরাশ হয়ে গেলাম। আমি যে অর্হৎ নই, তা জেনে আমার পুরো দিনটাই মাটি হয়ে গেল।

রাস্তার শুয়োর

শুয়োর বিষয়ে আরেকটা গল্প। একজন ধনী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নতুন একটা খুব দামী ও শক্তিশালী স্পোর্টস কার কিনেছে। আপনি অবশ্যই শহরের ধীরগতিতে চলা যানবাহনের ভিড়ে চালানোর জন্য এত দাম দিয়ে এমন শক্তিশালী গাড়ি কিনবেন না। তাই এক রোদেলা দিনে সে শহর থেকে বেরিয়ে নৈসর্গিক দৃশ্যে ভরা গ্রামের দিকে রওনা দিল। স্পিড ক্যামেরা নেই এমন জায়গায় গিয়ে সে জোরে একসিলারেটরে চাপ দিল। গর্জে উঠল তার স্পোর্টস কার। গাড়ির ইঞ্জিন বিশাল শব্দে গর্জে উঠছে আর গ্রামের রাস্তায় সাঁই সাঁই করে ছুটে চলেছে তার চকচকে গাড়ি। দ্রুত গতির উল্লাসে হাসিতে ফেটে পড়ল ডাক্তার।

রোদে পোড়া একজন কৃষক কিন্তু এতটা উল্লসিত ছিল না। স্পোর্টস কারের গর্জন ছাপিয়ে শোনা যায় মতো করে সে চিৎকার করল, 'শুয়োর!'
ডাক্তার জানত যে, সে যেভাবে চালাচ্ছে তা চারপাশের পরিবেশের সাথ বেমানান। কিন্তু সে ভাবল, 'চুলোয় যাক ব্যাটা! আমার নিজেকে উপভোগ করার অধিকার আছে।'

তাই সে কৃষকের দিকে ফিরে চিৎকার করল, 'কাকে শুয়োর বলছ তুমি?'

যে কয়েক সেকেন্ড সে রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল, এর মাঝেই তার গাড়িটা রাস্তার মাঝখানে একটা শুয়োরকে চাপা দিল।
নতুন ব্রান্ডের স্পোর্টস কার পুরো বিধ্বস্ত হলো। আর শুয়োরটা, তাকে অনেক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হলো আর অনেক টাকা গচ্চা দিতে হলো, তার গাড়ির সাথে সাথে।

হরে কৃষ্ণ

আগের গল্পে ডাক্তারের অহমিকার ফলে দয়ালু হৃদয়ের কৃষকের সতর্কবাণীকে সে ভুলভাবে বিচার করেছিল। নিচের গল্পে আমার ভিক্ষুর অহমিকার ফলে অন্য এক দয়ালু হৃদয়ের ব্যক্তিকে আমি ভুলভাবে বিচার করেছিলাম, যা পরে আমার বেশ মনোকষ্টের কারণ হয়েছিল।

আমি লন্ডনে আমার মায়ের সাথে দেখা করে ফিরছিলাম। সে আমার সাথেই আসছিল ইয়েলিং ব্রডওয়ে রেলস্টেশনে, আমাকে টিকেটের ব্যাপারে সাহায্য করতে। স্টেশনে যাওয়ার পথে, সেই ব্যস্ত রাজপথে আমি শুনলাম, কেউ আমাকে ঠাট্টা করে বলছে, 'হরে কৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ!'

ন্যাড়া মাথা ও বাদামী চীবর পরা বৌদ্ধ ভিক্ষু হওয়াতে প্রায়ই আমাকে 'কৃষ্ণ চেতনা আন্দোলনের' সমর্থক বলে মনে করে সবাই। অস্ট্রেলিয়ায় অনেকবার আমাকে অভদ্র ব্যক্তিরা 'হরে কৃষ্ণ, এই যে হরে কৃষ্ণ!' বলে উত্যক্ত করার চেষ্টা করেছে নিরাপদ দূরত্ব থেকে, আর আমার চেহারা নকল করেছে। আমি দ্রুত খুঁজে নিলাম 'হরে কৃষ্ণ' বলে চিৎকার দেওয়া লোকটাকে, আর সিদ্ধান্ত নিলাম একজন ভালো বৌদ্ধ ভিক্ষুকে প্রকাশ্যে এভাবে বিদ্রুপ করাটা ঠিক নয় বলে তাকে জানিয়ে দিতে হবে।

আমার মা আমার ঠিক পিছনে ছিল। আমি সেই জিনস, জ্যাকেট ও ন্যাড়া মাথার সেই তরুণটিকে বললাম, 'দেখো বন্ধু, আমি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। আমি কোনো 'হরে কৃষ্ণ' সমর্থক নই। তোমার এটা ভালো জানা উচিত। তুমি শুধু শুধু আমাকেই 'হরে কৃষ্ণ' বলছ, তা তো ঠিক নয়!'

তরুণটি হেসে তার টাক খুলে ফেলল। ফলে টাকমাথার আড়াল থেকে লম্বা বেণী করা চুল বেরিয়ে এলো। 'হ্যাঁ, আমি জানি তুমি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। আমি একজন হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ!'

সে আমাকে ঠাট্টা করছে না। সে শুধু তার হরে কৃষ্ণই করছে। আমি খুব বিব্রত বোধ করলাম। কেন শুধু মা সাথে থাকলেই এমন জিনিস ঘটে?

হাতুড়ি

আমরা সবাই সময়ে সময়ে ভুল করি। জীবনটা হচ্ছে ভুল যতটা পারা যায় কম করতে শেখা। এটা বুঝে নিয়ে আমাদের বিহারে একটা নীতি চালু আছে এ রকম যে, ভিক্ষুরা ভুল করতে পারবে। যখন তারা ভুল করতে ভয় পায় না, তখন তারা এতটা ভুল করে না।

একদিন আমার বিহারের মাঠে হাঁটার সময় ঘাসের মধ্যে একটা হাতুড়ি পড়ে থাকতে দেখলাম। সেটি নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন ধরে সেখানে পড়ে ছিল। কারণ, এতে বেশ জং ধরে গেছে। আমি আমার সতীর্থ ভিক্ষুদের অযত্ন অবহেলাতে খুব ক্ষুব্ধ হলাম। আমরা বিহারে যা কিছু ব্যবহার করি, আমাদের চীবর থেকে শুরু করে যন্ত্রপাতি, সবই আমাদের কঠোর পরিশ্রমী গৃহী ভক্তদের দান করা। একজন গরিব কিন্তু উদার বৌদ্ধ উপাসক হয়তো সেই হাতুড়িটা কিনে দিতে গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ টাকা জমিয়েছে। এই দানগুলোকে অবিবেচকের মতো ব্যবহার করা ঠিক নয়। তাই আমি ভিক্ষুদের একটি সভা আহবান করলাম।
আমাকে বলা হয় যে আমার চরিত্র নাকি ডালের মতো নরম। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় আমি ছিলাম থাই মরিচের মতো ঝাঁঝালো। আমি আমার ভিক্ষুদের আসলেই জিহবা দিয়ে পিটিয়েছিলাম। তাদের একটা শিক্ষা পাওনা ছিল। তাদের শেখা বাকি ছিল কী করে আমাদের অল্প কয়েকটি সম্পত্তির দেখাশোনা করতে হয়।

যখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম, ভিক্ষুরা সবাই তখন ঋজু হয়ে বসা, ছাই বর্ণের মুখ ও নিরব। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম এই আশায় যে, অপরাধী তার দোষ স্বীকার করবে। কিন্তু ভিক্ষুদের কেউই স্বীকার করল না। তারা ঋজু হয়ে নিরবে অপেক্ষায় বসে রইল। আমি আমার সতীর্থ ভিক্ষুদের নিয়ে বেশ ঝামেলা অনুভব করলাম। তাই উঠে হল থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম অন্তত পক্ষে যে ভিক্ষুটা এভাবে হাতুড়িটা ঘাসে ফেলে রেখেছে, নিজের দোষ স্বীকার করার মতো সাহস তার থাকবে ও ক্ষমা চাইবে। আমার বক্তব্য কী খুব কড়া হয়ে গিয়েছিল?

আমি যখন হলের বাইরে বেরিয়ে গেলাম, তখন হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম কেন কোনো ভিক্ষুই এর দায় স্বীকার করে নি। আমি ফিরে হলে চলে এলাম। আমি ঘোষণা করলাম, 'ভিক্ষুরা! আমি খুঁজে পেয়েছি কে এই হাতুড়িটাকে ঘাসের মধ্যে ফেলে রেখেছে। সেটি ছিলাম আমি!!'
আমি পরিষ্কার ভুলে গিয়েছিলাম যে আমিই তখন বাইরে কাজ করছিলাম, আর তাড়াহুড়োতে হাতুড়িটা তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। সেই অগ্নিঝরা কথাগুলো বলার সময়েও স্মৃতি আমার সাথে লুকোচুরি খেলেছে। কেবল যখন আমি ভিক্ষুদের চলে যেতে বলেছি, তখনই স্মৃতিটা ফিরে এসেছিল পুরো অর্থসহ। আমিই এই কাজটি করেছিলাম। ওহ! কী লজ্জার!

সৌভাগ্যবশত আমার বিহারে আমরা ভিক্ষুরা ভুল করলে মেনে নিই, এমনকি অধ্যক্ষ ভুল করলেও।

কাউকে আঘাত না দিয়েই কৌতুক উপভোগ করা

যখন আপনি আপনার ইগো বা অহংবোধকে ত্যাগ করবেন, তখন কেউই আর আপনাকে ঠাট্টা করতে পারবে না। যদি কেউ আপনাকে বোকা বলে, তাতে

আপনার রেগে যাওয়ার একমাত্র কারণ হতে পারে যে আপনি বিশ্বাস করেন, তারা হয়তো ঠিক কথাই বলছে।

কয়েক বছর আগে, পার্থে অনেক লেনের একটা হাইওয়েতে গাড়িতে করে যাওয়ার সময় একটা পুরনো ধাঁচের গাড়িতে কয়েকজন যুবক আমাকে দেখে তাদের গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করতে শুরু করল, 'এই যে! টাকওয়ালা! এই যে ন্যাড়া মাথা!' তারা আমাকে প্যাঁচে ফেলতে চাচ্ছিল, তাই আমিও আমার জানালার কাচ নামিয়ে চিৎকার দিলাম, 'তোমাদের চুলগুলো কাটো! মেয়েদের দল!' সম্ভবত আমার সেটা করা উচিত ছিল না, কেননা এতে করে সেই তরুণদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তারা তাদের গাড়িটাকে আমাদের গাড়িটার পাশে এনে একটা ম্যাগাজিন দেখাল, আর মুখ বড় বড় করে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী করা শুরু করল ম্যাগাজিনের ছবিগুলোর দিকে তাকানোর জন্য। এটা ছিল প্লেবয় ম্যাগাজিনের একটা কপি। আমি তাদের এমন অশালীন রসবোধ দেখে হেসে উঠলাম। তাদের বয়সের হলে এবং বন্ধুরা সাথে থাকলে আমিও এমনটা করতাম। আমাকে হাসতে দেখে তারা তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে হাসাটা ভদ্রতার খাতিরে লজ্জায় চুপ থাকার চেয়ে অনেক উত্তম।

আমি কি সেই প্লেবয় ম্যাগাজিনের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়েছিলাম? অবশ্যই না। আমি একজন সংযত আচরণকারী ব্রহ্মচারী ভিক্ষু। তাহলে কীভাবে জানলাম যে ওটা একটা প্লেবয় ম্যাগাজিনের কপি ছিল? কারণ, আমার ড্রাইভার আমাকে সেটা বলেছিল, অন্ততপক্ষে আমি এই গল্পটাই সবাইকে বলি।

বোকা

কেউ আপনাকে বোকা বলে ডাকে। এরপর আপনি ভাবতে থাকেন, 'তারা কীভাবে আমাকে বোকা ডাকে? আমাকে বোকা ডাকার তাদের কোনো অধিকার নেই! কী অভদ্র সে, যে আমাকে বোকা ডাকে! আমাকে বোকা ডাকার জন্য তাদের আমি ধরব!' আর আপনি হঠাৎ উপলব্ধি করেন যে আপনি এইমাত্র তাদের আরও চারবার বোকা ডাকতে দিলেন।

প্রত্যেকবার আপনি যখন তারা কী বলেছে তা স্মরণ করেন, আপনি তাদের বোকা ডাকার অনুমতি দেন। সেখানেই সমস্যার বীজ লুকিয়ে আছে।
যদি কেউ আপনাকে বোকা ডাকে আর আপনি তৎক্ষণাৎ সেটিকে যেতে দেন, তাহলে সেটি আর আপনাকে বিরক্ত করবে না। সেখানেই আছে এর সমাধান।
আপনার অন্তরের সুখটাকে কেন অন্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেবেন?

একাদশ অধ্যায়

দুঃখ আর যেতে দেওয়া

কাপড় ধোয়ার চিন্তা

আজকাল লোকজন বেশি ভাবে। যদি তারা তাদের চিন্তাগুলো একটু কমাত, তাহলে আরেকটু সহজ হতো তাদের জীবন।

থাইল্যান্ডে আমাদের বৌদ্ধ বিহারে প্রত্যেক সপ্তাহে এক রাত ভিক্ষুরা মূল দেশনালয়ে সারা রাত ধরে ধ্যানে বসে থাকে, ঘুমায় না। এটি আমাদের বনভিক্ষুদের একটা ঐতিহ্য। এটি অতটা কঠিন ছিল না। কারণ, আমরা সব সময় পর দিন সকালে একটা ঘুম দিতে পারতাম।

এক সকালে সারা রাত ধরে ধ্যানের পরে যখন আমাদের নিজ নিজ কুটিরে ফিরে গিয়ে একটু ঘুমাবার সময় হয়ে এসেছে, এ সময় অধ্যক্ষ একজন নতুন অস্ট্রেলিয়ান ভিক্ষুকে ডাকলেন। অধ্যক্ষ তাকে একগাদা চীবর দিয়ে সেগুলো তখনি ধুয়ে দিতে বললেন। তরুণ ভিক্ষুটির মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বিশাল এক কাপড়ের স্তুপ কাচতে হবে। আর সেটা হতে হবে বনভিক্ষুদের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী। কুয়ো থেকে পানি তুলতে হবে। বিশাল একটি আগুন জ্বেলে সেখানে পানি গরম করতে হবে। দা দিয়ে কাঠাল গাছের কাঠ কুচি কুচি করে কাটতে হবে। কাঠের কুচিগুলো ফুটন্ত পানিতে ছেড়ে দিতে হবে। এ থেকে যে রস বের হবে তা ডিটারজেন্ট বা পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করবে। এরপর চীবরগুলো একটা একটা করে তক্তার উপরে হাত দিয়ে কচলাতে ও আছড়াতে হবে, আর সেই ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর চীবরগুলো রোদে শুকাতে দিতে হবে। সময়ে সময়ে সেগুলোকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হবে, যাতে রং চটে না যায়। একটা চীবর ধোয়াও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর একটা ব্যাপার ছিল। আর এতগুলো চীবর ধুয়ে নিতে নির্ঘাত আরও অনেক ঘণ্টার কাজ। বেচারা তরুণ ভিক্ষুটি সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। এমনিতেই ক্লান্তি চেপে ধরেছে তাকে। তার জন্য আমার করুণা হলো। আমি ধোয়ার স্থানে তাকে একটু সাহায্য করতে গেলাম। গিয়ে শুনতে পেলাম, সে বৌদ্ধরীতি ভুলে গিয়ে তার জন্মগত ভাষায় শাপ শাপান্ত করছে। সে রাগে গজরাচ্ছিল এই বলে বলে যে, 'ব্যাপারটা খুব অন্যায় ও নিষ্ঠুর হয়ে গেছে। অধ্যক্ষ কি আগামীকালের জন্যও অপেক্ষা করতে পারতেন না? তিনি কি বোঝেন নি যে আমি সারা রাত ঘুমাই নি? আমি তো এটা করার জন্য ভিক্ষু হইনি।' সে ঠিক এমন বলছিল না, তবে এগুলোই হচ্ছে সবচেয়ে ছাপার যোগ্য কথা। সেই সময়ে আমি ভিক্ষু হিসেবে কয়েক বছর হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বুঝেছিলাম তার কেমন লাগছে, আর এটাও জানতাম কীভাবে সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমি তাকে বললাম, 'কাজটা করা যত সহজ, সেটা নিয়ে চিন্তা করলে তা করাটা আরও কঠিন হয়ে পড়বে।'

সে চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত নিরবে থেকে সে তার কাজে মন দিল। আমিও ঘুমাতে গেলাম। সেদিন সে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে এলো, কাপড় কাচার কাজে সাহায্য করেছি বলে। সে আবিষ্কার করেছিল যে এটা খুব সত্যি, কাপড় কাচতে হবে - এই চিন্তাটাই সবচেয়ে কঠিন ছিল। যখন সে অভিযোগ অনুযোগ করা থামিয়ে কাপড় ধোয়ার কাজে মন দিল, আর কোনো সমস্যা থাকল না।

জীবনে যেকোনো কিছুর সবচেয়ে কঠিন অংশটি হচ্ছে এটা নিয়ে চিন্তা করা।

একটা হৃদয় নাড়া দেয়া অভিজ্ঞতা

আমি এই অমূল্য শিক্ষাটা - 'জীবনের যেকোনো কিছুর সবচেয়ে কঠিন অংশটা হচ্ছে তা নিয়ে চিন্তা করা'- এটা পেয়েছিলাম ভিক্ষুজীবনের প্রথম দিকের বছরগুলোতে, যখন আমি ছিলাম উত্তরপূর্ব থাইল্যান্ডে। আজান চাহ্ তার বৌদ্ধ বিহারের নতুন অনুষ্ঠান হল নির্মাণ করছিলেন। অনেক ভিক্ষু সেই কাজে সাহায্য করছিল। আজান চাহ্ আমাদের পরীক্ষা করার জন্য মন্তব্য করতেন, 'ভিক্ষুরা একটা বা দুটো পেপসি খেয়েই সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করতে পারে, যা শহর থেকে শ্রমিক আনার চেয়ে অনেক সাশ্রয়ী।' প্রায়ই আমি ভাবতাম, জুনিয়র ভিক্ষুরা মিলে একটা শ্রমিক সংগঠন শুরু করলে কেমন হয়। অনুষ্ঠান হলটা নির্মিত হচ্ছিল ভিক্ষুদের বানানো টিলার উপরে। টিলার অনেক মাটি এদিক সেদিক স্তুপাকারে ছিল। তাই আজান চাহ্ ভিক্ষুদের ডেকে বললেন, এই মাটিগুলোকে সরিয়ে পিছনে নিয়ে যেতে হবে। এর পরের তিন দিন ধরে সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যায় আধার না হওয়া পর্যন্ত আমরা একটানা কাজ করে গেলাম। আমরা বেলচা দিয়ে মাটি কেটে ঠেলাগাড়িতে করে সেই বিরাট মাটির স্তুপ কে সরিয়ে নিলাম আজান চাহ্ যেখানে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক সেখানে। কাজটা শেষ হতে দেখে আমি যারপরনাই খুশি। পরের দিন আজান চাহ্ কয়েক দিনের জন্য অন্য একটা বিহারে গেলেন। তার চলে যাওয়ার পরে উপাধ্যক্ষ ভিক্ষুদের ডাকলেন আর বললেন, মাটিটা ভুল জায়গায় ফেলা হয়েছে। ওটা সরাতে হবে। আমি বিরক্ত হলাম। তবে নালিশ করতে থাকা মনকে কোনোমতে শান্ত করে আরও তিন দিন সেই কাঠফাটা গরমে কঠোর পরিশ্রম করলাম।

দ্বিতীয়বার সেই মাটির স্তুপ সরানো শেষ করেছি মাত্র, আজান চাহ্ ফিরলেন। তিনি আমাদের ভিক্ষুদের ডেকে বললেন, 'কেন তোমরা মাটিটা সরালে সেখানে? আমি বলেছিলাম সেটা আগের জায়গাটাতে সরাতে হবে। ওখানে সরাও এটাকে।'

আমি রেগে নীল হয়ে গেলাম। 'এই সিনিয়র ভিক্ষুরা কেন আগে ভাগেই নিজেরা মিলে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না? বৌদ্ধধর্ম একটা সুশৃঙ্খল ধর্ম হওয়ার কথা। কিন্তু এই বিহারটা এতই বিশৃঙ্খল যে এই সামান্য মাটিটা কোথায় রাখতে হবে, তাও ঠিক করতে পারে না। আমার উপরে এমন অন্যায় করা তাদের উচিত নয়।' আরও তিনটি দীর্ঘ ক্লান্তিকর দিন পড়ে আছে আমার সামনে। আমি মাটি বোঝাই ঠেলাগাড়ি ঠেলছিলাম আর রাগে গজগজ করছিলাম ইংরেজিতে, যাতে থাই ভিক্ষুরা বুঝতে না পারে। এটা পুরোপুরি অযৌক্তিক একটা কাজ। এর শেষ হবে কখন?

আমি খেয়াল করতে শুরু করলাম, যত রাগছি, ততই ঠেলাগাড়িটা ভারী বোধ হচ্ছে। এক সতীর্থ ভিক্ষু আমাকে রাগে গজ গজ করতে দেখে কাছে এসে বলল, 'তোমার সমস্যা হচ্ছে তুমি বেশি ভাব।' সে ছিল অত্যন্ত সঠিক। যখন আমি অভিযোগ অনুযোগ বন্ধ করলাম, ঠেলাগাড়িটা ঠেলতে বেশ হালকা বোধ হলো। আমি আমার শিক্ষা পেয়ে গেলাম। মাটি সরানোর চিন্তাটা ছিল সবচেয়ে কঠিন অংশ। মাটি সরানোটা ছিল সহজ।

এখন আমি সন্দেহ করি, আজান চাহ্ ও তার উপাধ্যক্ষ প্রথম থেকেই পরিকল্পনা করে এটি করেছিলেন।

বেচারা আমি আর সৌভাগ্যবান তারা

থাইল্যান্ডে জুনিয়র ভিক্ষু হিসেবে আমি যেন খুব বৈষম্যের শিকার! সিনিয়র ভিক্ষুরা সবচেয়ে ভালো খাবার খান, বসেন সবচেয়ে নরম গদিতে, আর তাদের ঠেলাগাড়িও ঠেলতে হয় না। সেখানে আমার একবেলা খাবার ছিল জঘন্য ধরনের। অনুষ্ঠানগুলোতে আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হতো শক্ত কংক্রিটের মেঝেতে (মেঝেটা ছিল উঁচু নিচু, কারণ গ্রামবাসীরা কংক্রিট ঢালাই দিতে জানত না)। আর মাঝে মাঝে আমাকে খুব কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে হতো। আমি কত দুর্ভাগা! আর ওরা, সিনিয়র ভিক্ষুরা কত ভাগ্যবান!

আমি নিজের এই অভিযোগগুলো নিয়ে ভেবে ভেবে অনেক ঘণ্টা কাটিয়েছি। সিনিয়র ভিক্ষুরা সম্ভবত আধ্যাত্মিকতার অনেক উপরে পৌঁছে গেছেন। সুস্বাদু খাদ্যগুলো তাদের কী কাজে আসবে? আমাকেই সেই ভালো ভালো খাদ্যগুলো দেওয়া উচিত। সিনিয়র ভিক্ষুরা তো বছরের পর বছর ধরে শক্ত মেঝেতে বসে থাকতে অভ্যস্ত তাই বড়, নরম গদিগুলো পাওয়া উচিত আমারই। তা ছাড়া সিনিয়র ভিক্ষুরা সবাই কম বেশি মোটাসোটা। ভালো ভালো খাবার দাবার খেয়ে তারা আরামেই আছেন, যা দেখলেই বোঝা যায়। তারা শুধু জুনিয়র ভিক্ষুদের কাজ করতে বলেন। নিজেরা কিছুই করেন না। তারা কীভাবে জানবেন বাইরে এত গরম? তারা কীভাবে জানবেন ঠেলাগাড়ি ঠেলা কতটা কষ্টের? বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা তো তাদের মাথা থেকেই বের হয়। সেগুলো তারা নিজেরাই করে না কেন? 'আমি আসলেই দুর্ভাগা! ওরা কত ভাগ্যবান!'

যখন আমি সিনিয়র ভিক্ষু হয়ে উঠলাম, তখন আমি ভালো খাবার খেলাম, নরম গদিতে বসলাম, আর কায়িক পরিশ্রম কমই করলাম। তাতেও জুনিয়র ভিক্ষুদের আমার হিংসে হলো। তাদের তো আর ধর্মদেশনা দিতে হয় না। সারা দিন লোকজনের সমস্যাগুলো শুনতে হয় না। বিহার পরিচালনায় তো আর তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করতে হয় না। তারা দায়িত্বমুক্ত আর নিজের জন্য তাদের আছে অনেক অনেক সময়। আমি নিজেই নিজেকে বলতে শুনলাম, 'আমি বেচারা দুর্ভাগা! ওরা কত ভাগ্যবান!'

পরে আমি বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। জুনিয়র ভিক্ষুদের আছে 'জুনিয়র ভিক্ষু হওয়ার দুঃখকষ্ট'। সিনিয়র ভিক্ষুদের আছে 'সিনিয়র ভিক্ষু হওয়ার দুঃখকষ্ট'। যখন আমি সিনিয়র ভিক্ষু হলাম, তখন দুঃখকষ্টগুলোর রূপটাই কেবল পাল্টে গিয়েছিল। ঠিক একই ব্যাপার ঘটে যখন ব্যাচেলর লোকেরা বিবাহিত লোকদের হিংসে করে, আর বিবাহিত লোকেরা হিংসে করে ব্যাচেলরদের। আমাদের সবারই এখন জানা উচিত যে, বিয়ে করে আমরা কেবল ব্যাচেলর জীবনের দুঃখকষ্টগুলোর সাথে বিবাহিত জীবনের দুঃখকষ্টগুলো বদলাবদল করছি। আর যখন আমাদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়, তখন আমরা বিবাহিত জীবনের দুঃখকষ্টগুলোর সাথে একাকী জীবনের দুঃখষ্টগুলোর বদলাবদল করছি মাত্র। এভাবেই এটা চলতে থাকে। বেচারা আমি, ভাগ্যবান তারা!

কোনো কিছু হয়ে তবেই আপনি সুখী হবেন এমন ভাবাটা মোহ। অন্য কোনো কিছু হয়ে দুঃখকষ্টের রূপটাই যা পাল্টায়। কিন্তু যখন আপনি এখন যেমন তাতেই সন্তুষ্ট হন, সেটা জুনিয়র বা সিনিয়র, বিবাহিত বা অবিবাহিত, ধনী বা গরিব, যা-ই আপনি হোন না কেন, আপনি তখন দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত। তখন

আপনি ভাবতে পারেন, ভাগ্যবান এখন আমি, বেচারা তারা!

অসুস্থ হলে তার জন্য উপদেশ

উত্তরপূর্ব থাইল্যান্ডে তখন আমার ভিক্ষু হয়ে অবস্থানের দ্বিতীয় বছর। টাইফাস জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম আমি। জ্বর এমন ছিল যে উবনের আঞ্চলিক হাসপাতালে ভিক্ষুদের ওয়ার্ডে ভর্তি করাতে হলো আমাকে। সেই দিনগুলোতে, ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে উবন ছিল একটা হতদরিদ্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল। আমার শরীর তখন খুব দুর্বল ও সারা গায়ে ব্যথা। হাতে এক জায়গায় ক্ষত। এমন অবস্থায় আমি দেখলাম, পুরুষ নার্সটা বিকেল ৬টায় চলে যাচ্ছে। আধ ঘণ্টা পরেও তার বদলে কোনো নার্স এলো না। আমি পাশের বেডের ভিক্ষুকে বললাম, রাতের নার্স তো এখনো এলো না। ব্যাপারটা কাউকে জানানো দরকার। আমাকে তাড়াতাড়ি জানিয়ে দেওয়া হলো ভিক্ষুদের ওয়ার্ডে রাতে কোনো নার্স থাকে না। রাতের বেলায় যদি আপনার খারাপ কিছু হয়ে যায়, সেটা আপনার কর্মফল। অসুস্থ হয়ে এমনিতেই খুব খারাপ লাগছিল আমার। আর এটা জেনে তো রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে গেলাম আমি।
চার সপ্তাহ ধরে আমার পাছায় সকাল বিকেলে এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিত বুনো মোষের মতো এক পুরুষ নার্স। এটা ছিল তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশের একটা হাসপাতাল। তাই একই সুঁচ বার বার ব্যবহার করা হতো, যা এমনকি ব্যাংককেও এত বেশিবার ব্যবহার করার অনুমোদন ছিল না। সেই শক্তিশালী হাতের নার্সটা, ইনজেকশন দেওয়ার সময় মাংসে সুঁচ ঢুকাতে গিয়ে আক্ষরিক অর্থেই সজোরে কোপাত আমাকে। ভিক্ষুদের কঠিন ও অসাধারণ সহ্যক্ষমতাসম্পন্ন হিসেবে আশা করা হয়, কিন্তু আমার পাছা এমন ছিল না। সেখানে খুব ব্যথা করত। আমি তখন সেই নার্সটাকে ঘৃণা করতাম। আমার সারা গায়ে ব্যথা, দুর্বল। জীবনে এত দুর্বিষহ ভাব কখনো বোধ করি নি। এমন অবস্থায় এক বিকেলে আজান চাহ্ আসলেন ভিক্ষুদের ওয়ার্ডে আমাকে দেখতে। আমাকে দেখতে! আমি এত খুশি ও মুগ্ধ হলাম, বলার নয়। আনন্দে যেন ভাসছিলাম আমি। এত দারুণ বোধ করছিলাম যতক্ষণ না আজান চাহ্ তার মুখ খুললেন। তিনি যা বললেন, পরে আমি জেনেছি তা তিনি হাসপাতালে অনেক অসুস্থ ভিক্ষুকেই বলেছেন।

তিনি আমাকে বললেন, 'হয় তুমি ভালো হয়ে উঠবে, নয়তো মরবে।' এই বলে তিনি চলে গেলেন।
আমার আনন্দ ভেঙে খান খান হয়ে গেল। তার আসায় আমার যে খুশি লেগেছিল তা নিমিষেই উধাও হয়ে গেল। সবচেয়ে খারাপ জিনিসটা হলো যে, আপনি কখনোই আজান চাহ-র কথায় ভুল ধরতে পারবেন না। তিনি যা বলে গেলেন তা ছিল খাঁটি সত্য। আমি হয় ভালো হয়ে উঠব, নয় মারা যাব। যা-ই হোক না কেন, অসুস্থতার বেদনা আর থাকল না । অবাক করা ব্যাপার, সেটা ছিল খুব আশ্বস্ত হওয়ার বিষয়। ফলে যা ঘটল, আমি মরলাম না; বরং ভালো হতে শুরু করলাম। কী দারুণ এক শিক্ষক আজান চাহ!

অসুস্থ হওয়াতে সমস্যা কোথায়?

বক্তৃতার সময় আমি প্রায়ই শ্রোতাদের বলি, তারা যদি কখনো অসুস্থ হয়ে থাকে, তাহলে যেন হাত তোলে। প্রায় প্রত্যেকেই তাদের হাত তোলে। (যারা তোলে না, তারা হয় ঘুমিয়েছিল, নয়তো কোনো যৌন কল্পনায় বিভোর ছিল!) আমি তাদের যুক্তি দেখাই, এটাই প্রমাণ করে যে অসুস্থ হওয়াটা স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে সময়ে সময়ে অসুস্থ না হওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক। তাই আমি বলি, ডাক্তারের সাথে দেখা করার সময় এটা কেন বলেন, 'আমার কোন সমস্যা

হয়েছে, ডাক্তার?' মাঝেমধ্যে অসুস্থ না হলে সেটাই তো সমস্যা। তাই একজন যুক্তিবাদী মানুষ তার বদলে বলে, 'আমার সবকিছু ঠিকঠাক চলছে ডাক্তার। আমি আবার অসুস্থ হয়েছি!'

অসুস্থতাকে সমস্যা হিসেবে দেখা মানে হচ্ছে খারাপ লাগার সাথে সাথে অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগ ও অপরাধবোধ যোগ করা। উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাস 'আরওন' এ স্যামুয়েল বাটলার এক সমাজের ছবি আকেন মনে মনে, যেখানে অসুস্থতা হলো একটা অপরাধ, আর বিচারকেরা এটাকে ধারাবাহিক অপরাধ হিসেবেই বিবেচনা করেন। উপন্যাসের একটা অনুচ্ছেদে এমন আছে যে, উপন্যাসের নায়ককে সামান্য সর্দি হওয়ার কারণে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে হয়েছিল। এ সবকিছু হয়েছিল নিজের দোষেই, সে বাইরের খাবার খেয়েছিল। যথেষ্ট ব্যায়াম করে নি, আর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভরা জীবনযাপন করেছে। এজন্য তাকে কয়েক বছরের জেল দেওয়া হয়।

যখন আমরা অসুস্থ হই, কতজন নিজেদের দোষী ভাবী বলুন তো? একজন সতীর্থ ভিক্ষু অনেক বছর ধরে এক অজানা রোগে ভুগছিল। সে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ বিছানায় কাটাত সারা দিন। সে এত দুর্বল ছিল যে রুমের বাইরেও হেঁটে যেতে পারত না। বিহার কতর্পৃক্ষ তার চিকিৎসার কোনো কিছুই বাদ রাখে নি। সাধ্যমতো মেডিকেল থেরাপি, প্রবীণ বৈদ্য ও বিকল্প চিকিৎসা, সবকিছুই করা হয়েছে। কিছুতেই কিছু হয় নি। সে মনে করত একটু ভালো বোধ করছে, আর বাইরে একটু হাঁটতে বেরোত। এরপর আবার সপ্তাহ যাবৎ বিছানায় থাকতে হতো। অনেকবার তারা মনে করেছে যে সে মারা যাবে।

একদিন বিহারাধ্যক্ষ সমস্যাটার একটা দারুণ সমাধান খুঁজে পেলেন। তিনি অসুস্থ ভিক্ষুর রুমে গিয়ে হতাশ চোখে চেয়ে রইলেন। তিনি বললেন, 'আমি এসেছি এই বিহারের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পক্ষ থেকে, উপাসক-উপাসিকাদের পক্ষ থেকে। এরা সবাই তোমাকে ভালোবাসে ও যত্ন নেয়। এদের সবার পক্ষ হয়ে আমি তোমাকে মরার অনুমতি দিচ্ছি। তোমার আর সেরে ওঠার দরকার নেই।'

এই কথায় ভিক্ষুটি কেঁদে উঠল। সে কত চেষ্টা করেছে ভালো হয়ে ওঠার জন্য। তার বন্ধুরা কত কষ্ট করে তার রোগগ্রস্ত শরীরকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে, সে তাদের মর্মাহত করতে চায় নি। সুস্থ হতে না পেরে সে নিজেকে এমন ব্যর্থ, এমন অপরাধী ভাবছিল যে বলার নয়। অধ্যক্ষের কথা শুনে তখন তার আর অসুস্থ হতে কোনো পিছুটান রইল না। সে এখন মরতে পারে। বন্ধুদের খুশি করার জন্য সুস্থ হওয়ার আর কোনো প্রয়োজন নেই। বিশাল দায়িত্ববোধ থেকে ভারমুক্ত হয়ে পরম স্বস্তিতে সে কেঁদে ফেলল।

এর পরে কী হলো বলে আপনার মনে হয়? সেদিন থেকে সে আরোগ্য লাভ করতে শুরু করল।

অসুস্থ কোনো রোগীকে দেখতে যাওয়া

হাসপাতালে কাউকে দেখতে গিয়ে আমাদের মধ্যে কতজন বলেন, 'আজকে কেমন বোধ হচ্ছে?'
শুরুতেই কী বোকার মতো কথা! অবশ্যই তারা জঘন্য বোধ করছে। তা না- হলে তো তারা হাসপাতালেই থাকত না। থাকত কি? তা ছাড়া এই সাধারণ

শুভেচ্ছাসূচক কথাটা রোগীকে গভীর মানসিক উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দেয়। তারা ভাবে, সত্যি কথাটা বললে হয়তো দর্শনার্থীর মন খারাপ হয়ে যাবে। এত কষ্ট করে মূল্যবান সময় ব্যয় করে হাসপাতালে দেখতে এলো, এমন সহৃদয় লোককে কীভাবে মনে দুঃখ পাওয়ার মতো এমন জবাব দেবে সে? কীভাবে বলবে যে, সে এখন অসহায় বোধ করছে, বাসি হয়ে যাওয়া চা পাতার মতো অচল বোধ করছে? তাই তার বদলে সে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়, 'মনে হয় আজকে একটু ভালো বোধ করছি।' আর মনে মনে নিজেকে দোষী ভাবে, সুস্থ হচ্ছে না কেন!

দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক দর্শনার্থীই রোগীকে আরও অসুস্থ বোধ করতে দেন। তিববতীয় বৌদ্ধধর্মের অনুসারী এক অস্ট্রেলিয়ান ভিক্ষুণী পার্থের এক হাসপাতালে ক্যান্সারে মারা যাচ্ছিল। আমি তাকে কয়েক বছর ধরে চিনতাম, আর প্রায়ই তাকে হাসপাতালে দেখতে যেতাম। একদিন সে আমার বিহারে ফোন করে আমাকে অনুরোধ করল তাকে সেদিন দেখতে যাওয়ার জন্য। কারণ, তার মনে হচ্ছিল তার সময় ঘনিয়ে আসছে। তাই আমি কাজ ফেলে দ্রুত একজনকে নিলাম সত্তর কিলোমিটার দূরে সেই হাসাপাতালে আমাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। হাসপাতালে অভ্যর্থনা কক্ষের নার্সটা কড়াভাবে শুনিয়ে দিল যে তিববতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর কড়া নির্দেশ, যেন কেউ তাকে দেখতে না যায়।

আমি ভদ্র সুরে বললাম, 'কিন্তু আমি এত দূর থেকে এসেছি শুধু তাকে দেখার জন্য।'

নার্সটা খেঁকিয়ে উঠল, 'আমি দুঃখিত। সে কোনো দর্শনার্থী চায় না, আর আমাদের তার ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে।'

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, 'কিন্তু ব্যাপারটা এমন হতেই পারে না। সে দেড় ঘণ্টা আগে আমাকে ফোন করে আসতে বলেছে।'

নার্সটি অগ্নিঝরা দৃষ্টিতে আমাকে ভস্ম করার চেষ্টা করে, পরে তাকে অনুসরণ করতে বলল। আমরা সেই অস্ট্রেলিয়ান ভিক্ষুণীর রুমের বাইরে দাঁড়ালাম।

নার্সটি বন্ধ দরজার উপরে সাঁটানো বড় বড় করে লেখা কাগজটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

'একদম কোনো দর্শনার্থী নয়।' 'দেখলেন তো!' নার্সটি বলল।

একটু ভালো করে দেখতেই সেই লেখাটার নিচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা দেখতে পেলাম, '... আজান ব্রাহ্ম বাদে।' তাই আমি ভেতরে গেলাম।

আমি ভিক্ষুণীকে জিজ্ঞেস করলাম, এত কড়া করে নোটিশটা টাঙানোর কারণটা কী? সে ব্যাখ্যা করল এভাবে : যখন তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা তাকে দেখতে আসে, তারা তাকে মরতে দেখে এতই বিষণ্ন ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে তার আরও খারাপ লাগে। সে বলল, ক্যান্সারে মরাটা এমনিতেই যথেষ্ট খারাপ। কিন্তু তার সাথে সাথে দর্শনার্থীদের আবেগীয় সমস্যাগুলোকেও সামাল দিতে হলে আরও খারাপ লাগে।

সে বলল যে, আমিই তার একমাত্র বন্ধু যে তাকে ব্যক্তি হিসেবে দেখে, কোনো মরণাপন্ন হিসেবে নয়, যে তার শোচনীয় অবস্থা দেখেও বিচলিত হয় না। বরং

তার বদলে তাকে মজা করে কৌতুক শোনায় আর হাসায়। তাই এক ঘণ্টা ধরে আমি তাকে কৌতুক শোনালাম, আর সে আমাকে শেখাল কীভাবে একজন মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুকে সাহায্য করতে হয়। আমি তার কাছ থেকে শিখলাম যে, যখন আপনি হাসপাতালে কাউকে দেখতে যাবেন, ব্যক্তির সাথে কথা বলুন। অসুস্থতার ব্যাপারটা ডাক্তার ও নার্সদের হাতেই ছেড়ে দিন।

সে আমার দেখা করার দুদিন পরে মারা গিয়েছিল।

মৃত্যুর হালকা দিক

বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে আমাকে প্রায়ই মৃত্যু সংশ্লিষ্ট কাজ কারবার করতে হয়। আমার কাজের একটা অংশ হলো বৌদ্ধ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াগুলো পরিচালনা করা। ফলে ব্যক্তিগতভাবে পার্থের অনেক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালকের সাথে চেনাজানা হয়ে গেছে আমার। তাদের এই কাজে গুরুগম্ভীর ভাব রাখাটা অপরিহার্য। এজন্যই মনে হয় ব্যক্তিগত আলাপকালে তারা দারুণ রসিক। যেমন, একজন অমেত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালক আমাকে দক্ষিন অস্ট্রেলিয়ার এক কবরের কথা বলেছিল যা মাটির তৈরি একটি গর্তে অবস্থিত। তারা কয়েকবার এটা ঘটতে দেখেছে যে সেই কবরে কফিন নামানোর পর পরই ঝমঝম বৃষ্টি নামে, পানি বেয়ে জমা হতে থাকে গর্তের মধ্যে। পুরোহিত তার প্রার্থনা বলতে বলতেই কফিনটা গর্ত থেকে পুরোপুরি ভেসে ওঠে! পার্থে একজন যাজক ছিল যে তার কাজের প্রথমেই অসাবধানতাবশত ডেস্কের সবগুলো সুইচের উপর ঝুঁকে পড়েছিল। হঠাৎ করে তার বাইবেল পাঠের মাঝখানে পর্দার আড়ালে থাকা কফিনটা নড়তে শুরু করল। মাইক্রোফোনের সংযোগ কেটে গেল, আর দ্য লাস্ট পোস্টের বিউগলের সুর পুরো গির্জা জুড়ে প্রতিধ্বনিত হলো। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মৃত ব্যক্তি একজন শান্তিবাদী ছিল।

একজন বিশেষ অমেত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালকের কৌতুক বলার অভ্যাস ছিল। আমরা শববাহী মিছিলের আগে আগে হাঁটতাম কবরস্থানের দিকে। আর সে আমাকে কৌতুক শোনাত। প্রত্যেকটা কৌতুকের শেষ লাইনে, যেগুলো ছিল খুবই মজার, সে কনুই দিয়ে আমার পাঁজরে খোঁচা মেরে আমাকে হাসানোর চেষ্টা করত। আমি হাসিতে ফেটে পড়া থেকে নিজেকে কোনোমতে সামলে নিতাম। তাই, অনুষ্ঠানস্থলে যাওয়ার সময় আমি তাকে খুব কড়াভাবে এমন দুষ্টামি করতে মানা করতাম, যাতে আমি অনুষ্ঠানস্থলে সবার সামনে একটু মানানসই করে গম্ভীর মুখে থাকতে পারি। কিন্তু তাতে কেবল আরও কৌতুক বলতে উৎসাহিত হতো সে! শয়তান!

পরের বছরগুলোতে আমি বৌদ্ধ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানগুলোতে নিজেকে হালকা মন নিয়ে উপস্থিত থাকতে শিখলাম। কয়েক বছর আগে প্রথমবারের মতো একটা শেষকৃত্যানুষ্ঠানে কৌতুক বলার মতো সাহস সঞ্চয় করলাম। কৌতুকটি শুরু করার পরে, অনুষ্ঠানের পরিচালক শোকার্ত লোকজনের পিছনে দাঁড়িয়ে বুঝে ফেলল আমি কী করতে যাচ্ছি, আর মুখ দিয়ে নানান ভঙ্গি করে আমাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করল। আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। শেষকৃত্য অনুষ্ঠান পরিচালকের চেহারা তার মড়াগুলোর চেয়েও সাদা হয়ে গেল। কৌতুক শেষে গির্জার শোকার্তরা হাসিতে ফেটে পড়ল, আর পরিচালকের উদ্বিগ্ন মুখে স্বস্তির চিহ্ন ফিরে এলো। পরিবার ও বন্ধুরা সবাই পরে আমাকে অভিনন্দন জানাল। তারা বলল যে মৃত ব্যক্তি এমন কৌতুক শুনলে দারুণ উপভোগ করত, আর খুব খুশি

হতো যে তার প্রিয় ব্যক্তিরা তাকে হাসিমুখে বিদায় জানিয়েছে। আমি এখন শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে সেই কৌতুকটা প্রায়ই বলে থাকি। কেন নয়? বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়রা, আপনাদের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে আমি যদি একটা কৌতুক বলি, আপনারা কি তা শুনতে পছন্দ করবেন? এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলে প্রত্যেকবার আমি উত্তর পেয়েছি 'হ্যাঁ!'

তো, কৌতুকটা কী ছিল?

এক বুড়ো দম্পতি দীর্ঘদিন একত্রে সংসার জীবন কাটিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন মারা যাওয়ার কিছুদিন বাদে অন্যজনও মারা গেল। ফলে তারা দুজনেই একত্রে স্বর্গে গিয়ে হাজির হলো। এক সুন্দর দেবদূত তাদের সাগরপাড়ের মনোমুগ্ধকর এক প্রাসাদে নিয়ে গেল। ইহ জগতে কেবল কোটিপতিরাই এমন অসাধারণ বাড়ির মালিক হতে পারে। দেবদূত ঘোষণা করল যে স্বর্গীয় পুরস্কার হিসেবে এই প্রাসাদটা তাদের দেওয়া হয়েছে।

স্বামীটি বেশ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সবকিছুই তো ভালো। কিন্তু আমার মনে হয় না এত বড় সম্পত্তির ট্যাক্স দিতে পারব প্রতিবছর।'

দেবদূত বেশ মিষ্টি করে হেসে বলল যে, স্বর্গে সম্পত্তির উপরে কোনো সরকারি ট্যাক্স দিতে হয় না। এরপর সে তাদের প্রাসাদের রুমগুলো ঘুরিয়ে দেখাল। প্রত্যেকটা রুম খুব রুচিশীলভাবে সাজানো, আসবাবপত্র সব খুব দামী দামী। ছাদ থেকে বহুমূল্যের ঝাড়বাতি ঝুলছে। প্রত্যেক বাথরুমের ট্যাপগুলোতে সোনার কারুকাজ করা। সেখানে ছিল ডিভিডি সিস্টেমস আর অত্যাধুনিক বড় পর্দার টেলিভিশন। ঘুরিয়ে দেখানো শেষ হলে দেবদূত বলল, কোনো কিছু তাদের অপছন্দের আছে কি না। সেরকম থাকলে তাকে বললেই সে মুহূর্তের মধ্যে সেটা পাল্টিয়ে দেবে। সেটাই তাদের স্বর্গীয় পুরস্কার।

স্বামীটি তখন মনে মনে সবকিছুর দাম হিসেব করছিল। সে বলল, 'এগুলো সবই খুব মূল্যবান জিনিসপত্র। আমার মনে হয় না আমরা সম্পত্তি বীমার কিস্তিগুলো চালাতে পারব।'

দেবদূত তার কথা শুনে চোখ পাকাল আর নম্রভাবে বলল যে চোরদের স্বর্গে প্রবেশের অনুমতি নেই, তাই সম্পত্তি বীমারও কোনো দরকার নেই। এর পরে সে তাদের নিয়ে গেল নিচেরতলার বিশাল গ্যারেজে। সেখানে ছিল নতুন একটি সাভ ফোর-উইল ড্রাইভ। তার পাশেই ছিল রোলস রয়েস ট্যুরিং লিমুজিন। তৃতীয় গাড়িটা ছিল বিশেষ লাল রঙের ফেরারি স্পোর্টস কার, যার ছাদটা ইচ্ছে করলে খোলা বা বন্ধ করা যায়। স্বামীটি ইহ জীবনে একটি শক্তিশালী স্পোর্টস কার চেয়েছিল; কিন্তু তা সে কেবল স্বপ্নেই দেখত।

দেবদূত বলল যে, যদি তারা গাড়ির মডেল, রং বদলাতে ইচ্ছে করে, তাকে বললেই হবে। এটা তাদের স্বর্গীয় পুরস্কার।

স্বামীটি মনমরা হয়ে বলল, 'আমরা তো এই গাড়িগুলোর রেজিস্ট্রেশন ফি-ই দিতে পারব না। আর যদি পারিও, এই যুগে স্পোর্টস কার কোন কাজে আসবে?

স্পিড বেশি করলেই তো জরিমানা গুণতে গুণতে আমি শেষ।'

দেবদূত মাথা নেড়ে তাকে ধৈর্যসহকারে বলল যে স্বর্গে কোনো গাড়ি রেজিস্ট্রেশন ফি নেই। সেখানে কোনো স্পিড ক্যামেরাও নেই। সে তার ফেরারি যত স্পিডে চায়, তত চালাতে পারবে। এরপর সে গ্যারেজের দরজা খুলে দিল। রাস্তার ওপাশে ছিল ১৮টি গতর্ও য়ালা বিরাট গলফ খেলার মাঠ। দেবদূত বলল যে স্বর্গে তারা আগেই জানে, স্বামী কী রকম গলফ খেলা পছন্দ করে। সেই সাথে আরও বলে দিল এই গলফ মাঠের ডিজাইন করেছে টাইগার উডস নিজে। কিন্তু স্বামীটির মুখ তখনো বিষণ্ণ সে বলল, 'এটা তো খুব ব্যয়বহুল গলফ ক্লাব বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় না আমি এই ক্লাবের ফি চালাতে পারব।'

দেবদূত ঘোঁত করে উঠল তার কথা শুনে। এর পরে সে দেবদূতসুলভ চেহারা করে স্বামীটিকে বলে দিল যে স্বর্গে কোনো ফি নেই। তা ছাড়া স্বর্গের গলফ কোর্সগুলোতে টি-অফের জন্য লাইন ধরতে হয় না। বলগুলো খাদে পড়ে যায় না। ঘাসগুলো এমনভাবে বিছানো, যেদিকে খুশি মারলেই হবে, বল সোজা গর্তে গিয়ে পড়বে। এটা তাদের স্বর্গীয় পুরস্কার।
দেবদূত চলে যাওয়ার পরে স্বামীটি তার স্ত্রীকে বকা শুরু করল। সে তার উপরে এমন খেপে গিয়েছিল যে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলল। বেচারী স্ত্রী বুঝতেই পারল না কেন এত রাগ তার স্বামীর। মিনতি ঝরল তার কণ্ঠে, 'তুমি আমার উপরে এত রেগে আছো কেন? আমাদের এমন চমৎকার প্রাসাদ হয়েছে, কত সুন্দর আসবাবপত্র! তুমি তোমার ফেরারি গাড়ি পেয়েছ। রাস্তার ওপাশেই গলফ মাঠ। এত রেগে আছো কেন আমার উপর?'

স্বামীটি তিক্ত সুরে বলল, 'কারণ, হে স্ত্রী, তুমি যদি আমাকে অমন স্বাস্থ্যসম্মত খাবার না দিতে, অনেক বছর আগেই আমি এখানে আসতে পারতাম!'

শোক, হারানো এবং জীবনকে উদযাপন করা

আমরা হারানোর সাথে যা যোগ করি, তা-ই হচ্ছে শোক। এটা হচ্ছে শেখানো প্রতিক্রিয়া, যা মাত্র কয়েকটা সংস্কৃতিতে দেখা যায়। শোক অনিবার্য নয়। আমি এটা জেনেছি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, আট বছরেরও বেশি সময় ধরে খাঁটি এশিয়ান বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে ডুবে থেকে। সেই সময়ে থাইল্যান্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানকার একটি বৌদ্ধ বনবিহারে আমি ছিলাম, সেখানে পশ্চিমা সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাদের বিহারটা তখন আশেপাশের গ্রামগুলোর জন্য শব পোড়াবার স্থান হিসেবে কাজ করত। প্রায় প্রতিসপ্তাহে মৃতদেহ পোড়ানো হতো। সেই ১৯৭০ সালের শেষার্ধে শত শত দাহক্রিয়া দেখেছি আমি; কিন্তু কাউকেই কাঁদতে দেখি নি। পরের দিনগুলোতে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনদের সাথে কথা বলেছি; কিন্তু তাদের মাঝে কোনো শোকের চিহ্ন দেখি নি। স্বীকার করতেই হবে যে সেখানে কোনো শোক নেই। আমি জেনেছিলাম যে সেই সময়কার উত্তরপূর্ব থাইল্যান্ডে, যেখানে বহু শত বছর ধরে বুদ্ধের শিক্ষা বিরাজমান ছিল, সেখানে মৃত্যুকে সবাই এমনভাবে গ্রহণ করত, যা প্রিয়জন হারানো এবং শোকের পশ্চিমা ধ্যানধারণাগুলোকে অস্বীকার করে।

সেই বছরগুলো আমাকে শিখিয়েছিল যে শোকের বিকল্প কিছু আছে। শোক যে ভুল তা নয়; কিন্তু তার অন্য একটা সম্ভাবনা আছে। প্রিয়জন হারানোকে অন্যভাবেও দেখা যায়, যা দীর্ঘদিন শোকে কাতর হয়ে দুঃখ পাওয়া থেকে মুক্তি দেয়।

আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন যখন আমার বয়স ষোল। তিনি ছিলেন আমার জন্য মহামানব। তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি তার কথার মাঝে আমাকে ভালোবাসার মানে খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিলেন, 'তুমি জীবনে যা-ই করো না কেন, পুত্র, আমার হৃদয়ের দরজা তোমার জন্য সব সময় খোলা থাকবে।' যদিও তার জন্য আমার ভালোবাসা ছিল বিশাল, আমি তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে কাঁদি নি। আমি তার জন্য আর কোনো দিন কাঁদি নি। তার অকালমৃত্যুতে কাঁদতে হবে, এমনটাও কখনো বোধ করি নি। তার মৃত্যুকে ঘিরে আমার এই আবেগকে বুঝে উঠতে অনেক সময় লেগে গিয়েছিল। আমি নিচের গল্পের মাধ্যমে সেটা বুঝেছিলাম, যা আমি এখানে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি।

তরুণ হিসেবে আমি খুব গান পছন্দ করতাম। রক গান থেকে শুরু করে ক্লাসিক, জ্যাজ হতে ফোক গান, সব। লন্ডন ছিল ১৯৬০ ও ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে এক অবিশ্বাস্য শহর, বিশেষ করে আপনি যদি গান ভালোবাসেন। আমার মনে পড়ে লেড জেপেলিন ব্যান্ডের প্রথম নার্ভাস গানের মহড়ায় আমিও উপস্থিত ছিলাম, যেটি সোহোর একটি ছোট ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অন্য এক সময়ে আমরা কয়েকজন উত্তর লন্ডনের ছোট এক মদের দোকানের উপরের এক রুমে একটা রক গ্রুপের সামনে তখনকার সময়ে অখ্যাত রড স্টুয়ার্টকে দেখেছিলাম গান করতে। সেকালের লন্ডনের গানের জগতের কত মূল্যবান স্মৃতি আমার কাছে এখনো রয়ে গেছে।

বেশির ভাগ কনসার্টের শেষে অন্যান্যদের সাথে আমিও চেঁচিয়ে উঠতাম, 'আরেকটা! আরেকটা!'
সাধারণত ব্যান্ড দল বা অর্কেস্ট্রা আরও কিছুক্ষণ বাজাত, যদিও একসময় তারা তাদের যন্ত্রপাতি গুছিয়ে বাড়ি চলে যেত। আমিও চলে আসতাম। আমার স্মৃতিতে ভাসে যে প্রতিসন্ধ্যায় যখনই আমি ক্লাব, পাব অথবা কনসার্ট হল থেকে ঘরের দিকে হেঁটে ফিরেছি, তখন সব সময়ই বৃষ্টিতে ভিজেছি। লন্ডনের এমন শুকনো টাইপের বৃষ্টির জন্য বিশেষ একটা শব্দ আছে : ড্রিজল বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। প্রতিবারই কনসার্ট হল থেকে বেরোনোর সময় আমি খেয়াল করতাম যে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, চারদিকে ঠান্ডা ও অন্ধকার ভাব।

আমি মনের গভীরে জানতাম যে সম্ভবত আর কখনোই তাদের গান শোনার সুযোগ হবে না আমার। তারা আমার জীবন থেকে চলে গেছে চিরকালের জন্য। কিন্তু তাতে আমি একবারও বিষণ্ণতা অনুভব করি নি বা কান্না কান্না ভাব বোধ করি নি। লন্ডনের সেই ঠান্ডা, ভেজা আলো আধারির রাতে বেরিয়ে এসে আমার মনে তখনো বাজতে থাকত তাদের গান। কী অসাধারণ গান! কী দারুণ পারফরম্যান্স! আমি কী সৌভাগ্যবান যে এ সময় আমি কনসার্টে উপস্থিত ছিলাম! দারুণ এসব কনসার্টের পর আমার মনে কোনো শোক অনুভব করিনি।

আমার বাবার মৃত্যুর পরও আমি ঠিক এমনটাই অনুভব করেছিলাম। মনে হয়েছিল যেন দারুণ এক কনসার্টের সমাপ্তি ঘটেছে। এটা খুব চমৎকার একটা পারফরম্যান্স ছিল। যখন এটি শেষ পর্যায়ে এসে গিয়েছিল, আমি জোরে জোরে চিৎকার করেছিলাম, 'আরেকটু! আরেকটু!' আমার প্রিয় বৃদ্ধ বাবা সত্যিই আরেকটু সময় কাটাতে চেয়েছিলেন আমাদের সাথে। কিন্তু একসময় তাকে তার জিনিসপত্র গুটিয়ে বাড়ি চলে যেতে হলো। তার শেষকৃত্যের পরে আমি মর্টলেকের ক্রেমাটোরিয়াম থেকে লন্ডনের ঠান্ডা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে বেরিয়ে আসছিলাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিটা আমার পরিষ্কার মনে আছে। আমি জানতাম, আর

কখনোই তার সাথে দেখা হবে না আমার। তিনি আমার জীবন থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছেন। তাই বলে আমি বিষণ্ন বোধ করি নি। আমার কান্নাও আসে নি। আমি শুধু মনে মনে অনুভব করেছিলাম, কী অসাধারণ পিতা ছিলেন তিনি! কী দারুণ অনুপ্রেরণাদায়ী জীবন ছিল তার! আমি কী সৌভাগ্যবান যে তার সাথে থাকতে পেরেছি! কী সৌভাগ্য যে আমি এমন পিতার সন্তান হয়েছি!

ভবিষ্যতের দীর্ঘ পথ হাঁটতে গিয়ে আমি যখন মায়ের হাত ধরেছিলাম, ঠিক একই রোমাঞ্চকর অনুভূতি কাজ করছিল আমার মনে, যেমনটা আমার জীবনে ঘটে যাওয়া বিরাট সব কনসার্টের শেষে অনুভব করেছি। আমি এমন অনুভূতি পৃথিবীর বিনিময়েও মিস করতে চাই না। তোমাকে ধন্যবাদ, বাবা।

শোক হচ্ছে আপনার কাছ থেকে কী কেড়ে নেওয়া হয়েছে তা দেখা। জীবনের উদযাপন করা হচ্ছে আমরা যা যা পেয়েছি তা দেখে তার জন্য খুব কৃতজ্ঞতা অনুভব করা।

ঝরা পাতা

সম্ভবত মৃত্যুর মধ্যে যে মৃত্যুকে মেনে নেওয়া সবচেয়ে কঠিন হয়, তা হচ্ছে কোনো শিশুর মৃত্যু। বিভিন্ন সময়ে কোনো ছোট ছেলে বা মেয়ের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান পরিচালনা করার সুযোগ হয়েছে আমার, যাদের জীবনের অভিজ্ঞতাই খুব বেশি দিনের হয় নি। আমার কাজ হচ্ছে শোকে বিহবল পিতামাতাকে, সাথে অন্যান্যদেরও মনের দুঃখ কাটিয়ে ওঠার জন্য পথ দেখাতে সাহায্য করা, আর সেই বদ্ধমূল প্রশ্নটার উত্তর খোঁজার যাতনার ভার লাঘব করা, যে প্রশ্নটি হচ্ছে, ‘কেন?’

আমি প্রায়ই নিচের গল্পটি বলি, যা অনেক বছর আগে থাইল্যান্ডে শুনেছিলাম।

একজন সাধারণ বনভিক্ষু জঙ্গালের মধ্যে এক পর্ণকুটিরে ধ্যান করছিল। এক সন্ধ্যায় প্রচন্ড বেগে ঝড় বয়ে গেল। বাতাসের গর্জন শোনাল যেন জেট বিমানের ইঞ্জিনের মতো। ভারী বৃষ্টি তার কুটিরে আচড়ে পড়ছিল। রাত যতই বাড়তে লাগল, ঝড় ততই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। প্রথমে গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ার শব্দ শোনা গেল। পরে বাতাসের তোড়ে শেকড়সুদ্ধ গাছ উপড়ে এলো, আর বজ্রপাতের শব্দের মতো মাটিতে আছড়ে পড়ল।
ভিক্ষুটি শীঘ্রই বুঝতে পারল যে তার ঘাসের কুটিরটা তাকে রক্ষা করতে পারবে না। কুটিরে যদি কোনো গাছ আছড়ে পড়ে, অথবা নিদেনপক্ষে কোনো বড় ডাল যদি নেমে আসে, তাহলে এটি সোজা কুটিরকে চাপা দিয়ে তাকেও মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলবে।

সে সারা রাত ঘুমাল না। সেই রাতে প্রায়ই সে শুনল বড় বড় গাছগুলো হুড়মুড় করে মাটিতে আছড়ে পড়ছে সশব্দে। প্রতিবার এমন শব্দে তার হৃদয় কেঁপে উঠল। ভোর হওয়ার কিছু আগে, যেমনটি প্রায়ই হয়, ঝড় থেমে গেল। আলো ফুটতেই ভিক্ষুটি বেরিয়ে পড়ল কুটিরের কী হাল হয়েছে দেখতে। অনেক বড় বড় ডালপালা, আর দুটো বড় আকারের গাছ একটুর জন্য কুটিরকে মিস করেছে। এত কিছুর পরেও বেঁচে থাকতে পেরে সে খুব ভাগ্যবান অনুভব করল। হঠাৎ তার দৃষ্টি আকর্ষিত হলো উপড়ে যাওয়া গাছ এবং ছড়ানো ছিটানো ডালপালার দিকে নয়, বরং অসংখ্য পাতার দিকে, যা পুরু হয়ে ছড়িয়ে ছিল

জঙ্গালের সবখানে।

সে যেমনটা ভেবেছিল, মাটিতে পড়ে থাকা বেশির ভাগ পাতাই হচ্ছে বুড়ো ও বাদামী রঙের পাতা যেগুলো পূর্ণজীবন কাটিয়েছে। সেই বাদামী পাতাগুলোর মাঝে ছিল অনেকগুলো হলদে পাতা। তার সাথে ছিল কিছু সবুজ পাতাও। সেই সবুজ পাতাগুলোর মধ্যে কয়েকটা এমন সতেজ ও উজ্জ্বল সবুজ রঙের পাতা ছিল যে সে দেখেই বুঝতে পারল এগুলো কুঁড়ি থেকে পাতা হয়েছিল ঝরে পড়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। সেই মুহূর্তে ভিক্ষুটির হৃদয়ে মৃত্যুর স্বভাব প্রকটিত হলো। সে তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা সত্যকে পরখ করে নিতে চাইল। তাই সে উপরে গাছগুলোর ডালপালার দিকে তাকাল। সত্যিই, গাছগুলোতে যে পাতাগুলো রয়ে গেছে, তাদের বেশির ভাগই তরুণ সতেজ সবুজ পাতা, তাদের জীবনের মধ্যগগনে। যদিও অনেক নতুন কচি সবুজ পাতা মাটিতে ঝরে পড়ে আছে, তবুও পুরনো, বুড়ো হয়ে যাওয়া কোঁকড়ানো বাদামী পাতাগুলোও ডালপালাগুলোতে টিকে আছে এখনো। ভিক্ষুটি হাসল। সেদিন থেকে কোনো শিশুর মৃত্যুই তাকে বিচলিত করে নি।

যখন আমাদের পরিবারের উপর দিয়ে মৃত্যুর ঝড় বয়ে যায়, সে সাধারণত উড়িয়ে নেয় বৃদ্ধদের, কুঁচকানো বাদামী পাতাগুলোকে। সেই সাথে আরও অনেক মধ্যবয়স্ক লোকদেরও নিয়ে যায়, যেমনটা গাছের হলদে পাতাগুলোর মতো। তরুণরাও মারা যায়, তাদের জীবনের প্রারম্ভেই, ঠিক সবুজ পাতাগুলোর মতো। মাঝে মাঝে মৃত্যু এসে ছোট বাচ্চাদের জীবনও কেড়ে নেয়, ঠিক যেমনটা প্রকৃতির ঝড় এসে ছিড়ে নেয় কুঁড়ি থেকে সদ্য গজানো পাতাগুলোকে। এটাই আমাদের মৃত্যুর অপরিহার্য চরিত্র, ঠিক যেমনটি দেখা যায় বনের মাঝে ঝড়ের চরিত্রটিতে।

একজন শিশুর মৃত্যুতে কাউকে দোষ দেওয়া বা কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার কিছু নেই। ঝড়কে কে দোষ দিতে পারে? আর এটিই আমাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করে, কেন শিশুরা মারা যায়? উত্তরটা হচ্ছে, সেই একই কারণ, যার জন্য ঝড়ে কিছু সংখ্যক সদ্যজাত সবুজ পাতা ঝরে যায়।

মৃত্যুর উত্থান-পতন

বোধ করি সবচেয়ে আবেগময় দৃশ্যের অবতারণা ঘটে যখন শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে কফিনটাকে কবরে নামানো হয় অথবা ক্রেমাটোরিয়ামে কফিনকে ভেতরে নেওয়ার জন্য যখন সুইচ টিপে দেওয়া হয়। এটা যেন প্রিয় ব্যক্তির সর্বশেষ শারীরিক চিহ্নকে শোকার্ত পরিবারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে চিরকালের জন্য। এমন মুহূর্তে প্রায়ই চোখের পানি ধরে রাখা যায় না। এমন মুহূতর্গুলো আরও কঠিন হয় পার্থের কয়েকটা ক্রেমাটোরিয়ামে। সেখানে সুইচ টিপলে কফিনটি নিচে নেমে যায় যেখানে চুল্লিটি অবস্থিত। এটা অনেকটা কবর দেওয়ার মতো দেখায়। তবে একজন মৃত ব্যক্তির নিচের দিকে নেমে যাওয়াটা অবচেতন মনে অনেকটা নরকে নেমে যাওয়ার মতো লাগে! প্রিয় ব্যক্তিকে হারানো এমনিতেই যথেষ্ট কষ্টের। তার সাথে যমালয়ে নেমে যাওয়ার সাদৃশ্য যোগ হলে তা সহ্য করাটা একটু কঠিন হয়ে পড়ে।

অতএব আমি একবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে এমনভাবে ক্রেমাটোরিয়াম নির্মাণ করা হোক যাতে করে প্রিস্ট যখন মৃতদেহকে দাহ করার জন্য সুইচ টিপবে,

কফিনটা ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাবে। একটা সাধারণ হাইড্রলিক লিফটই এই কাজটা করতে পারে। কফিনটা ছাদে পৌঁছালে ঘুরন্ত শুকনো বরফের মাঝে হারিয়ে যাবে, এর পরে এটি একটি লুকোনো দরজার মাঝ দিয়ে উপরে উঠে যাবে, তখন বাজতে থাকবে স্বর্গীয় সঙ্গীত। শোকার্তদের মাঝে তা মানসিকভাবে খুব উৎফুল্লকর একটা ছাপ ফেলবে।

তবে যারা আমার প্রস্তাব শুনেছে, তাদের কেউ কেউ মন্তব্য করেছে, এতে অনুষ্ঠানের সততা চলে যাবে। বিশেষ করে সবাই যেখানে জানে যে, মৃতব্যক্তি যদি বদমাশ হয়, এমন ব্যক্তি 'উপরে' যেতেই পারে না।

আমি তাই প্রস্তাবটা একটু রদবদল করে নিলাম। প্রস্তাব করলাম যে সবকিছু কাভার দেওয়ার জন্য তিনটা সুইচ রাখা হোক। 'উপরে' সুইচটা হচ্ছে যারা ভালো তাদের জন্য। 'নিচে' বাটনটা হচ্ছে গুন্ডাদের জন্য। 'একপাশে' বাটনটি হচ্ছে বেশির ভাগ বেওয়ারিশ লোকদের জন্য। এর পরে পশ্চিমা সমাজের গণতান্ত্রিক নীতিকে মান্য করে, আর সাথে সাথে এমন নিরস অনুষ্ঠানে একটু রস মিশিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা শোকার্তদের কাছ থেকে হাত তুলে ভোট নিতে পারি, তিনটা সুইচের মধ্যে কোনটা টিপে দেওয়া হবে! এটি শেষকৃত্য অনুষ্ঠানগুলোকে সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত বানিয়ে দেবে, আর এমন অনুষ্ঠানে যেতে চাওয়ার একটা ভালো কারণ হয়ে উঠবে।

এক ব্যক্তি ও তার চার স্ত্রী

জীবনে সফল এক ব্যক্তির চার স্ত্রী ছিল। জীবনের শেষ সময়ে এসে সে তার শয্যাপাশে চতুর্থ স্ত্রীকে ডাকল, সবচেয়ে নতুন ও তরুণী স্ত্রীকে। সে তার সুন্দর ফিগারের দেহে হাত বুলিয়ে বলল, 'প্রিয়তমা, এক কি দুদিন পরে আমি মারা যাব। মরার পরে, আমি তোমাকে ছাড়া একা হয়ে যাব। তুমি কি আমার সাথে আসবে?'

'কোনোমতেই না!' ঘোষণা করে দিল সেই লাস্যময়ী সুন্দরী, 'আমাকে অবশ্যই পিছনে থাকতে হবে। তোমার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে আমি তোমার প্রশংসার জয়গান গাইব। কিন্তু এর বেশি কিছু করতে পারব না।' এই বলে সে গটগট করে হেঁটে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

তরুণী স্ত্রীর এমন শীতল প্রত্যাখান লোকটির হৃদয়ে যেন একটি ছুরি বসিয়ে দিল। সে তার সব মনোযোগ ঢেলে দিয়েছিল তার এই সবচেয়ে তরুণী স্ত্রীকে। সে তাকে নিয়ে এমন গর্বিত ছিল যে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সে তাকে সাথে করে নিয়ে গেছে। এই সুন্দরী স্ত্রী তাকে বৃদ্ধ বয়সে দারুণ মর্যাদা এনে দিয়েছে। এটা জেনে সে অবাক যে, তার স্ত্রী তাকে ভালোবাসে না, যেমনটা কিন্তু সে তাকে ভালোবাসত।

এখনো তার আরও তিনজন স্ত্রী আছে। তাই সে তৃতীয় স্ত্রীকে ডাকল যাকে সে মধ্যবয়সে বিয়ে করেছিল। এই তৃতীয় স্ত্রীর হাত ধরার জন্য তাকে খুব কষ্ট করতে হয়েছিল। তার জীবনে এত আনন্দের উৎস তো তার এই তৃতীয় স্ত্রী। তাই সে তাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তার এই স্ত্রী এমন আকর্ষণীয় ছিল যে অনেকেই তাকে পেতে চাইত। কিন্তু সে সব সময় তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। সে তার স্বামীকে দিয়েছিল নিরাপত্তাবোধ। সে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল,

‘মিষ্টি সোনা আমার, এক কি দুদিন পরে আমি মারা যাব। মরার পরে, আমি তোমাকে ছাড়া একা হয়ে যাব। তুমি কি আমার সাথে আসবে?’

এই সুন্দরী মহিলা ব্যবসায়ীসুলভ ভঙ্গিতে উত্তর দিল, ‘কিছুতেই নয়! এমন জিনিস কখনোই করা হয় নি। আমি তোমাকে জমকালো একটা শেষকৃত্য অনুষ্ঠান করে দেব। কিন্তু এর পরে আমি তোমার সন্তানদের নিয়ে চলে যাব।’

তৃতীয় স্ত্রীর এমন অবিশ্বস্ততা তার অন্তঃস্থলকে নাড়া দিল। সে তাকে চলে যেতে বলে দ্বিতীয় স্ত্রীকে ডেকে পাঠাল।

সে বড় হয়েছে এই দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে। এই স্ত্রীটি যদিও তেমন আকর্ষণীয় নয়, কিন্তু যেকোনো সমস্যায় সাহায্য করার জন্য আশেপাশে ছিল সে সব সময়। আর যেকোনো সমস্যায় অমূল্য উপদেশ দিত সে। সে ছিল তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। সে বিশ্বাসের সাথে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ভালোবাসাময়ী, এক কি দুদিন পরে আমি মারা যাব। মরার পরে, আমি তোমাকে ছাড়া একা হয়ে যাব। তুমি কি আমার সাথে আসবে?’

সে ক্ষমার সুরে বলল, ‘আমি দুঃখিত, আমি তোমার সাথে যেতে পারব না। তোমার কবর পর্যন্ত যেতে পারি, কিন্তু এর বেশি নয়।’

বৃদ্ধ লোকটি ভেঙে পড়ল। সে তার প্রথমস্ত্রীকে ডাকল, যাকে সে মনে হয় চিরকাল ধরে চেনে। সে সম্প্রতি তাকে অবহেলা করেছে। বিশেষত মন ভোলানো সেই তৃতীয় স্ত্রীর দেখা পেয়ে আর সবদিক দিয়ে সেরা তার চতুর্থ স্ত্রীকে পেয়ে। কিন্তু তার এই প্রথমস্ত্রীই তার জন্য সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে আড়াল থেকে কাজ করে গেছে। সে সত্যিই লজ্জা পেল যখন সে তার এই স্ত্রীকে অগোছালো ও শীর্ণ দেহে আসতে দেখল। মিনতি ঝরল লোকটার কণ্ঠে, ‘প্রিয়তমা, এক কি দুদিন পরে আমি মারা যাব। মরার পরে, আমি তোমাকে ছাড়া একা হয়ে যাব। তুমি কি আমার সাথে আসবে?’

সে নির্বিকার স্বরে জবাব দিল, ‘অবশ্যই আমি তোমার সাথে যাব। আমি জন্মজন্মান্তরে তোমার সাথে যাব সব সময়।’

প্রথমস্ত্রীকে বলা হয় ‘কর্ম । দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম হলো ‘পরিবার’। তৃতীয় স্ত্রী ছিল ‘ধনসম্পদ’। চতুর্থ স্ত্রী ছিল ‘যশখ্যাতি’।

প্লিজ, গল্পটা আরেকবার পড়ুন, এখন যেহেতু আপনি চারটি স্ত্রীকে জানেন।
কোন স্ত্রীকে সবচেয়ে বেশি যত্ন নেওয়া দরকার? আপনার মৃত্যু হলে কে আপনার সাথে যাবে?

ধাক্কা খাওয়া

থাইল্যান্ডে আমার প্রথমবছরে আমাদের ছোট একটা ট্রাকে করে এক বিহার থেকে আরেক বিহারে নিয়ে যাওয়া হতো। সিনিয়র ভিক্ষুরা সামনে ড্রাইভারের পাশে ভালো সিটে বসত। আমরা জুনিয়র ভিক্ষুরা বসতাম ট্রাকের পিছনে, কাঠের বেঞ্চের উপরে। বেঞ্চের উপরে ছিল নিচু লোহার ফ্রেম। তার উপরে তেরপাল দিয়ে ঢাকা দেওয়া, ধুলো ও বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য।

রাস্তাগুলো ছিল সব কাঁচা, অযত্ন অবহেলায় বেহাল দশা। যখন চাকাগুলো খাদে পড়ত, ট্রাকটা নিচে নামত আর পিছনে ভিক্ষুরা উপরে উঠে যেত। ঠুস! অনেকবার আমার মাথাটা এই শক্ত লোহার ফ্রেমে ধাক্কা খেয়েছে। অধিকন্তু ন্যাড়া মাথার ভিক্ষু হওয়ায় আঘাতের ধাক্কা কমাবার জন্য মাথায় কোনো কিছু দেওয়ারও উপায় ছিল না। প্রতিবার মাথায় ধাক্কা লাগলে আমি গালাগালি শুরু করতাম, অবশ্যই ইংরেজিতে, যাতে থাই ভিক্ষুরা বুঝতে না পারে। কিন্তু থাই ভিক্ষুরা তাদের মাথায় ধাক্কা লাগলে খালি হাসত। আমি ভেবে কুলকিনারা পেতাম না, মাথায় এমন ব্যথা পেলে হাসি আসে কীভাবে? আমি মনে মনে ভাবতাম, এই থাই ভিক্ষুরা ইতিমধ্যেই মাথায় এত বেশি আঘাত পেয়েছে যে তাদের মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে।

আমি যেহেতু একজন বিজ্ঞানী ছিলাম, তাই আমি একটা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি হাসার সংকল্প করলাম থাই ভিক্ষুদের মতো। এর পরের বার মাথায় বাড়ি লাগলেই হাসব, দেখব কেমন লাগে। আপনি কি জানেন, আমি কী আবিষ্কার করেছিলাম?
আমি দেখেছিলাম যে মাথায় আঘাত পেলে আপনি যদি হাসেন, তাহলে ব্যথা অনেক কম হয়। হাসির ফলে আপনার রক্তস্রোতে এন্ডোরফিনস নিঃসৃত হয় যা প্রাকৃতিক ব্যথানাশক। এটি আপনার রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাকেও সুদৃঢ় করে এবং ইনফেকশন হওয়া থেকে রক্ষা করে। তাই ব্যথা পেলে হাসাটা বেশ কাজের। যদি আপনি এখনো আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তাহলে পরের বার মাথায় বাড়ি খেলে হাসার চেষ্টা করুন।

অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে যে যখন জীবন ব্যথাময় হয়, তখন যদি আপনি এর মজার দিকগুলো খুঁজে নিয়ে হাসতে পারেন, তাহলে ব্যথা অনেক কম হয়।

গুবরে পোকা ও তার আকর্ষণীয় গোবরের স্তুপ

কিছু কিছু লোক ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে চায় না। যদি তাদের নিজস্ব কোনো উদ্বিগ্ন হওয়ার ব্যাপার না থাকে, তাহলে তারা টেলিভিশনের কাল্পনিক চরিত্রগুলোর ঝামেলাগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। অনেকে উদ্বেগকে প্রেরণাদায়ী মনে করে। মনে করে, যা কষ্টের, তা-ই ভালো, তা-ই মজার। তারা সুখী হতে চায় না। কারণ, তারা তাদের দুঃখের বোঝাগুলো নিয়ে খুব বেশি সংশ্লিষ্ট।

দুজন বন্ধু সারা জীবন ধরে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। মৃত্যুর পরে তাদের একজনস্বর্গে দেবতা হিসেবে, আরেকজন গোবরের স্তুপে গুবরে পোকা হিসেবে জন্ম নিল। দেবতা শীঘ্রই তার বন্ধুর অভাব বোধ করতে লাগল, আর মনে মনে ভাবল কোথায় সে জন্মেছে। সে যে স্বর্গে জন্মেছে, সেখানে কোথাও তার বন্ধুকে খুঁজে পেল না। তাই সে অন্যান্য স্বর্গেও দিব্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করল। কিন্তু তার বন্ধুর দেখা সেখানেও মিলল না। এবারে সে মানবজগতে মানুষদের মাঝে খুঁজে দেখল তার দিব্যদৃষ্টি দিয়ে, কিন্তু সেখানেও তাকে খুঁজে পেল না। নিশ্চয়ই তার বন্ধু পশুপাখির জগতে জন্ম নেয় নি। কিন্তু সে তবুও নিশ্চিত হতে চাইল। তবে সেখানেও তার আগের জন্মের বন্ধুর খোঁজ মিলল না। তাই এবার সেই দেবতা বুকে হেঁটে চলা কীটপতঙ্গের জগতে তার দিব্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আর অবাক করা ব্যাপার। তার বন্ধুকে সে খুঁজে পেল দুর্গন্ধযুক্ত এক গোবরের স্তুপের মধ্যে গুবরে পোকারূপে! বন্ধুত্বের বাঁধন এত শক্ত যে মরণের পরেও তা টিকে থাকে। দেবতা তার পুরনো বন্ধুকে এমন দুর্ভাগ্যজনক জন্মের কবল থেকে উদ্ধার করবে বলে মনস্থির করল।

তাই সে স্বর্গ থেকে নেমে এসে দুর্গন্ধযুক্ত গোবরের স্তুপের সামনে এসে ডাক দিল, 'এই যে, গুবরে পোকা! আমাকে মনে আছে? আমরা অতীত জন্মে দুজন ভিক্ষু ছিলাম, আর তুমি ছিলে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। আমি যেখানে সুন্দর স্বর্গে জন্ম নিয়েছি, সেখানে তোমার জন্ম হয়েছে পেট উল্টে আসা এই দুর্গন্ধযুক্ত গোবরের স্তুপে। তবে চিন্তা করো না। আমি তোমাকে আমার সাথে করে স্বর্গে নিয়ে যাব। এসো, হে বন্ধু!' পোকাটা বলল, 'একটু দাঁড়াও! তুমি যে এই স্বর্গলোক সম্পর্কে কিচির মিচির করে জানাচ্ছ, সেখানে এত মজার কী আছে? আমি এখানে পুষ্টিকর গরুর গোবরের সুগন্ধের মধ্যে ভালোই আছি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'তুমি বুঝছ না।' দেবতা এবার তাকে স্বর্গের সুখ ও আনন্দজনক বিষয়গুলো তাকে বুঝিয়ে বলল।

'উপরে সেখানে কি তাহলে গোবর আছে?' পোকাটা মূল বিষয়ে এলো।

'অবশ্যই নয়!' নাক সিঁটকাল দেবতা।

'তাহলে আমি যাচ্ছি না!' পোকাটা দৃঢ় গলায় বলল। 'দূর হও এখান থেকে!' এই বলে সে হামাগুড়ি দিয়ে গোবরের স্তুপের মাঝে ঢুকে গেল।

দেবতা ভাবল যে পোকাটাকে ধরে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে দেখালে তবেই সে বুঝবে। তাই দেবতা নাক কুঁচকে তার কোমল হাতটা সেই জঘন্য গোবরের স্তুপে ঢুকিয়ে পোকাটাকে হাতড়াল। সে তাকে খুঁজে পেয়ে টেনে বের করে আনতে লাগল।

'হেই! আমাকে একা থাকতে দাও!' পোকাটা চেঁচিয়ে উঠল। 'বাঁচাও! আমার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে! আমাকে অপহরণ করা হচ্ছে। বাঁচাও!!' ছোট্ট পিচ্ছিল পোকাটি দেহ বাঁকিয়ে মুচড়ে নিজেকে দেবতার কবল থেকে মুক্ত করল, আর গোবরের স্তুপে ঝাঁপ দিয়ে লুকাল।

দয়ালু দেবতা আবার তার আঙুলগুলোকে দুর্গন্ধে ভরা সেই গোবরের স্তুপে ঢুকিয়ে দিল। পোকাটিকে খুঁজে পেল আর আরেকবার তাকে টেনে বের করার চেষ্টা চালাল। দেবতা প্রায় তাকে বের করে এনেছিল। কিন্তু পোকাটি নরম গোবরে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল, আর যেতে ইচ্ছুক ছিল না মোটেও। তাই এটি দ্বিতীয়বারের মতো পালাল এবং গোবরের আরও গভীরে গিয়ে লুকাল। গুণে গুণে একশ আটবার দেবতা বেচারা পোকাটাকে সেই জঘন্য গোবরের স্তুপ থেকে বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু পোকাটা তার সেই প্রিয় গোবরের প্রতি এমন আসক্ত ছিল যে সে প্রতিবারই দেহ মুচড়ে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে আবার গোবরের মধ্যে ঢুকে গেল!

তাই অবশেষে দেবতাকে হাল ছেড়ে দিয়ে স্বর্গে ফিরে যেতে হলো, আর বোকা পোকাটাকে তার প্রিয় গোবরের স্তুপে রেখে যেতে হলো। এভাবেই এই বইয়ে একশ আটটি গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটল।